মাসুদ রানা

লাইমলাইট

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

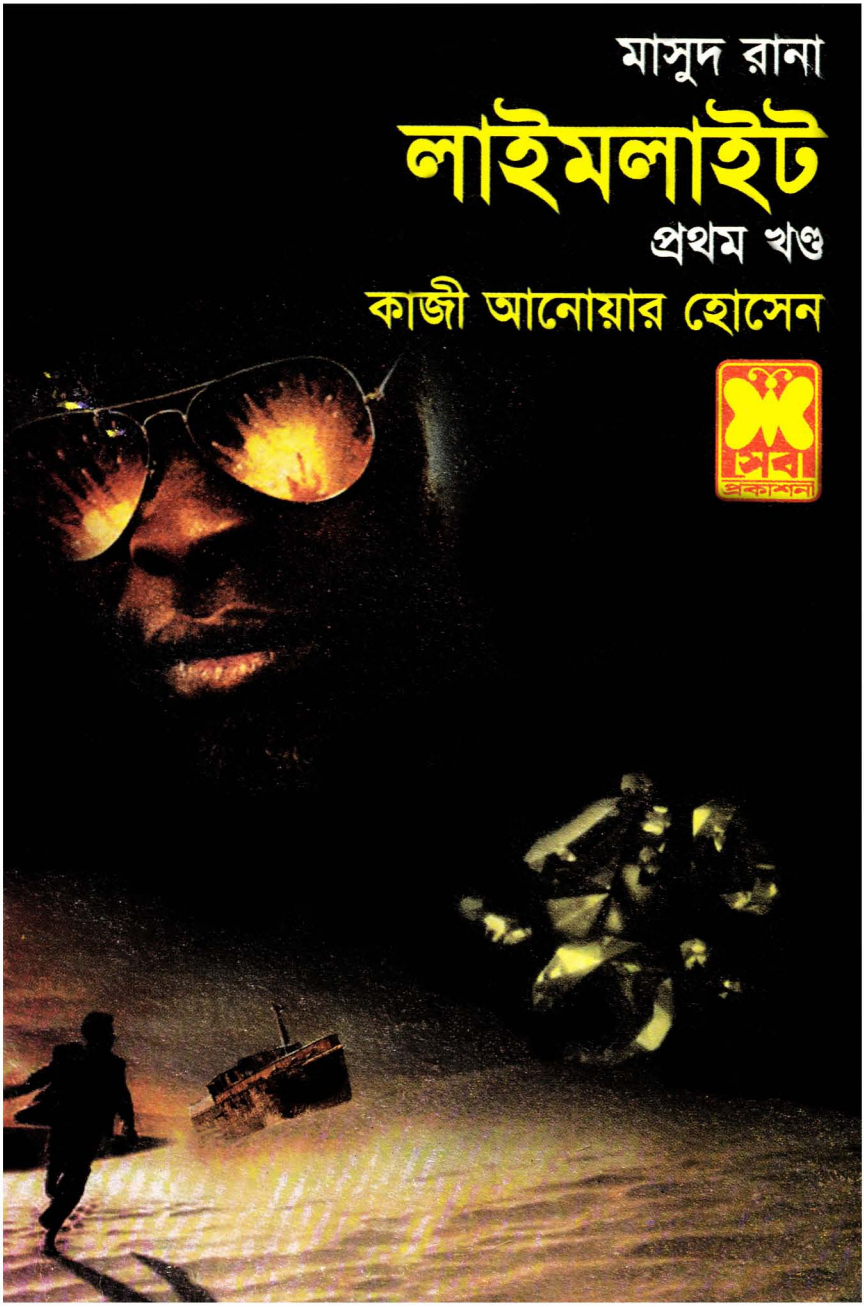

সেবা প্রকাশনী

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

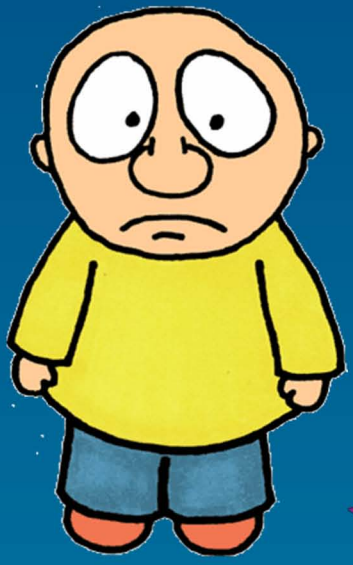

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা ৪২৩

লাইমলাইট

(প্রথম খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন

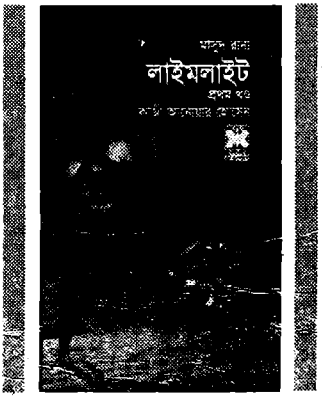

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7423-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৩

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০৩
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-423
LIMELIGHT
Part-I
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

ছিয়াশি টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্র: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক

এবার মৃত্যু অনিবার্য, ভাবছে জিম উফোর্ড। অস্ত্র ফেলে এসে মস্ত ভুল করেছে। কিন্তু আর কি কোনও উপায় ছিল? শেষ মালবোঝাই ঘোড়াটা পঙ্গু হতেই আবারও সব বাটোয়ারা হলো, তখন ত্যাগ করতে হয়েছে বেশির ভাগ ইকুইপমেন্ট। আরোহী না নিয়ে পানির ফ্লাস্ক বইছে ঘোড়া, স্যাডলব্যাগে রয়েছে মহামূল্যবান সব আনকাট ডায়মণ্ড। তাঁবু, বেডরোল, চল্লিশ পাউণ্ড খাবার, মার্টিনি-হেনরি রাইফেল ও অ্যামিউনিশন— সব ফেলে এসেছে। এরপরও যা রইল, তাতেই ধুঁকছে আধমরা ঘোড়াগুলো।

দূর-দিগন্তে উঁকি দিয়েছে জ্বলজ্বলে সোনালী সূর্য। একটু পর স্রেফ নরক হয়ে উঠবে চারপাশ। আজ যদি জিম উফোর্ড পানি না পায়, আগামীকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত টিকবে না একটা ঘোড়াও।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ— ঘটনাস্থল আফ্রিকার ভয়ঙ্কর ঊষর কালাহারি!

হ্যাঁ, বড় ভুল করেছে জিম উফোর্ড। অনভিজ্ঞ সঙ্গীদেরকে নিয়ে কালাহারি মরুভূমি পাড়ি দিতে যাওয়া মস্ত অন্যায়। বহুদিন হলো সে আফ্রিকায়। আগে সাসেক্সে মুনাফাশূন্য এক খামারের মালিক ছিল, কোনওমতে চলছিল দিন। তখনই শুনল কিম্বারলিতে পাওয়া গেছে হীরার বিশাল খনি। পাগল হয়ে উঠল সবাই, যেভাবেই হোক লাখপতি হতে হবে। মেতে উঠল জিম উফোর্ডও। আঠারো শ' আটষট্টি সালে পা রাখল আফ্রিকায়। কিন্তু তার ঢের

আগেই কোল্‌স্‌বার্গ কোপজের খাটো টিলাসারি দখল করে নিয়েছে আগে আসা লোকজন। শুধু তা-ই নয়, ওই এলাকার কয়েক মাইলের ভিতর কোনও জমিও পাওয়া গেল না। হীরা পাবে না বুঝে দ্বিতীয় সেরা কাজটি বেছে নিল জিম। হাজার হাজার শ্রমিকের পেট ভরাতে হবে, সেজন্য চাই মাংস। সুতরাং শিকারে মন দিল সে।

একজোড়া ওয়্যাগন, কয়েকটা রাইফেল, অজস্র গুলি ও দুই শ' বস্তা লবণ নিয়ে রওনা হলো সে। সঙ্গে দু'জন স্থানীয় গাইড। শিকার করতে গিয়ে কখনও চলে গেল হাজার মাইল দূরে। প্রায় নিঃসঙ্গ রইল জিম উফোর্ড, একাকী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেল, ভালবেসে ফেলল এই পথচলাকে, ভালবাসতে শিখল আফ্রিকার মাটিকে, মায়াবী সূর্যাস্ত ও গহীন অরণ্যকে। সুদূর এই দেশের ঝর্নার পানি এতই পরিষ্কার, যেন পানিই নয়, মসৃণ, স্বচ্ছ কাঁচ। কখনও দিগন্ত রইল এতই দূরে, যেন কখনও ফুরাবে না চলবার পথ। নানান উপজাতির কাছ থেকে শিখল বহু কিছু। ধীরে ধীরে জানল তাদের আচার-আচরণ। গড়গড় করে বলতে শিখল ম্যাটাবেল, ম্যাশোনা ও হিংস্র যোদ্ধাজাতি হারেরোদের মুখের ভাষা। এমন কী মরুভূমিতে বুশম্যান যে বিদ্‌ঘুটে টিকটিক আওয়াজ ও শিস দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাও কিছুটা বুঝে নিল।

এরপর সাফারি গাইডের কাজ নিল জিম উফোর্ড। ধনী ইংরেজ ও আমেরিকানদের শখ, তারা তাদের ম্যানশনের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখবে লোভনীয় ট্রফি। বড়লোকদের জন্য কাজ পেতে লাগল উফোর্ড। এক টেলিগ্রাফ কোম্পানির হয়ে খুঁজে বের করল কোন্ পথে টেলিগ্রাফের তার গেলে সুবিধা হবে। এ কাজ নিয়ে মহাদেশের দক্ষিণের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা ভ্রমণ করল। অন্তত বারোবার অ্যাম্বুশে পড়ল। তার হাতে মরল কমপক্ষে এক শ'

বিশজন জংলি। ততদিনে আফ্রিকার মানুষ ও মাটিকে ভাল করেই চিনে নিয়েছে। এবং সে-কারণেই মনের ভিতর উফোর্ড জানে, বেচুয়ানাল্যাণ্ডে গাঁইডের কাজ নেয়া ঠিক হয়নি। তাকে পাড়ি দিতে হবে বিশাল অনুর্বর কালাহারি মরুভূমি, সাগর তীরে পৌঁছে দিতে হবে মানুষগুলোকে। আগেই মনের গভীরে লোভ ছিল, এরা প্রচুর টাকা দেবে, কাজেই মানা করতে পারেনি। আর ওই প্রচুর টাকা উপার্জন করবে বলেই তো এসেছে সে আফ্রিকায়!

এখন কোনওমতে নিঠুর মরুভূমি পাড়ি দিলেই স্বপ্নের বিপুল সম্পদ পাবে, পায়ের উপর পা রেখে বাকি জীবন আয়েস করবে।

'উফোর্ড, আপনার কি মনে হয় ওরা এখনও আসছে?'

উদীয়মান সূর্যের দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল জিম উফোর্ড, রুক্ষ ত্বকের ভাঁজে হারিয়ে গেছে দুই চোখের মণি। দিগন্তে কোনও দলকে চোখে পড়ছে না। কচি রোদে ধূ-ধূ মরুভূমি থেকে ধোঁয়ার মত উঠছে বালির তাপ। ওই সূর্য এবং ওদের নিজেদের মাঝে শত শত সাদা বালির ঢিবি— এক একটা বিশাল ঢেউয়ের মত, সাইক্লোনের ঢেউয়ের চেয়ে কম বড় নয়— টানা হাওয়া ওগুলোর আকৃতি পাল্টে চলেছে অবিরত। ভোর হতেই মাতম শুরু করেছে হাওয়া, ঢিবির চূড়া থেকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বালি, তৈরি হচ্ছে ধুলোর মেঘ— বাতাস আরও জোরে বইলে মানুষের নুন-ছাল তুলে নেবে।

'হ্যাঁ, ওরা আসবে,' পাশে এসে দাঁড়িয়েছে যুবক, তার দিকে না চেয়ে বলল জিম উফোর্ড।

'আপনি কীভাবে এত নিশ্চিত হচ্ছেন?'

এবার মার্ল গাল্টের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল উফোর্ড। 'আমরা ওদের যে ক্ষতি করেছি, ওরা নরকের সদর-দরজা পর্যন্ত ধাওয়া করবে।'

কথাটা এতই গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল জিম উফোর্ড, ফ্যাকাসে

হয়ে গেল মার্ল গাল্টের মুখ। গাইডের মতই সে এবং অন্য তিন অভিযাত্রী ইংরেজ, দ্রুত বড়লোক হতে এসেছিল আফ্রিকায়। মরুভূমি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই এদের।

'এবার রওনা হওয়া উচিত,' বলল জিম উফোর্ড। গত কয়েক রাত অপেক্ষাকৃত শীতল পরিবেশে চলেছে তারা। 'সূর্য চারপাশ নরক করে তুলবার আগেই কয়েক মাইল এগুতে পারব।'

'আমার মনে হয় এখানেই ক্যাম্প করা উচিত,' বলল জ্যাক ডাল্। এ দলের সর্ব-কনিষ্ঠ সদস্য সে। সবচেয়ে করুণ অবস্থা তার। বালি-সাগরে ঢুকবার পর থেকে থেমে গেছে তার বড়াই। টলমল করে হেঁটে চলেছে, যেন নব্বুই বছরের বুড়ো। দুই চোখ ও মুখের কোণে জমেছে লবণের সাদা গুঁড়ো, ঝিকমিকে নীল মণিগুলোর ভাষা এখন ভোঁতা।

জ্যাক ডালের মুখে ফুটে উঠেছে ক্লান্তি। সবই বুঝল উফোর্ড। দশদিন আগে শেষবার এক ইঁদারা থেকে সামান্য লবণাক্ত পানি ফ্লাস্ক ও জেরিক্যানে ভরেছে ওরা, তারপর থেকে পানির রেশন করে চলেছে। কিন্তু অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি তৃষ্ণা ডালের। কোনও বাড়তি শক্তি খরচ করছে তা নয়, আসলে বেঁচে থাকতেই তার পানি বেশি লাগছে। জিম উফোর্ড একপলক দেখেই বলে দিতে পারবে আর কতখানি পানি আছে ওদের কাছে। পরিষ্কার টের পেল, সে যদি শীঘ্রি কোনও মরু-কূপ খুঁজে না পায়, সবচেয়ে আগে মরবে ওই জ্যাক ডাল্।

সেজন্য তাকে পানি দিতে পারবে না উফোর্ড। নিরাসক্ত স্বরে বলল, 'আমরা সামনে বাড়ব।'

পশ্চিমাকাশে মরীচিকা দেখল সে। যে দৃশ্য দেখছে, তা বহু পিছনে ফেলে এসেছে। একের পর এক বালির ঢিবি, তার যেন শেষ নেই। ওখান থেকে সূর্যের আলো ছিটকে উঠে জ্বলজ্বলে করে তুলেছে আকাশটাকে, যেন মস্ত কোনও ঝিকমিকে আয়না। নিজের

ঘোড়া পরীক্ষা করে দেখল উফোর্ড। বড়ই কষ্ট পাচ্ছে জন্তুটা। সেজন্য নিজেকে দোষী ভাবছে সে। তরুণ ডালের দোষ আছে, কিন্তু বেচারা ঘোড়ার কোনও দোষ নেই, বাধ্য হয়ে এসেছে এই নরকে। ছোট্ট ছুরি দিয়ে ঘোড়ার খুর থেকে খুঁচিয়ে পাথর বের করল সে। পিঠের স্ট্র্যাপ এঁটে বসেছে, সেগুলো ঠিক করল, ভালভাবে বসিয়ে দিল স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট। আগে ওর ঘোড়ার চামড়া চকচকে বাদামি ছিল, এখন ফ্যাকাসে হয়ে ঝুলে পড়েছে, সেসব জায়গায় ধসে গেছে পেশি।

প্রতিটি ঘোড়া পরীক্ষা করে দেখছে জিম উফোর্ড। আদর করে থুতনি চুলকে বিড়বিড় করে সান্ত্বনা দিচ্ছে কানের কাছে। একটা ঘোড়াও আরোহী বহন করতে পারবে না। ওজন কমিয়ে দেয়ার পরও টলছে। ওগুলোর রাশ নিল জিম উফোর্ড, এগুতে শুরু করল। সামনের ঢাল বেয়ে নেমে চলেছে, বালির উপর চেপে বসছে বুটজুতো। টানা হাওয়ায় পায়ের নীচ থেকে হিসহিস শব্দে সরছে বালি। নেমে যাওয়ার সময় পা ফস্কালে উল্টে পড়তে হবে ঘোড়াসহ। একবারও পিছন ফিরে চাইল না জিম উফোর্ড। সঙ্গীদের উপায় নেই, তাদের আসতেই হবে, নইলে পড়ে থেকে মরবে।

পাক্কা এক ঘণ্টা হাঁটল জিম উফোর্ড। ধীরে ধীরে মেঘশূন্য সোনালী আকাশ বেয়ে উঠল সূর্য। ততক্ষণে ঝাঁ-ঝাঁ রোদে জ্বলছে চারপাশ। দাঁত ও জিভের মাঝে নুড়িপাথর রেখেছে উফোর্ড, ক্লান্ত শরীরকে বোঝাতে চাইছে আসলে তার তৃষ্ণা নেই, সুতরাং ডিহাইড্রেশন হওয়া উচিত নয়। একবার থেমে বড়সড় হ্যাটের ভিতর হাত ভরল, টের পেল ক্রাউনের চাপে মাথা ও কপালের ত্বক লালচে হয়ে গেছে। ওখানে চিনচিনে ব্যথা। আরও এক ঘণ্টা হাঁটবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বাধ্য হয়ে থামল— সঙ্গীরা হতক্লান্ত হয়ে পড়েছে, এবার থামতেই হবে। এমন কোনও পরিস্থিতি হয়নি

যে সবাইকে ফেলে এগুবে। তাদেরকে নিয়ে সুউচ্চ এক ঢিবির গোড়ায় থামল সে, ঘোড়ার ব্ল্যাঙ্কেট তুলে নিয়ে দাঁড় করিয়ে ফেলল ছাউনি। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ ও রোদ থেকে ওটা আড়াল দেবে। ছাউনির নীচে বালির উপর ধুপ করে বসল সবাই, হাপরের মত হাঁপিয়ে চলেছে।

জ্যাক ডালের পাশে বসেছে জিম উফোর্ড। টের পেল, একদম হাল ছেড়ে দিয়েছে তরুণ। ঠোঁট ফেটে অসংখ্য ফোস্কা পড়েছে। ভিতরে জমেছে রস, ফোস্কা ফেটে গেলেই পানিটুকু গিলছে সে। রোদের কারণে গাল পুড়ে দগদগে ঘা হয়েছে, যেন তপ্ত শিক দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে কেউ।

উফোর্ড সাবধান করে দিল, বুটের ফিতা ঢিলা করতে পারে, কিন্তু ভুলেও কেউ যেন জুতো না খোলে। হাঁটতে গিয়ে সবার পা ফুলে গেছে, এখন জুতো খুললে আর পরতে পারবে না। ফলাফল: মরুভূমিতে পড়ে থেকে মৃত্যু। সবাই চাতকের মত চেয়ে রইল উফোর্ডের দিকে। উঠে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে কয়েকটা ক্যান্টিন নামাল সে, একটার মুখ খুলতেই হ্রেষাধ্বনি করল ঘোড়াগুলো। মিষ্টি পানির ঘ্রাণ পেয়েছে ওরা, ভিড় করে এগিয়ে এল। জিম উফোর্ডের কাঁধে থুতনি ঘষল তার ঘোড়াটা।

একফোঁটা পানি নষ্ট করা চলবে না। একটা গামলা নিল উফোর্ড, পরিমিত পানি ঢেলে ঘোড়াটাকে তৃষ্ণা মেটাতে দিল। সুড়ুৎ-সুড়ুৎ আওয়াজে পান করছে ওটা। পানি পড়তেই পেটের ভিতর শুরু হলো গুড়গুড় আওয়াজ। আজ তিনদিন পর পানি দেয়া হয়েছে। গামলা শুকিয়ে যেতেই আরও একটু পানি দিল উফোর্ড। একই ভাবে প্রতিটি ঘোড়াকে পানি দিল। নিজের তৃষ্ণার কথা ভুলে থাকতে চাইল। সঙ্গীরা কড়া চোখে দেখছে তাকে।

'ওরা যদি মরে, তোমরাও শেষ,' বাড়তি কিছু বলতে গেল না উফোর্ড।

সবাই জানে লোকটা ঠিক কথাই বলেছে।

এক গ্যালনের এক-চতুর্থ ভাগ পানি পেয়েছে প্রতিটি ঘোড়া, এখন আদর করলে ফিড ব্যাগ থেকে ভুট্টার দানা নেবে। পায়ে দড়ি বেঁধে ওগুলোকে ছেড়ে দিল উফোর্ড। কাজ শেষে সবাইকে পানি ঢেলে দিল। রেশনের বিষয়ে আরও কঠোর হয়েছে সে, প্রত্যেকের জন্য রইল শুধু এক ঢোক পানি, তারপর ক্যান্টিন রেখে দিল স্যাডলব্যাগে। কেউ প্রতিবাদ করল না। জিম উফোর্ড সঙ্গে না থাকলে কালাহারি পাড়ি দেয়ার কথা ভাবত না। এখনও ভরসা করছে গাইড তাদেরকে ঠিকই পৌঁছে দেবে গন্তব্যে।

ঘোড়ার ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে যতই ছাউনি দেয়া হোক, গরম মোটেও কমছে না। গোটা কালাহারি যেন তপ্ত আভন। এটা পৃথিবীর অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং শুকনো এলাকাগুলোর অন্যতম। বছরে একবার বৃষ্টি হলে সে-ই বেশি। আগুনের মত নরক ঢালছে সূর্য। ছাউনির নীচে অলস পড়ে রইল সবাই। গলা শুকিয়ে কাঠ, ব্যথায় টনটন করছে পা। আড়ষ্ট দেহ, তবুও মনের ভিতর লোভ ও আকাঙ্ক্ষা। একবার মরুভূমি পেরুতে পারলেই মস্ত বড়লোক হয়ে যাবে তারা। আগে কখনও ভাবেনি এত সম্পদ অর্জন করতে পারবে কোনদিন।

সূর্য মাঝ আকাশে উঠতে তাপের হাতুড়ি নিয়ে নেমে এলেন সূর্যদেব, ওদেরকে যেন শেষই করে দেবেন। ওদের মন বলল, যদি পারতাম ঠাণ্ডা পানিতে দেহ চুবিয়ে রাখতে! ঘেমে চলেছে, দেখতে না দেখতে শুকিয়ে যাচ্ছে লবণাক্ত বিন্দুগুলো। তপ্ত বাতাস ফুসফুসে জ্বেলে দিয়েছে আগুন, যেন দাউদাউ করে জ্বলছে দেহ।

গরম আরও বাড়ছে, যেন তপ্ত বালির সঙ্গে ওদেরকে মিশিয়ে দেবে। বহুকাল আগে এখানে এসেছিল জিম উফোর্ড, তার মনেই ছিল না পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ হতে পারে। ঠিক যেন নরক থেকে নেমে এসেছে স্বয়ং ইবলিস, খেপে গেছে সাধারণ মানুষ

তার ক্ষমতাকে হেলাফেলা করছে, তা-ই। খরতাপে নিজেদেরকে পাগল পাগল লাগছে ওদের। ধীরে ধীরে দুপুর পেরিয়ে বিকেল এল। বারবার ওরা প্রার্থনা করল, যেন শীঘ্রি সন্ধ্যা নামে।

ভোরে যেমন আচমকা তাপ বেড়েছে, ঠিক তেমনি পশ্চিম দিগন্তে সূর্য হেলান দিতেই ঝপ্ করে কমে এল গরম। বালির রাজ্যে লাল-হলুদ-খয়েরি রঙের খেলা শুরু হলো। একে একে ছাউনির নীচ থেকে বেরুল সবাই। নোংরা পোশাক ঝেড়ে নিল। ঢিবির উপর উঠবার জন্য পা বাড়াল জিম উফোর্ড। এই ঢিবি ওদেরকে রক্ষা করেছে দমকা হাওয়ার কবল থেকে। চূড়ায় উঠে কোলাপসিবল ব্রাস টেলিস্কোপ খুলল জিম, খেয়াল করে দেখল ফেলে আসা মরুভূমি। যারা ধাওয়া করছে, তাদের কোনও চিহ্ন চোখে পড়ল না। বাতাসের ঝাপটা খেয়ে ধীরে ধীরে সরছে বিশাল সব ঢিবি। হারিয়ে গেছে ওদের পায়ের ছাপ। তবে সেজন্য স্বস্তি পাওয়ার কোনোই কারণ নেই। যারা আসছে, তারা দুনিয়ার সেরা ট্র্যাকার। ঠিকই বালির সাগরে খুঁজে বের করবে ওদেরকে।

জানার উপায় নেই, তারা সারাদিনে কতটা পথ পেরিয়েছে। এই তপ্ত মরু ও জ্বলন্ত সূর্য কিছুই নয়, অতিমানবীয় ক্ষমতা আছে তাদের। জিম ধারণা করছে, মরুভূমিতে ঢুকে পড়বার আগে পাঁচ দিন পিছনে ছিল তারা। আর এখন যদি কোনও ভুল না হয়ে থাকে, তারা আছে মাত্র একদিন পিছনে। আজ রাতে আরও আধ বেলা এগিয়ে আসবে। আর তারপর? আগামীকাল মুখোমুখি হতেই হবে। প্যাকহর্স খোঁড়া হওয়ার পর অস্ত্র ফেলে আসতে হয়েছে।

এখন একটাই মাত্র উপায়: আজ রাতেই খুঁজে বের করতে হবে মরু-কূপ। সেক্ষেত্রে ঘোড়াগুলোকে পেট ভরে পানি দিতে পারবে। আবারও ওগুলোর পিঠে চেপে এগুনো সম্ভব হবে।

বাড়তি পানি নেই যে ঘোড়াগুলোকে দেবে। ভোরে নিজেরা

যে পরিমাণ নিয়েছে, এখন থেকে তার অর্ধেক পানি দিয়ে চালাতে হবে। দমে আসছে জিমের মন। সবার কাছে ফিরে এল সে, ক্যান্টিন থেকে সবাইকে একটু পানি দিল। নিজেও নিল। ওটুকু পানি মুখেই শুকিয়ে গেল, গলা ভিজল না। শুকনো মাংস খেল খানিক, তাতে শুরু হলো পেট ব্যথা।

সবাইকে দেখল উফোর্ড। রুক্ষ-ক্লান্ত চেহারা তাদের। ওর বুঝতে দেরি হলো না, আজ রাতে হেঁটে চলা কঠিন হবে। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে টলছে তরুণ জ্যাক ডাল। প্রায় একই অবস্থা মার্ল গাল্টের। শুধু দুই ভাই কাইল কেইসি ও চার্লস কেইসি এখন পর্যন্ত শক্ত। তারা ডাল ও গাল্টের চেয়ে অনেক বেশি দিন ধরে আছে আফ্রিকায়। গত দশ বছর একটা খামারে কাজ করেছে। আফ্রিকার সূর্যের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে অনেকটা।

দাড়ি হাতড়ে চলেছে জিম উফোর্ড, ঝেড়ে ফেলতে চাইছে বালি। আধপাকা চুল থেকেও। একটু পর বুটজুতোর ফিতা বাঁধতে উবু হলো। ওর মনে হলো, বয়স বেড়ে হয়েছে এক শ'। পিঠ ও উরুতে টনটনে ব্যথা। আবার যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল, মটমট করে ফুটল মেরুদণ্ডের হাড়।

'ঠিক আছে, বাছারা, আগেই বলেছি, রাতে আমরা পেট ভরে পানি পাব,' বলল সে।

মনে হলো না এ কথা শুনে কেউ উৎসাহিত হলো।

'বুশম্যানরা নিজেদের বলে স্যান, ওরা কিন্তু হাজার বছর ধরে মরুভূমিতে বেঁচে আছে,' বলল জিম। 'বলা হয় ওরা এক শ' মাইল দূর থেকে পানির ঘ্রাণ পায়। কথাটা কিন্তু ঠিক। বহু বছর আগে কালাহারিতে আসি, তখন আমার সঙ্গে ছিল এক স্যান গাইড। এমন জায়গা থেকে পানি সংগ্রহ করল, কখনও ভাবতে পারিনি। লতা থেকে মুচড়ে বের করল। ওই পানি জমেছিল রাতের কুয়াশা থেকে। এ ছাড়া মৃত জানোয়ারের রিউমেন থেকেও

বের করল। ওই জানোয়ার শিকার করেছিল বিষাক্ত তীর দিয়ে।'

'রিউমেন কী?' জানতে চাইল গাল্ট।

কাইল ও চার্লস কেইসির দিকে চাইল উফোর্ড। ওরা হয়তো কিছু বলতে পারে। কিন্তু কিছুই বলল না তারা।

'ওটা পাকস্থলির বাইরের অংশ। গরু আর অ্যান্টিলোপের ওখানে চর্বি তৈরি হয়। জিনিসটার বেশিরভাগই পানি আর লতাপাতার রস দিয়ে তৈরি।'

'ওই জিনিস পেলেও বর্তে যেতাম,' বিড়বিড় করে বলল জ্যাক ডাল। ফাটা ঠোঁটের কোণে এক বিন্দু রক্ত জমেছে, ওটা বালিতে পড়ে যাওয়ার আগেই তাড়াতাড়ি চেটে নিল।

'শুকিয়ে যাওয়া নদীর তলা থেকে পানি তোলে স্যানরা। ওই শুকনো নদী হয়তো কয়েক শ' বছর আগে বইত। সেই বালির নীচে থাকে পানি।'

'ওদের মত করে পানি পাবেন?' জানতে চাইল মার্ল গাল্ট।

'গত পাঁচ দিন ধরে ঝর্না ও নদী খাতের উপর চোখ রাখছি,' বলল জিম উফোর্ড।

কথাটা শুনে সবাই অবাক হলো। কেউ ভাবেনি শুকিয়ে যাওয়া নদীর উপর দিয়ে হেঁটে এসেছে। ওদের ধারণা ছিল মরুভূমিতে আছে শুধু শূন্যতা, দেখবার মত কিছুই নেই।

জিম উফোর্ড চাইছে শুকনো ঝর্না ও নদীর কথা শুনে যেন কিছুটা হলেও আস্থা জাগে ওদের মনে। সেক্ষেত্রে ভাবতে শুরু করবে, গাইড তাদেরকে এই দুঃস্বপ্নের ভিতর থেকে উদ্ধার করতে পারবে। কাজেই উফোর্ড বলল, 'গতকাল ভাল একটা জায়গা খুঁজে পাই, কিন্তু হাতে সময় নেই বলে থামিনি। আমার ভুলও হতে পারত। আন্দাজ করছি আমরা উপকূল থেকে দু' দিন বা তিনদিন দূরে। আর তার মানেই সাগরের কারণে মরুভূমির ওই অংশ ভেজা থাকবে। এসব জায়গায় মাঝে মাঝেই ঝড় হয়।

শপথ করে বলতে পারি, বাছারা, আমরা ঠিকই খুঁজে নেব পানি।'

অস্ত্র ফেলে আসবার পর প্রথমবার এত কথা বলল জিম উফোর্ড। তার ফলও পেল। হেসে ফেলল কাইল কেইসি ও চার্লস কেইসি। ঝুলে থাকা দুই কাঁধ সোজা করে দাঁড়াল মার্ল গাল্ট। এখন আর টলছে না জ্যাক ডাল।

সূর্য ডুবে যেতেই শেষ রক্তিম রশ্মি বিদায় নিল। হামাগুড়ি দিয়ে আকাশে উঠল শীতল চাঁদ। তাকে সঙ্গ দিতেই বোধহয় হাজির হলো অযুত নিযুত নক্ষত্র— সংখ্যায় এতই বেশি, এক শ' জনমেও গুণে শেষ করতে পারবে না মানুষ। বালি সরে যাওয়ার হিসহিস, ঘোড়ার খুরের ক্লপ-ক্লপ ও বুটের মশ-মশ শব্দ ছাড়া কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। কখনও স্যাডলের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হলে কানে বেমানান লাগছে। প্রতি পদক্ষেপ মেপে চলেছে মানুষগুলো।

উফোর্ড জানে, গত ক' দিনে দুর্বল হয়ে পড়েছে সবাই। তবে সবাই জানে, পিছন থেকে ধেয়ে আসছে নিশ্চিত মৃত্যু।

মাঝরাতে প্রথমবারের মত থামল উফোর্ড। ওর মনে হলো এখানে একটু বদলে গেছে মরুভূমির প্রকৃতি। পায়ের নীচে এখনও গোড়ালি সমান বালি, কিন্তু এসব উপত্যকায় ছড়িয়ে রয়েছে নুড়ি পাথর। কোনও কোনও ওয়াশে দেখেছে পুরনো গর্ত। আগে ওখানে পানি ছিল। কোথাও কোথাও ভূ-গর্ভস্থ পানি খুঁজতে গিয়ে জমি খুঁড়েছে ইল্যাণ্ড ও অ্যান্টিলোপ। উফোর্ড খেয়াল করেছে, ওখানে কোনও মানুষের চিহ্ন নেই। বহু আগেই শুকিয়ে গেছে ওসব গর্ত। তবে এ বিষয়ে টুঁ শব্দ করেনি। সবাই ভাবছে যে-কোনও মুহূর্তে পাওয়া যাবে কূপ।

সবাইকে দ্বিগুণ পরিমাণ পানি দিল উফোর্ড। ওর ধারণা, ভোরের আগেই খুঁজে নিতে পারবে কূপ। তখন ক্যাণ্টিন ভরে নেবে। যথেষ্ট পানি দিতে পারবে ঘোড়াগুলোকে। কিন্তু কূপ যদি

পাওয়াই না যায়, আর কিছু করবার থাকবে না। যতটুকু পানি থাকবে, তাতে কিছুই হবে না কারও। সেক্ষেত্রে আগামীকাল ওদেরকে মরতেই হবে। ওর ঘোড়াটাকে নিজের অর্ধেক পানি দিয়ে দিল উফোর্ড। অন্যরা তা করল না, কোনও বিবেচনা না করেই ঢকঢক করে গিলে নিল ভাগের সবটুকু।

ওরা আবার যখন হাঁটতে শুরু করল, তার আধ ঘণ্টা পর চাঁদ ঢাঁকা পড়ল কালো মেঘে। মরুভূমিতে ওই অদ্ভুত দৃশ্য বেশিক্ষণের জন্য থাকল না, সরে গেল পুরু চাদর, আবারও বালির উপর এসে পড়ল শীতল আলো। তখনই সামনে বালির মেঝেতে কী যেন দেখল উফোর্ড। নক্ষত্র ও তার কমপাস অনুযায়ী দল নিয়ে পশ্চিমে চলেছে, কিন্তু এবার দিক পরিবর্তন করল সে, রওনা হলো উত্তর দিকে। কেউ খেয়াল করে থাকলেও এ বিষয়ে কিছু বলল না। সবার আগে হাঁটতে শুরু করেছে উফোর্ড, টের পেল বুটের নীচে ঝুরঝুরে শুকনো মাটি মৃদু আওয়াজে গুঁড়ো হচ্ছে। নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে থামল সে, ওখানেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

এই উপত্যকার মেঝে মসৃণ সমতল, কিন্তু এখানে তিন ফুট জায়গা ঠিক পিরিচের মত। এই গর্তের চারপাশ দেখল উফোর্ড, ধীরে ধীরে ঠোঁটে ফুটে উঠল হাসি। এক পাশে কয়েকটা ভাঙা ডিমের খোসা। একটা প্রায় আস্ত, কিন্তু ফাটল ধরেছে ওটার গায়ে। একেকটা খোসা হাতের তালুতে এঁটে যাবে। প্রতিটি ডিমের মাথায় গোল গর্ত। ওটা ঢেকে দেওয়া হয়েছে শুকনো ঘাস ও স্থানীয় আঠা দিয়ে। এই জিনিস যে-কোনও স্যানের সেরা সম্পদের অন্যতম। অস্ট্রিচের এই ডিমের খোসা না থাকলে পানি বয়ে নেয়া তাদের জন্য হতো অসম্ভব। শেষ যে স্যান এখানে এসেছে, তার দিন মাটি হয়েছে একটা ডিমের খোসা ভেঙে যাওয়ায়।

কেমন যেন লেগে উঠল জিম উফোর্ডের। মনে হলো, প্রাচীন

এই নদীর তীরে এসে দাঁড়িয়েছে সুদূর অতীতের বুশম্যানরা। মাথায় লতার মুকুট, পরনে কাঁচা চামড়ার কোমর-বন্ধনী। ওখান থেকে ঝুলছে অস্ট্রিচের ডিমের খোসা। তূণের ভিতর বিষাক্ত তীর। পানি নেয়ার পর শিকার করতে রওনা হবে তারা।

'কিছু পেলেন, উফোর্ড?' জানতে চাইল মার্ল গাল্ট, গাইডের পাশে বসে পড়ল সে। কিছু দিন আগের সেই চকচকে চুলগুলো এলিয়ে পড়েছে কাঁধের উপর। জ্বলজ্বল করছে চোখ, চাহনি বেপরোয়া। এ ধরনের লোক স্বপ্ন দেখে হঠাৎ করেই একদিন বড়লোক হবে। সেজন্য মৃত্যুর ঝুঁকি নিতেও দেরি করে না। হয় বড়লোক হবে, নইলে শেষ হয়ে যাবে।

'পানি, মিস্টার গাল্ট,' বলল উফোর্ড। জুয়াড়ীর চেয়ে বয়সে সে বিশ বছরের বড়, তবে ক্লায়েন্টদের সঙ্গে সবসময় একটা দূরত্ব বজায় রাখে।

'কী বললেন? কোথায় দেখছেন? আমি তো কিছুই দেখছি না।'

দুই কেইসি ভাই বসেছে একটু দূরের এক বোল্ডারের উপর। তাদের পায়ের কাছে শুয়ে পড়েছে জ্যাক ডাল। দুই ভাইয়ের একজন বোল্ডার থেকে নামল, ডালকে দুই হাতে ধরে বোল্ডারে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিল। বুকের উপর নেমে এল তরুণের চিবুক, মাথা নড়ছে একটু একটু। অগভীর শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে।

'পানি আছে মাটির নীচে, আপনাদের আগেই বলেছি।'

'সেটা পাব কীভাবে?'

'গর্ত খুঁড়তে হবে।'

আর একটা কথাও হলো না দু'জনের ভিতর, দুই হাতে মাটি আঁচড়াতে শুরু করল তারা। শেষ বুশম্যান নতুন করে গর্ত বুজে দিয়ে গেছে, নইলে শুকিয়ে যেত কূপ। জিম উফোর্ডের হাত দুটো চওড়া, কড়াওয়ালা হাতে কোদালের মত মাটি খুঁড়ছে সে।

খড়খড়ে শুকনো মাটি সরাতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না তার। গাল্টের দু'হাত পাকা জুয়াড়ীর, মসৃণ, ক'দিন আগেও ম্যানিকিউর করা ছিল; কিন্তু এখন গাইডের মত করেই হামলে পড়েছে মাটি তুলতে। তৃষ্ণার কারণে পাত্তাই দিচ্ছে না খোঁচা খেয়ে কাটছে হাত। নখের পাশ থেকে রক্ত পড়তে শুরু করেছে।

দুই ফুট মাটি খুঁড়ে ফেলল তারা। তবুও পানির কোনও চিহ্ন নেই। তাদেরকে বড় করতে হচ্ছে গর্তটা, বুশম্যানদের চেয়ে আকারে ওরা অনেক বড়। কূপ তিন ফুট গভীর হওয়ার পর এক মুঠো মাটি তুলে নিল জিম উফোর্ড, আবারও ফেলে দিল, কিন্তু হাতে লেগে রইল ভেজা মাটি। চেঁছে নিল ওটুকু, একটা কাদার খুদে বল তৈরি হলো। জোরে চিপে দিতেই বেরিয়ে এল সামান্য পানি, চকচক করছে নক্ষত্রের আলোয়।

হই-হই করে উঠল মার্ল গাল্ট, এমন কী সদাগম্ভীর জিম উফোর্ডের মুখেও দেখা দিল মৃদু হাসি।

দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে নামল তারা, গর্ত থেকে তুলতে লাগল কাদা। আরও কিছুক্ষণ পর গাল্টের কাঁধে হাত রেখে নিষেধ করল উফোর্ড। যথেষ্ট গভীর হয়েছে গর্ত।

'এবার অপেক্ষা করব আমরা।'

কূপের চারপাশে জড় হয়েছে সবাই। নীরবে চেয়ে রইল অন্ধকার গর্তের দিকে। তারপর হঠাৎ ওখানে সাদা কী যেন দেখা দিল। চোখে পড়ল চাঁদের প্রতিচ্ছবি। চারপাশ থেকে আসা পানিতে ধীরে ধীরে ভরে উঠছে কূপ। শার্টের নীচের অংশ ছিঁড়ল উফোর্ড, ওটাকে ক্যান্টিনের মুখে ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করল। কাদা-পানিতে ক্যান্টিন নামাতেই ভিতরে ঢুকতে লাগল পানি। কয়েক মিনিট পর অর্ধেক ভরে গেল ক্যান্টিন। ক্যান্টিন নাড়তেই ছল-ছলাৎ আওয়াজ হয়েছে, শব্দটা শুনেই গুঙিয়ে উঠল জ্যাক ডাল।

'বাছা, আগে তুমিই নাও,' বলল উফোর্ড, বাড়িয়ে দিল ক্যান্টিন। ওটা প্রায় খামচে কেড়ে নিতে চাইল ডাল। কিন্তু ক্যান্টিন ছাড়ল না গাইড। 'খুব ধীরে, বাছা। অল্প অল্প করে পানি মুখে দেবে।'

উপদেশ শুনবার পরিস্থিতি নেই তরুণের, ঢক-ঢক করে পানি গিলতে চাইল। পরক্ষণে গলায় আটকে গেল পানি, বেদম কাশতে শুরু করল সে। মুখ ভরা পানি হারিয়ে গেল মরুভূমিতে। কিছুক্ষণ পর সামলে নিল ডাল, লজ্জিত চেহারায় সাবধানে একটু একটু করে গিলতে শুরু করল। যথেষ্ট পানি পেতে পুরো চার ঘণ্টা লাগল। সব ক'টা জেরিক্যান ও ক্যান্টিন ভরতে চাইল উফোর্ড। গত কয়েক দিনে এই প্রথম সবাই পেট পুরে খাবার খেল।

যখন পুব দিগন্তে সূর্য উঠতে শুরু করেছে, তখনও ঘোড়াগুলোকে পানি খাইয়ে চলেছে জিম উফোর্ড। এ বিষয়ে খুব সতর্ক সে, নইলে ঘোড়ার পেট ফুলে উঠবে, সেইসঙ্গে খিঁচ ধরবে। ধীরে ধীরে খাবার দিল জন্তুগুলোকে। বিশাল পেট থেকে গুড়গুড় আওয়াজ হচ্ছে। খাওয়া শেষে কয়েক দিনের ভিতর প্রথমবারের মত বিশ্রাম নিল ওগুলো।

তখনই 'মিস্টার উফোর্ড!' বলে চেঁচিয়ে উঠল কাইল কেইসি। নদী-তীর থেকে দূরে গিয়েছিল টয়লেট করতে, এই মাত্র ফিরছে। হ্যাট হাতে পাগলের মত পুব দিগন্তে সূর্যের দিকে কী যেন দেখিয়ে চলেছে সে।

তাড়াহুড়ো করে স্যাডলব্যাগ থেকে টেলিস্কোপ নিল উফোর্ড, ঘোড়া থেকে সরে গিয়ে দৌড়ে উঠতে লাগল ঢিবির উপর। চেহারা দেখে মনে হলো বদ্ধ উন্মাদ। উঠবার পথে কাইল কেইসির সঙ্গে ধাক্কা লাগল, দু'জনই পড়ে গেল বালির উপর। যুবক আপত্তি তুলবার আগেই খপ্ করে তার মুখ চেপে ধরল উফোর্ড। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'গলা নিচু রাখুন।

মরুভূমিতে বহুদূর যায় আওয়াজ।'

চূড়ার উপর শুয়ে টেলিস্কোপ খুলল সে, চোখে লাগাল। বিড়বিড় করে বলল, 'হায় ঈশ্বর! ওরা তো একেবারে কাছে চলে এসেছে!'

পাঁচজনের এই দলটি একসঙ্গে জুটেছে, এর একমাত্র কারণ জ্যাক ডাল তার বাবাকে ভীষণ ঘৃণা করে। সে-লোক অসম্ভব বদমেজাজি, কোন্ এক খারাপ রাতে স্বপ্ন দেখে তার ধারণা হয়েছে, তার উপর ওহি নেমেছে। স্বয়ং জিবরাঈল ফেরেস্তা স্টিফেন ডালকে বলেছেঃ সবকিছু বিক্রি করে দাও, চলে যাও আফ্রিকায়, এখন থেকে তোমাকে জংলিদের মাঝে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে হবে। এই স্বপ্ন দেখবার আগে ধার্মিক লোক ছিল না স্টিফেন ডাল, কিন্তু এরপর থেকে স্রেফ পাগল হয়ে উঠল। বাইবেলে ডুবে গেল সে। চলে গেল লণ্ডনের মিশনারি সোসাইটিতে, ধর্মের সাহায্যে বুনোদের উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে দরখাস্ত জমা দিল। তাকে এড়িয়ে যেতে চাইল কমিটি, তাদের ধারণা হয়েছেঃ লোকটা আসলে যিলট। কিন্তু শেষে পাগলের হাত থেকে বাঁচতেই রাজি হতে হলো তাদের। ঠিক হলো তাকে মিশনারি করা হবে, ইচ্ছে করলে স্টিফেন ডাল তার অনিচ্ছুক স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে যেতে পারে বেচুয়ানাল্যাণ্ডে। ওই অঞ্চলের মিশনারি মারা পড়েছে কঠিন ম্যালেরিয়ায়।

হারেরো জনগণের মাঝে, সভ্য সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন খুদে এক মিশনে এসে, ভয়ঙ্কর এক ধার্মিক দানব হয়ে উঠল লোকটা। ঈশ্বর নাকি জিবরাঈলকে দিয়ে তাকে বলে দিয়েছেন, এখন থেকে পুরোপুরি আত্মত্যাগ করতে হবে। কেউ সামান্যতম ত্রুটি করলে তাকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে। অন্য কারও উপর এসব প্রয়োগ করতে পারে না সে, কিন্তু নিজ ছেলে তো হাতের

মুঠোর ভিতর! খেতে বসে প্রার্থনার সময় শ্লোকের শেষ শব্দটি ঠিক উচ্চারণ করেনি, সে-কারণে জ্যাক ডালকে বহুবার পিটিয়েছে সে। সামান্যতম ভুল হলেই খাবার বন্ধ হয়, যখন তখন নির্দিষ্ট শ্লোক আউড়াতে ভুল হলে বেধড়ক মার খেতে হয়।

এই পরিবার যখন হারেরো অঞ্চলে এসে পৌঁছুল, তার কয়েক দশক আগেই ব্যাপটাইয হয়েছেন রাজা স্যামুয়েল হারেরো, তাঁর সঙ্গে তিক্ত বিরোধ চলছে কলোনিয়াল জার্মান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। তারাও পাঠিয়েছে জার্মান মিশনারি। কিন্তু তাকে পাত্তা না দিয়ে ইংরেজ এই পরিবারকে গুরুত্ব দিলেন রাজা। খুশি মনে শুনতে লাগলেন স্টিফেনের নরকের বর্ণনা।

বেশ ভালই থাকত কিশোর জ্যাক ডাল, রাজ-কুটিরের কাছেই ওদের বাড়ি, রাজার রয়েছে অসংখ্য নাতিপুতি, তাদের সঙ্গে খেলাধুলো করে সময় পেরুতে পারত; কিন্তু সমস্যা হলো: ওর বাবা যখন তখন জিবরাঈলের চোখ রাঙানি টের পায়, আর তখনই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, একের পর এক আদেশ দিতে থাকে; তাতে একটু এদিক ওদিক হলেই পিটিয়ে হাড় গুঁড়ো করতে চায়।

এভাবেই চলতে লাগল জ্যাক ডালের জীবন। তার প্রিয় বন্ধু রাজার নাতি হ্যাসা মাহারেরোর সঙ্গে পরিকল্পনা করে সে, একদিন সত্যিই পালিয়ে যাবে। কীভাবে তা সম্ভব, এ নিয়ে আলাপ করতে করতে একদিন দারুণ একটা জিনিস আবিষ্কার করল সে। ওটাই আমূল বদলে দিল তাকে।

একটা গোলাকার রণ্ডোভালের ভিতর ছিল সে, ওখানে রাজা কামাহারেরোর শত শত গরুর জন্য রাখা ছিল বিচালি। কখনও কখনও লুকিয়ে এই গুদামে খেলা করে রাজার নাতি মাহারেরো ও জ্যাক। সেদিন তখনও মাহারেরো আসেনি, চারপাশ ঘুরে দেখতে শুরু করল জ্যাক। বহুবার এখানে এসেছে, তবে এই প্রথম দেখল ঘাস ও কাদা দিয়ে তৈরি পিছন-দেয়ালের কাছে মাটি খুব মসৃণ।

ওই কালো মাটি অন্য জায়গা থেকে একদম আলাদা।

দুই হাতে মাটি খুঁড়তে শুরু করল জ্যাক ডাল। এক মিনিট পেরুনোর আগেই বুঝল, পাতলা স্তরের মাটি সরে যেতেই দেখা দিয়েছে ঘটির মত দেখতে বারোটা মাটির পাত্র। সাধারণত এসবের ভিতর রাখা হয় বিয়ার।

কিন্তু এখানে কেন লুকিয়ে রাখা হলো বিয়ার?

একেকটা পাত্র ওর মাথার সমান, প্রতিটির মুখ গরুর চামড়া দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা। গর্ত থেকে একটা পট তুলে আনল জ্যাক, ভিতরে ওজনদার কিছু আছে। তুলবার সময় ভিতরে খটা-খট আওয়াজ হয়েছে।

পটের মুখ থেকে সাবধানে চামড়া খুলে ফেলল জ্যাক, কাত করতেই হাতে নামল অদ্ভুত কিছু পাথর। আগে কখনও এ ধরনের পাথর দেখেনি সে। অজান্তেই শরীর কাঁপতে লাগল ওর। এগুলো হীরা নয়তো? গুনল জ্যাক, ওর হাতে ছয়টি আকাটা হীরা! সবচেয়ে ছোট পাথরটা গুলতির গুলির চেয়ে একটু ছোট। সবচেয়ে বড়টা তার দ্বিগুণ আকারের।

হাতের দিকে চেয়ে রইল জ্যাক, আর তখনই গুদামের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল হ্যাসা মাহারেরো। প্রিয় বন্ধু কী আবিষ্কার করেছে টের পেয়েই আঁৎকে উঠল সে। চট্ করে কাঁধের উপর দিয়ে বাইরে চাইল, ভয় পেয়ে গেছে। না, বড়দের কেউ আশপাশে নেই! একটু দূরে বেড়ার ওপাশে গরু চরাচ্ছে কয়েকটা ছেলে। এক শ' গজ দূরে এক মহিলা, মাথার উপর কাটা ঘাসের বোঝা নিয়ে আরেক দিকে চলেছে। না, আর কেউ নেই। একছুটে বন্ধুর কাছে পৌঁছে গেল মাহারেরো, ছোঁ দিয়ে জ্যাকের হাত থেকে পট সরিয়ে নিল।

'এ কী করেছ তুমি!' হিসহিস করে বলল, জার্মান উচ্চারণে ইংরেজি বলছে সে।

'কই, কিছুই তো করিনি,' দোষী গলায় বলল জ্যাক। 'এখানে দেখলাম মাটির নীচে কী যেন লুকিয়ে রাখা, তা-ই দেখছি।'

হাত বাড়িয়ে দিল মাহারেরো, তার হাতে পাথরগুলো দিয়ে দিল জ্যাক। পটের ভিতর হীরা রেখে দিল কিশোর রাজপুত্র, চামড়ার খাপ পরাতে শুরু করে বলল, 'খবরদার! আর কাউকে বলতে যেয়ো না, তা হলে ভীষণ কষ্ট পেয়ে মরবে তুমি।'

'ওগুলো হীরা, তা-ই না?'

আস্তে করে মাথা দোলাল মাহারেরো। 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এখানে এল কীভাবে? এখানে কোনও হীরার খনি নেই! খনি তো আছে শুধু কেপ কলোনির কিম্বারলিতে।'

ঠিক জায়গায় পাত্রটা রেখে দিল মাহারেরো, মাটি দিয়ে গর্ত বুজে দিতে লাগল। ওর মনেই থাকল না দাদা তাকে শপথ করিয়েছে, এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলা চলবে না। মাহারেরোর বয়স জ্যাকের চেয়ে তিনবছর কম, সবই জানে ভাবতেই ওর মনে গর্ব এল। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল, 'সবই বলব তোমাকে। কিন্তু শপথ করতে হবে আর কখনও এ কাজ করবে না।'

'এই যে আমি শপথ করছি।'

'ঠিক আছে। শোনো তা হলে: প্রথম যখন হীরার খনি আবিষ্কার হলো, আমাদের হারেরো জাতির অনেকে চলে গেল কিম্বারলির কূপগুলোয় কাজ করতে। এক বছরের জন্য চুক্তি করল তারা। কাজ শেষে আবার ফিরল সাদামানুষের দেয়া টাকা নিয়ে। কিন্তু সঙ্গে আনল অন্য কিছুও। তারা হীরা চুরি করে আনল।'

'শুনেছি খনি-ক্যাম্প থেকে বিদায় দেয়ার আগে সবাইকে ভাল করেই তল্লাশী করা হয়।'

'ওরা জানত না আমাদের লোক হাতে-পায়ে ক্ষত তৈরি করে তার ভিতর রেখে দেয় হীরা। ঘা শুকিয়ে গেলে বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। আবার এখানে আসার পর বর্শা দিয়ে শরীর

চিরে বের করে পাথর। সব উপহার দেয়া হয় আমার দাদা সর্দার কামাহারেরোকে। তাঁরই নির্দেশে দক্ষিণের কিম্বারলিতে গিয়ে হীরা আনে ওরা।'

'হ্যাসা, কয়েকটা পাথর তো দেখলাম রীতিমত বড়, ওগুলো আনতে গেলে তো ধরা পড়ে যাওয়ার কথা,' বলল জ্যাক।

হেসে ফেলল হ্যাসা। 'হারেরো যোদ্ধাদের অনেকে বিশালই হয়।' বলতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল সে। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে গল্প শেষ করতে। 'বছরের পর বছর এই চলল, ধরো, বিশ বছর ধরে? তারপর সাদামানুষ বুঝল হারেরোরা কী করছে। কয়েক শ' যোদ্ধাকে বন্দি করল তারা, কাউকে ছাড়ল না। যারা পাথর লুকায়নি, তাদেরকেও দোষী হিসাবে বিচার করল। মেরে ফেলা হলো সবাইকে।

'যখন ঠিক সময় আসবে, এসব হীরা বিক্রি করে জার্মান কলোনিয়াল অফিসকে এই দেশ থেকে ভাগিয়ে দেব আমরা।' চকচক করছে মাহারেরোর চোখ। 'আবারও স্বাধীনতা পাব আমরা। জ্যাক, আমার কাছে শপথ করো, এই গুপ্তধনের কথা ভুলেও কাউকে বলবে না।'

কমবয়সী বন্ধুর দিকে চাইল জ্যাক ডাল, আস্তে করে মাথা দুলিয়ে বলল, 'আমি শপথ করছি।'

তার ওই প্রতিজ্ঞা টিকল এক বছরেরও কম।

আঠারো বছর হতেই বাবার মিশন থেকে বিদায় নিল জ্যাক। কাউকে বলেনি কোথায় চলেছে, এমন কী মাকেও নয়। সেজন্য অপরাধ বোধে ভুগল সে। বেচারি মা রয়ে গেল স্টিফেন ডালের অসহ্য অত্যাচার সইতে।

জ্যাকের সবসময় মনে হয়েছে ও সত্যিকারের যোদ্ধা-পুরুষ।

কেন, হ্যাসা মাহারেরোর সঙ্গে বহুবার বিশাল তৃণ-ভূমিতে ক্যাম্প করেনি সে?

কিন্তু যখন পঞ্চাশ মাইল দূরের ট্রেডিং স্টেশনে গিয়ে পৌঁছুল, ততক্ষণে মরতে বসেছে ক্লান্তি ও তৃষ্ণায়। সঙ্গে শুধু জন্মদিনে মা'র দেয়া গোটা কয়েক কয়েন, ওই উপহারই তার একমাত্র সঞ্চয়। জ্যাকের বাবা কোনদিন কোনও উপহার দেয়নি। তার ধারণা, মহান যিশুর জন্মদিনে উৎসব ঠিক আছে, কিন্তু আর কারও জন্মদিন পালন করবার কোনও মানেই হয় না।

কাজেই জ্যাকের কাছে টাকা নেই বললেই চলে।

দু' এক দিন পর বিশটি মোষে টানা ওয়্যাগন নিয়ে কিম্বারলির দিকে রওনা হবে ওয়্যাগন মাস্টার। তার সঙ্গে থাকবে হাতির দাঁত ও লবণাক্ত মাংস। যৎসামান্য যে টাকা আছে জ্যাকের, তাতে কোনওমতে কিম্বারলি যাওয়ার ভাড়া হবে, এরপর প্রায় ফতুর হয়ে যাবে সে।

ওয়্যাগন মাস্টার বয়স্ক লোক, মাথায় বিশাল সাদা হ্যাট, দুই গালের মাঝ পর্যন্ত নেমে এসেছে জুলফি। এ লোকের সঙ্গে রয়েছে দুই ভাই। তারা কেপ কলোনিয়াল অফিস থেকে চারণ-ভূমি লিয নিয়েছিল। কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখে জমির দখল নিয়েছে ম্যাটাবেল উপজাতি। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে জমি উদ্ধার করা অসম্ভব, সুতরাং আবারও দক্ষিণে ফিরছে দুই ভাই। তাদের সঙ্গে রয়েছে হালকা-পাতলা এক লোক, নাম মার্ল গাল্ট। দেখলে মনে হয় ঠিক ক্ষুধার্ত বাজপাখি।

দু' দিন পর রওনা হলো ওয়্যাগন। কয়েক সপ্তাহ ধরে দক্ষিণে চলল ওরা। জ্যাক ডাল বুঝল না মার্ল গাল্ট কী কাজ করে, বা কেন কেপ কলোনি থেকে এত দূরে এসেছিল। অবশ্য এটা বুঝল, ওই লোককে কখনও বিশ্বাস করা চলবে না।

এক সন্ধ্যায় খরস্রোতা বিপজ্জনক এক নদী পেরুল ওরা। মাঝ নদীতে দুর্ঘটনাবশত কেইসিদের এক মোষের পিঠে লাফিয়ে পড়তে হলো জ্যাককে। জন্তুটা হাবুডুবু খেয়ে মরতে বসেছিল,

কিন্তু তাকে ঘোড়ার মত দাবড়ে নিয়ে অপর তীরে উঠল সে। এরপর নদীর তীরেই ক্যাম্প করল সবাই। বিকেলে বন্দুক দিয়ে গিনি ফাউল শিকার করেছে কাইল কেইসি। কাজেই সে রাতে সবাই ক্যাম্প-ফায়ারের চারপাশে বসবার পর কয়েকটা মদের বোতল বের করল মার্ল গাল্ট। ওই ব্র্যাণ্ডি কমদামি কড়া স্পিরিট বললেও চলে। মাংস খাওয়ার ফাঁকে দেখতে না দেখতে ফুরিয়ে গেল দুই বোতল মদ।

জীবনে এই প্রথম অ্যালকোহল স্পর্শ করল জ্যাক ডাল। প্রথম চুমুকে তার মনে হলো পৃথিবী সত্যিকারের আনন্দধাম। পরের তিন পেয়ালা তার মুখের আগল খুলে দিল।

কিছুক্ষণ পর আলাপের মোড় ঘুরে গেল। সোনা, রূপা ও হীরার খনি নিয়ে শুরু হলো গল্প। কথা হতে লাগল প্রায় প্রতিদিনই মিলছে হীরার খনি, সোনার রিফ ইত্যাদি। দেখতে না দেখতে বড়লোক হয়ে যাচ্ছে লোকে। আজ যে ফকির, পরদিনই সে আমির।

এসব শুনতে গিয়ে জ্যাক ডালের মনে হলো তারও কিছু বলা উচিত। বুকের ভিতর থেকে কে যেন সতর্ক করল: বন্ধু হ্যাসার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ তুমি। কিন্তু নিজেকে সামলে রাখা কঠিন হয়ে উঠল। রুক্ষ ও কঠোর এই মানুষগুলো খনির ব্যাপারে কতই না জানে, সে তুলনায় কিছুই তো সে জানে না! হুঁশিয়ার লোক এরা, বিশেষ করে জিম উফোর্ড ও মার্ল গাল্ট। হঠাৎ জ্যাকের মনে হলো এদের কাছ থেকে সম্মান আদায় করতে হবে ওকে। বুঝল, এ জীবনে এর বেশি কিছু চায়নি। কাজেই ঠিক করে বুঝবার আগেই মুখ খুলল সে। ব্র্যাণ্ডির নেশায় বলতে লাগল ওর জানা আছে কোথায় আছে বারোটা ঘটি ভরা আকাটা হীরাখণ্ড। এটাও জানিয়ে দিল রাজার বাড়িতে পাওয়া যাবে সব।

'এসব তুমি কোত্থেকে জানলে, ছেলে?' কেউটের মত ফোঁস

করে উঠল মার্ল গাল্ট।

'কারণ এই ছেলের বাবা হারেরোল্যাণ্ডের যাজক,' বলল জিম উফোর্ড। জ্যাকের দিকে চাইল। 'এখন বুঝছি কেন তোমাকে চেনা চেনা লাগছিল। বছর পাঁচেক আগে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হয়। রাজার কাছে গিয়েছিলাম, তার এলাকায় শিকারের অনুমতি নিতে।' সবার উপর চোখ বুলিয়ে নিল উফোর্ড। 'সে সময় হারেরোদের সঙ্গে বাস করত ওরা।'

'আমরা ছয় বছর ধরে ওদের সঙ্গে আছি,' গর্ব ভরে বলল জ্যাক। 'ওরা আমাকে চেনে, বিশ্বাসও করে।'

এরপর পনেরো মিনিট পেরুনোর আগেই খোলাখুলি আলাপ শুরু হলো— তারা হীরার পাত্রগুলো চুরি করলে কেমন হয়?

জ্যাক ডাল অবশ্য সবাইকে জানিয়ে দিল, প্রত্যেকে একটার বেশি ঘটি নিতে পারবে না। অন্য সাতটা থাকবে হারেরো রাজার জন্য। এতে যদি সবাই রাজি না হয়, তো বলবে না সে কোথায় রয়েছে হীরাগুলো।

সবাই একবাক্যে রাজি হয়ে গেল।

আরও এক শ' মাইল দক্ষিণে এসে ট্রেডিং পোস্টে পৌঁছুল ওরা। ওয়্যাগন ও তার ভিতরের সমস্ত মালামাল অর্ধেক দামে বিক্রি করে দিল জিম উফোর্ড। সে টাকায় সবার জন্য কেনা হলো ঘোড়া ও প্রয়োজনীয় মালামাল। এরইমধ্যে উফোর্ড ঠিক করে ফেলল, একবার চুরি ধরা পড়লে কীভাবে হারেরো রাজ্য থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। ওরা যে ট্রেডিং পোস্টে পৌঁচেছে, সেখান থেকে গেছে টেলিগ্রাফের তার। অন্যরা তিনদিন বিশ্রাম নিল, কিন্তু এ সময়ে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে উফোর্ড কেপ টাউনের পরিচিত এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে চুক্তি করে ফেলল। প্রচুর টাকা দিতে হবে তাকে, কিন্তু পরোয়া করল না, কারণ সে জানে, যে কাজ করতে চলেছে, তাতে হয় সে কোটিপতি হবে, নইলে শুকনো লাশ হয়ে

পড়ে থাকবে কালাহারি মরুভূমিতে।

রাজার ক্রালে লুকিয়ে পৌঁছুনো সম্ভব হলো না। আগেই রাজার কানে বার্তা পৌঁছে গেল, তাঁর রাজ্যে ঢুকেছে কয়েকজন সাদামানুষ। তাতে সমস্যা হলো না, জিম উফোর্ডকে আগে থেকেই চেনেন রাজা। তা ছাড়া, যাজক ব্যস্ত ছেলেকে ফিরে পেতে। জ্যাকের ধারণা হলো: আসলে ওকে পেটাতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে বাবা।

সীমান্ত থেকে রাজার ক্রাল পর্যন্ত পৌঁছুতে লাগল সাত দিন। অভিযাত্রীদেরকে নিজে অভ্যর্থনা দিলেন রাজা। তিনি জিম উফোর্ডের সঙ্গে টানা এক ঘণ্টা স্থানীয় ভাষায় আলাপ করলেন। নিজ রাজধানী থেকে তাঁকে অন্যত্র সরে যেতে বাধ্য করেছে জার্মান কলোনিয়াল অফিস। রাজাকে বাইরের দুনিয়ার সব খবর জানাল গাইড। তার কথা শেষে রাজা জ্যাককে জানালেন, তার বাবা-মা ঝোপঝাড়ের অঞ্চলে গেছেন। সে এলাকায় একদল মহিলা ও বাচ্চাকে ব্যাপটাইয করবেন স্টিফেন। তাঁদের ফিরতে দু'দিন লাগবে। এ কথা শুনে স্বস্তির শ্বাস ফেলল জ্যাক।

রাতে ওদেরকে এখানে থাকতে অনুমতি দিলেন রাজা। তবে জিম উফোর্ডের অনুরোধে এককথায় *না* বলে দিলেন, গতবারের মত হারেরো রাজ্যে শিকার করা চলবে না।

'কেউ একটু চেষ্টা করলে তাকে দোষ দেয়া যায় না, ইয়োর হাইনেস,' বলল জিম উফোর্ড।

'সাদামানুষ জোরাজুরি করে, এটা তাদের বাজে অভ্যেস।'

সেইরাতে রণ্ডোভালে ঢুকল ওরা। ছাত পর্যন্ত গাদি দিয়ে রাখা খড়, বাণ্ডিলগুলোর ভিতর দিয়ে ইঁদুরের মত পথ করে নিল তারা। হীরকখণ্ডের কাছে পৌঁছে গেল। চুরি করতে বেশিক্ষণ লাগল না। মার্ল গাল্ট দ্বিতীয় বাটির মাল স্যাডলব্যাগে ভরতেই জ্যাক ডাল বুঝল, প্রথম থেকেই ওকে ঠকিয়েছে এরা। দুই কেইসি ভাইও

বাদ পড়ল না, কয়েক বাটি হীরা ব্যাগে পুরল। শুধু জিম উফোর্ড কথা রাখল, মাত্র একটি পট খালি করল সে।

'আপনি যদি না নেন, আমি নেব,' আঁধারে ফিসফিস করে বলল মার্ল গাল্ট।

'আপনার ইচ্ছে,' বলল উফোর্ড। 'আমি এককথার মানুষ।'

সবার সঙ্গে যথেষ্ট ব্যাগ নেই যে সমস্ত হীরা নেবে। প্যান্টের পকেট ভরল তারা। তারপরও রয়ে গেল চারটে পেট-মোটা ঘটি। সাবধানে আবারও ঘটিগুলো মাটি চাপা দিল জিম উফোর্ড। সাধ্যমত চেষ্টা করল, যাতে সহজে চুরি ধরা না পড়ে। ভোরে আতিথেয়তার জন্য রাজাকে ধন্যবাদ দিল তারা, ক্যাম্প গুটিয়ে রওনা হয়ে গেল। হ্যাসা মাহারেরো জ্যাক ডালের কাছে জানতে চাইল, ওর মাকে কিছু বলতে হবে কি না। জবাবে আমতা আমতা করে জ্যাক বলল, 'তাঁকে বোলো, আমি সত্যিই দুঃখিত।'

মরু-কূপ থেকে একটু দূরে ঢিবির মাথায় শুয়ে পড়েছে জিম উফোর্ড। চোখে টেলিস্কোপ ধরে দেখছে, খুব দ্রুত ছুটে আসছে রাজার সেনাবাহিনী।

সাদামানুষ হীরাগুলো চুরি করবার পর গোটা ইমপি, অর্থাৎ এক হাজার সৈনিক পিছু নিয়েছে হারেরোল্যাণ্ড থেকে। এরপর পাঁচ শ' মাইল পেরিয়েছে তারা। ভয়ঙ্কর ঊষর মরুভূমিতে এসে কমে গেছে বাহিনীর লোকবল। জিম উফোর্ড দেখল, সংখ্যায় এখন তারা দেড় শ' জন। এরাই রাজার সবচেয়ে অনুগত, কষ্টসহিষ্ণু সৈনিক। সঙ্গে খাবার ও পানি নেই বললেই চলে, তারপরও কিছুই পরোয়া না করে ছুটে আসছে। এইমাত্র ঢিবিগুলোর ওপাশে সূর্য উঠেছে, সে রক্তিম রশ্মিতে চকচক করছে বর্শাগুলোর ধারালো ফলা। ওই অ্যাসেগাই নিয়ে যে-কোনও শত্রুর মুখোমুখি হয় হারেরো সৈনিক— শত্রু বধ করে, নইলে বরণ করে

মৃত্যু।

কাইল কেইসির পায়ে টোকা দিল জিম উফোর্ড। দু'জন পিছন দিকে পিছলে নামতে লাগল। শুকনো নদী-খাতে জড় হয়েছে অন্যরা, চিন্তিত এবং ভীত। ঘোড়াগুলো টের পেয়েছে দু' পেয়ে মনিবগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে। বালিতে পা ঠুকছে ওরা, নাড়ছে কানদুটো— যেন অগ্রসরমান বিপদ-সংকেত পেয়ে গেছে।

'সবাই ঘোড়ার পিঠে উঠুন,' নির্দেশ দিল উফোর্ড, ডালের হাত থেকে নিজের ঘোড়ার রাশ নিল।

'আমরা রোদের ভিতর চলব?' জানতে চাইল ডাল।

'হ্যাঁ, এ ছাড়া উপায় নেই। নইলে কামাহারেরোর সৈনিকদের কুঁড়েঘরে শোভা পাবে আমাদের মাথার খুলি। জলদি করো। ওরা মাত্র একমাইল দূরে। ঘোড়া কতক্ষণ আমাদের বইতে পারবে, জানি না। রোদ চড়তে শুরু করেছে।'

জিম উফোর্ড ভাল করেই জানে, গতরাতে যদি মরু-কূপ না পেত, হারেরো সৈনিকরা বাঘের মত ওদের উপর হামলে পড়ত। এখন পর্যন্ত নিজের একটা মাত্র ক্যান্টিন ভরতে পেরেছে সে, কিন্তু এ নিয়ে ভাবতে গেল না, চড়ে বসল ঘোড়ার পিঠে। নদী-খাত থেকে মরুভূমিতে উঠে এল তারা, বাঁক নিয়ে রওনা হয়ে গেল। ঘাড়ে ও পিঠে এসে পড়ল কড়া রোদ।

প্রথম কয়েক মাইল সবাইকে দুলকি চালে ঘোড়া চালাতে দিল জিম উফোর্ড। প্রতি তিন মাইলে হারেরো সৈনিকদের কাছ থেকে এক মাইল করে সরে যেতে লাগল তারা। ততক্ষণে অসহ্য গরম হয়ে উঠেছে মরুভূমি। ঘাম বেরুতে না বেরুতেই শুকিয়ে যেতে লাগল রোমকূপ থেকে। বিরাট হ্যাটের ছায়ায় চোখ বুজে বসে রইল জিম উফোর্ড। তারপরও পাতার ভিতর ঢুকছে জোরালো রশ্মি। বালি-ঢিবির উপর উজ্জ্বল রোদ ফেলছে সূর্য, চারপাশে বিকিরণ হচ্ছে আলোর।

ছাউনির নীচে আড়াল নিয়ে সবার মনে হয়েছে, কালাহারি হয়ে উঠেছে উত্তপ্ত আভেন, কিন্তু এবার খাঁ-খাঁ বালির ঢিবির রাজ্যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল সূর্যের তাপ। ঘোড়ার পিঠে চেপে চলতে গিয়ে জিম উফোর্ডের মনে হলো জীবনে এত কষ্টের কাজ করেনি। ভয়াবহ গরম ও জ্বলজ্বলে আলো পাগল করে দিতে চাইল। যেন ত্বকের ভিতর জ্বলছে দাউদাউ আগুন, মাথার ভিতর গলে পড়ছে ফুটন্ত মগজ। কখনও দু-এক চুমুক পানি নিল, তাতে মোটেও মিটল না তৃষ্ণা, বরং তপ্ত পানি পুড়িয়ে দিল জিভ।

সময়ের কথা ভুলে গেল তারা, মনোযোগ থাকল শুধু সামনের জ্বলন্ত মরুভূমিতে। কখনও কখনও কমপাস দেখল উফোর্ড, নিজ দল নিয়ে পশ্চিমে চলেছে। এমন কোনও ল্যাণ্ডমার্ক নেই যে ওদেরকে পথ দেখাবে। সম্পূর্ণ আন্দাজের উপর ভর করে চলেছে উফোর্ড। এ ছাড়া কোনও উপায়ও নেই।

সূর্যের সঙ্গী হয়ে অত্যাচারী হয়ে উঠল তপ্ত হাওয়া। জিম উফোর্ডের ধারণা হলো, তারা রয়েছে দক্ষিণ আটলান্টিক উপকূল থেকে বিশ মাইল দূরে। সাগর থেকে ঝিরঝিরে হাওয়া আসবার কথা, কিন্তু বদলে পিছন থেকে এল আগুনের হল্কার মত লূ-হাওয়া। যেন ওদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। মনে মনে প্রার্থনা করল উফোর্ড: এখন কমপাস ঠিক থাকলে হয়। ওই কাঁটাই দেখিয়ে দেবে কীভাবে খ্যাপা মরুভূমি পেরিয়ে পশ্চিম উপকূলে পৌঁছুতে হবে। একটু পর পর কমপাস দেখছে উফোর্ড, খুশি যে পিছনে এক সারিতে আসছে অন্যরা, তারা দেখবে না ওর চিন্তিত চেহারা।

হাওয়ার দাপট ক্রমেই বাড়ছে। একবার পিছন ফিরে চাইল উফোর্ড। ওর সঙ্গীরা ঠিকমতই আসছে। তবে পিছনে ফেলে আসা বালির ঢিবির চূড়া হারিয়ে গেছে, ওখানে আছে শুধু ঝোড়ো হাওয়ায় ভেসে ওঠা বালির চাদর। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত

ধরে ছুটে আসছে বালির পুরু দেয়াল। প্রথম ঝাপটা পুড়িয়ে দিতে চাইল ত্বক, বোজা চোখ থেকে দরদর করে বেরোল পানি। ভয় পেয়ে গেছে উফোর্ড, কু ডাকছে তার মন। তারা সঠিক পথেই চলেছে, কিন্তু এই মৌসুমে এরকম হাওয়া আসবার কথা নয়। ওরা যদি মরুঝড়ের ভিতর পড়ে, নিরাপদ কোনও আশ্রয় না পেলে বাঁচবে না কেউ।

একবার ভাবল, সবাইকে থামতে বলবে, একটা ছাউনি তৈরি করে অপেক্ষা করবে। কিন্তু সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। উপকূল এখনও বহু দূরে, মরুঝড় হোক বা না হোক, ঠিকই আসবে রাজার সেনাবাহিনী, একজনকেও বাঁচতে দেবে না। সূর্যাস্ত হতে এখনও এক ঘণ্টা। তুমুল বাতাস পিঠে নিয়ে এগুতে লাগল উফোর্ড। নাক নিচু করে ছুটছে ঘোড়া। তবে গতি কমে গেছে। তারপরও সেনাবাহিনীর গতির চেয়ে ঢের বেশি এগুতে পারছে।

আরও কিছুক্ষণ পর নাম-চিহ্নহীন এক ঢিবির উপর উঠে এল উফোর্ড। হঠাৎ টের পেল সামনে নতুন কোনও বালির স্তূপ নেই। অনেক নীচে চোখে পড়ল ধূসর পানির বিস্তার। খুশিতে ফুঁপিয়ে উঠল উফোর্ড। ওই যে দেখা যায় দক্ষিণ আটলান্টিক! প্রথমবারের মত লবণাক্ত পানির ঘ্রাণ পেল সে। মাথার উপর সাদা ফেনা নিয়ে গম্ভীর আওয়াজ তুলে একের পর এক ঢেউ আছড়ে পড়ছে চওড়া সৈকতে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল উফোর্ড, সারাদিন স্যাডলে বসে টনটন করছে তার নিতম্ব ও কোমর। শরীরে এত জোর নেই যে হই-হই করে উঠবে। নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। ঠোঁটে ফুটে উঠেছে চওড়া হাসি। বহু দূরে ওই কালো পানির ওপাশে হারাতে বসেছে সূর্য।

'কী হয়েছে, মিস্টার উফোর্ড? আপনি থামলেন কেন?' বিশ গজ দূর থেকে জানতে চাইল চার্লস কেইসি, ঘোড়া নিয়ে উঠে

আসছে ঢিবির উপর।

ফেলে আসা পথে চোখ বুলিয়ে নিল জিম উফোর্ড। চার্লসের ভাই একটু পিছনে। তারপর ঘোড়ার পিঠে ঝুলে আসছে জ্যাক ডাল। এখনও মার্ল গাল্টকে দেখা যাচ্ছে না। 'আমরা তীরে পৌঁছে গেছি।'

আর কিছুই বলল না উফোর্ড। ঘোড়া দাবড়ে ঢিবির উপর উঠে এল চার্লস কেইসি। সামনে বিস্তৃত সাগর দেখেই বিকট চিৎকার ছাড়ল সে। লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল, উফোর্ডের কাঁধ চাপড়ে দিতে লাগল। 'জানতাম আপনি ব্যর্থ হতে পারেন না, মিস্টার উফোর্ড! জানতাম আপনি ঠিকই তীরে পৌঁছে দেবেন!'

হাসল উফোর্ড। 'সন্দেহ করা উচিত ছিল। আমি নিজেই জানতাম না পারব কি না।'

পরবর্তী দশ মিনিটে ঢিবির উপর জড় হলো সবাই। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা মার্ল গাল্টের। উফোর্ড ধারণা করল, লোকটা রেশন না করে গোপনে ভোর থেকে পানি গিলছে।

'তা হলে সাগরের তীরে পৌঁছে গেলাম,' দমকা হাওয়ার উপর দিয়ে কোনমতে বলল মার্ল গাল্ট। 'এবার কী? পিছন থেকে ছুটে আসছে একদল জংলি!' কাঁপা আঙুল আটলান্টিকের দিকে তাক করল সে। 'আর আপনাদের বোধহয় মনেই নেই সাগর থেকে এক ফোঁটা খাবার পানি পাব না!'

জুয়াড়ীর হতাশার কথাকে পাত্তা দিল না উফোর্ড, পকেট থেকে বের করল হাণ্টারের অর্ধেক বামগার্ট, ডুবন্ত সূর্যের আলোয় ওটা দেখল। 'এখান থেকে এক বা দুই মাইল দূরে থাকবে উঁচু একটা টিলা। এক ঘণ্টার ভিতর ওটার চূড়ার উপর উঠতে হবে।'

'তারপর কী হবে?' জানতে চাইল জ্যাক ডাল।

'তারপর দেখব, আমি সত্যিকারের ন্যাভিগেটর কি না।'

চারদিকের অন্য ঢিবির চেয়ে অনেক উঁচু এই বালির ঢিবি।

দুই শ' ফুট নীচে সৈকত। ঢিবির চূড়ার উপর তুমুল হাওয়া বইছে। ভীত হয়ে উঠেছে ঘোড়াগুলো, বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে একই জায়গায়। বাতাসে ভাসছে পুরু বালির চাদর। দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল দলটি। দুই কেইসি ভাই ও মার্ল গাল্ট গেল উত্তর দিকে, দক্ষিণ দিক দেখতে গেল জ্যাক ডাল ও উফোর্ড।

কালো আঁধার ঘনিয়ে ডুবছে সূর্য। পকেট-ঘড়ি বের করে সময় দেখল উফোর্ড: সন্ধ্যা সাতটা। *ওদের তো আগেই সিগনাল দেয়ার কথা!* ওর মনে হলো পেটের ভিতর ভারী পাথরের মত কী যেন চেপে বসছে। সবাই বড় বেশি ভরসা করছে তার উপর। শত মাইল মরুভূমি পাড়ি দিয়ে এসেছে, তারপরও আশা করছে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেবে তাদেরকে। কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, কে জানে, ওরা হয়তো রন্দেভু থেকে এক শ' মাইল দূরে কোনও পয়েন্টে পৌঁচেছে!

'ওই যে!' চেঁচিয়ে উঠল ডাল, আঙুল তাক করেছে বহু দূরে। চোখ সরু করে আঁধারের দিকে চেয়ে রইল উফোর্ড। সাগর উপকূলে লাল বলের মত কী যেন একটা ঝুলছে। বাতিটা মাত্র এক সেকেণ্ড দেখা গেল, তারপর হারিয়ে গেল।

কোনও লোক সাগর-সমতলে তিন মাইলের বেশি দেখবে না, কিন্তু টিলার উপর উফোর্ডের দৃষ্টিসীমা দু' পাশে বেড়েছে সাড়ে আঠারো মাইল। তা ছাড়া, অনেক উপরে উঠেছে জ্বলজ্বলে ফ্লেয়ার। উফোর্ড আন্দাজ করল, উপকূলে রন্দেভুর জায়গা এখান থেকে বড়জোর বিশ মাইল দূরে। গর্ব হলো তার। ধূ-ধূ মরুভূমি ও ঢিবির রাজ্য পাড়ি দিয়ে প্রায় সঠিক জায়গাতেই পৌঁছে গেছে! কেউ বলতে পারবে না ভাল ন্যাভিগেশন করেনি সে!

ভীষণ কষ্টকর আটচল্লিশটা ঘণ্টা পার করেছে তারা, বহু পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে এখানে। বারবার মনে হয়েছে, এবার মরতেই হবে। কিছুক্ষণ পর আবারও জড় হলো দলটি। কারও বুঝতে

দেরি হলো না, সময় হয়েছে কষ্ট ফুরাবার। বদলে পেতে চলেছে বিপুল সম্পদ। আর মাত্র কয়েক মাইল যেতে হবে, তা হলেই মহাবিপদ থেকে সরে যেতে পারবে।

বালির অসংখ্য ঢিবি মরুঝড় থেকে আড়াল দিয়েছিল সৈকতকে, কিন্তু এখন প্রচুর বালি গিয়ে পড়ছে অগভীর পানিতে। একটু আগে ঢেউয়ের ফেনা ছিল সাদা, কিন্তু এখন হয়ে উঠছে কাদাটে। শত শত টন বালি পড়ছে সাগরের পানিতে, আগের চেয়ে অনেক ধীরে দুলছে ঢেউ, শ্লথ ভাবে লুটিয়ে পড়ছে তীরে।

মাঝরাতে ছোট একটা জাহাজের আলো দেখল ওরা, ওটা তীর থেকে বড়জোর এক শ' গজ দূরে। পেটা লোহা দিয়ে তৈরি খোল, ইঞ্জিন চলে কয়লার আগুনে। মালবাহী জাহাজ, দৈর্ঘ্যে মাত্র দুই শ' ফুট। সুপারস্ট্রাকচার বেশ পিছনে। মাত্র একটা চিমনি। সামনের দিকে চারটে হ্যাচ আড়াল দিয়েছে হোল্ডকে। দুটো লম্বা ও সরু ডেরিক দাঁড়িয়ে রয়েছে। বালিঝড় বয়ে চলেছে জাহাজের উপর দিয়ে। উফোর্ড নিশ্চিত নয় ওটার বয়লারে এখনও আগুন জ্বলছে কি না। বেশিরভাগ সময় বালির পর্দার আড়ালে থাকছে চাঁদ, বোঝা যাচ্ছে না চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে কি না।

স্টিমারের সামনে থামল সবাই, স্যাডলব্যাগ থেকে ছোট একটা ফ্লেয়ার বের করল জিম উফোর্ড। আকাটা হীরা ছাড়া ওটাই একমাত্র জিনিস, যেটা সে ফেলে আসেনি। ম্যাচ ধরিয়ে ফ্লেয়ার জ্বেলে নিল, মাথার উপর তুলে দোলাতে লাগল। সেই সঙ্গে চলল গলা ফাটানো চিৎকার। ঝড়ের শোঁ-শোঁ আওয়াজকে হার মানাতে চাইছে। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে চিৎকার শুরু করল সবাই। মনের ভিতর প্রত্যেকে জানে, খানিক পরই মিলবে নিরাপত্তা।

জাহাজের ফ্লাইং ব্রিজে জ্বলে উঠল সার্চলাইট। ধুলোবালির ভিতর দিয়ে আলো এসে পড়ল সবার উপর। বাতির ভিতর নাচতে শুরু করেছে সবাই, ভয় পেয়ে সরে গেল ঘোড়াগুলো।

কয়েক মুহূর্ত পর একটা ডোরি নামানো হলো জাহাজ থেকে। পেশাদারি দক্ষতায় বৈঠা বেয়ে আসছে দুই নাবিক। কিছুক্ষণের ভিতর তীরের কাছে পৌঁছে গেল নৌকা। তৃতীয় এক লোকও রয়েছে নৌকায়। পানির ধারে চলে এল অভিযাত্রীরা। ঠিক তখনই বালির ভিতর ঘ্যাঁচ করে আটকে গেল নৌকা।

'কে, জিম উফোর্ড নাকি?' একটা মোটা কণ্ঠ বলে উঠল।

'আর কাকে আশা করছ, টিম!'

এইচএমএস চ্যালেঞ্জারের ফার্স্ট অফিসার টিম হেণ্ডারসন, ডোরি থেকে লাফ দিয়ে হাঁটু পানিতে নামল সে। 'আগে কখনও এমন বানোয়াট গল্প শুনিনি। নাকি সত্যিই কাজটা করেছ তুমি, উফোর্ড?'

নিজের স্যাডলব্যাগ তুলে দেখাল গাইড। ঝাঁকি দিল বার কয়েক। তবে দমকা হাওয়ার গর্জনে হীরাখণ্ডের খটাখট আওয়াজ শোনা গেল না। 'যদি না-ই আসতাম, তোমরা সবাই মিলে কাঁদতে যে এত টাকা গচ্চা দিয়েছ। ...কবে এসেছ?'

'পাঁচদিন আগে। প্রতি রাতে সাতটার সময় একটা করে ফ্লেয়ার জ্বেলেছি।'

'তোমার জাহাজের ক্রোনোগ্রাফ ঠিক নেই, এক মিনিট স্লো চলছে।' কাউকে পরিচয় করিয়ে দিল না উফোর্ড। বদলে বলল, 'টিম, পিছন থেকে দেড় শ' হারেরো সেনা আসছে। তাড়াতাড়ি জাহাজ নিয়ে সরে পড়তে হবে।'

পরিশ্রান্ত নাবিকদের নির্দেশ দিতে শুরু করল টিম হেণ্ডারসন, তারপর অভিযাত্রীদের উদ্দেশে বলল, 'আপাতত সৈকত থেকে সরতে পারব না।'

তার নোংরা ইউনিফর্ম জ্যাকেটের আস্তিন ধরল উফোর্ড। 'কেন, কী হয়েছে?'

'জোর ভাটা, তার উপর জাহাজের খোল আটকে গেছে বালির

চড়ায়। এদিকের তীরে বালির বাঁধ খুব বিপজ্জনক। তবে পরের জোয়ারে বেরিয়ে যাব সাগরে। বেশি ভেবো না।'

'একটা কথা,' নৌকায় উঠল না উফোর্ড, 'তোমার সঙ্গে পিস্তল আছে?'

'কী? কেন?'

কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে চাইল গাইড। ওখানে জড় হয়েছে ভীত ঘোড়াগুলো। আরও বাড়ছে বালিঝড়।

'যতটুকু মনে পড়ে ক্যাপ্টেনের কাছে পুরনো একটা ওয়েবলি আছে,' বলল টিম হেণ্ডারসন।

'তুমি ওটা এনে দিলে খুব খুশি হব।'

'ঘোড়ার জন্য সময় নষ্ট করার দরকার কী?' আয়াস করে ডোরিতে উঠে বসেছে মার্ল গাল্ট।

'ওরা না থাকলে সবাইকে মরতে হতো। চাই না অভিশপ্ত সৈকতে ধীরে ধীরে কষ্ট পেয়ে মরুক।'

'আমি এনে দেব পিস্তল,' কথা দিল টিম হেণ্ডারসন।

ধাক্কা দিয়ে নৌকা ভাসিয়ে দিল উফোর্ড, ঘোড়াগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল। কানের কাছে আদুরে গলায় গল্প শোনাতে লাগল, মাথা ও ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিল।

পনেরো মিনিট পর ফিরল টিম হেণ্ডারসন, নীরবে বাড়িয়ে দিল পিস্তল।

এক মিনিট পর ক্লান্ত ভঙ্গিতে নৌকায় উঠল উফোর্ড, পাথরের মত মুখ করে বসে রইল। বৈঠা মেরে ওকে জাহাজের দিকে নিয়ে চলল হেণ্ডারসন।

ওয়ার্ডরুমে সবাইকে পেল উফোর্ড। তারা ব্যস্ত হয়ে প্লেট ভরা খাবার সাবাড় করছে, চোঁ-চোঁ করে মেটাচ্ছে পিপাসা। এরইমধ্যে সবজেটে হয়ে উঠেছে চেহারা। তাদের পাশেই বসল উফোর্ড, সাবধানে পানিতে চুমুক দিতে লাগল। আগেই অফিসারদের মেসে

খাওয়া শেষ হয়েছে, তবে রয়ে গেছে স্টু। এক চামচ মুখে নিল উফোর্ড। তখনই ছোট্ট কামরার ভিতর ঢুকলেন ক্যাপ্টেন জোসেফ নাই, সঙ্গে ফার্স্ট মেট টিম হেণ্ডারসন ও জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার।

'শুনেছি নয়টা জান বিড়ালের, তোমার তো দেখছি আরও বেশি, উফোর্ড,' বললেন ক্যাপ্টেন। বিশাল আকৃতির লোক তিনি, দেখতে সাদা ভালুকের মত। সারাদেহ ভরা ঘন রোম, বুক পর্যন্ত কুচকুচে কালো দাড়ি। 'অন্য কেউ বললে এককথায় তাকে মানা করে দিতাম।'

দু'জনই হাসছে, আন্তরিক ভাবে করমর্দন করল। 'তুমি যত টাকা দাবি করেছ, জানতাম নরকের আগুন নিভে গেলেও গ্যাঁট মেরে এখানে অপেক্ষা করবে।'

'কই, এখনও তো একটা পয়সাও ছাড়লে না!' ডান ভুরু কপালে তুললেন ক্যাপ্টেন নাই।

টেবিল থেকে মেঝেতে স্যাডলব্যাগ নামাল উফোর্ড, বাকল খুলতে লাগল। ঝুঁকে এল জাহাজের ক্রুরা, চোখে জ্বলজ্বলে লোভ। ফ্ল্যাপ খুলল উফোর্ড, ব্যাগের ভিতর মুঠো ভরে কী যেন খুঁজছে। কয়েক মুহূর্ত পর পছন্দমত জিনিস পেয়ে বের করে আনল হাত, টেবিলের উপর রাখল পাথরটা। হাঁ হয়ে গেল ক্রুরা। ওয়ার্ডরুমের ছাত থেকে ঝুলছে দুটো লণ্ঠন, সেই ম্লান হলুদ আলোয় নিতান্তই সাদামাটা একটা পাথর! কিন্তু চেনে ওরা আসলে ওটা অত্যন্ত দামি এক মস্ত হীরকখণ্ড।

'এতেই তোমার খরচ উঠে যাবে,' বলল উফোর্ড।

'বাড়তিও থাকবে,' মাথা দোলালেন ক্যাপ্টেন নাই। ভক্তির সঙ্গে এই প্রথম স্পর্শ করলেন পাথরটা।

ভোর ছয়টা। বদ্ধ কেবিনের ভিতর ঘুটঘুটে আঁধার। কাঁধে ধাক্কা দিল রুক্ষ একটা হাত, অর্ধসচেতন হলো জিম উফোর্ড। আবার

পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়তে চাইল। আবছা ভাবে ভাবল, টিম হেণ্ডারসনের ডিউটি এত তাড়াতাড়ি শেষ? এখনই বাঙ্ক ছেড়ে দিতে হবে?

'জিম উফোর্ড, জলদি ওঠো!'

'ওফ্! কেন, কী হয়েছে?' চোখ খুলল না উফোর্ড।

'শিগ্‌গির ওঠো!'

তিক্ত স্বরে বলা হয়েছে। টিম হেণ্ডারসনেরই গলা।

ধড়মড় করে উঠে বসল জিম উফোর্ড। পায়ের কাছে পোশাক হাতড়ে নিল। ঝুরঝুর করে বালি পড়ছে প্যান্ট থেকে। 'কী হয়েছে?'

'নিজের চোখকে বিশ্বাস করবে না!'

দ্রুত প্যান্ট পরল উফোর্ড, কাঁধে চড়িয়ে নিল শার্ট। টের পেয়েছে, বাইরে বইছে তুমুল ঝড়। হিংস্র জানোয়ারের মত গোঁ-গোঁ গর্জন ছাড়ছে জোরালো হাওয়া, খুবলে তুলতে চাইছে জাহাজের মাংস। প্রবল হাওয়ার তোড়ে থরথর করে কাঁপছে লোহার জলযান। উফোর্ডকে পথ দেখিয়ে ব্রিজে নিয়ে এল হেণ্ডারসন। উইণ্ডস্ক্রিন দিয়ে আসছে মরাটে ধূসর আলো, চ্যালেঞ্জারের বো দেখা গেল না। অথচ মাত্র দেড় শ' ফুট দূরে ওটা। এক পলকে উফোর্ড বুঝল, মূল সমস্যা কোথায়। ফ্রেইটারের ডেকে পড়েছে শত শত টন বালি। এখন ভরা জোয়ার, কিন্তু ডেকের বালির বিপুল ওজন জাহাজের খোলকে গেঁথে দিয়েছে সাগর-তলে। অন্য কারণে ভড়কে গেল জিম উফোর্ড। গতরাতে তীর ছিল এক শ' গজ দূরে, কিন্তু এখন পঞ্চাশ গজ এগিয়ে এসেছে!

হাজার কোটি বছর ধরে চলছে কালাহারি মরুভূমি ও আটলান্টিক মহাসাগরের এই দ্বন্দ্ব। উভয়েই চাইছে নিজ এলাকা বাড়িয়ে নেবে। একপক্ষের রয়েছে বিপুল পরিমাণ বালি, অন্য

পক্ষের বিশাল জলরাশি আর ঢেউ। প্রতিনিয়ত বদলে চলেছে আফ্রিকার উপকূল। পৃথিবীর শুরু থেকেই পাল্টে যাচ্ছে সাগরের স্রোত, নিয়মিত আসছে জোয়ার-ভাটা, কিন্তু ক্রমশ এক ফুট এক ফুট করে সামনে বাড়ছে কালাহারি মরুভূমি। এমনও হয়েছে, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টায় সামনে বেড়েছে এক মাইল। দুই দানবীয় পক্ষের কোনও খেয়ালই নেই মাঝে পড়ে কেমন হিমশিম খাচ্ছে ছোট্ট জাহাজটা।

'প্রত্যেককে লাগবে এখন, কোদাল দিয়ে বালি ফেলতে হবে,' বললেন ক্যাপ্টেন নাই। কালো হয়ে গেছে মুখ। 'ঝড় যদি না থামে, সন্ধ্যার আগেই জাহাজ আটকা পড়বে মরুভূমির ভেতর।'

হেণ্ডারসন ও উফোর্ড গিয়ে ঘুম থেকে ডেকে তুলল ক্রুদেরকে, তাড়িয়ে নিয়ে এল উপরে। ইঞ্জিনরুম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে কোদাল ও কিচেনের প্যান। ক্যাপ্টেনের বাথরুমের বালতিও বাদ পড়েনি। সব নিয়ে ঝড়ের ভিতর বেরুল সবাই। শোঁ-শোঁ হাওয়া উড়িয়ে নিতে চাইল ওদের। রুমাল দিয়ে বেঁধে নিয়েছে নাক-মুখ। এতই জোরালো হাওয়া বইছে, কেউ কারও কথা শুনতে পেল না। ব্যস্ত হয়ে ডেক থেকে বালি ফেলতে লাগল। কপালকে দোষ দিয়ে চলেছে। এক কোদাল বালি ফেলতে না ফেলতেই প্রবল হাওয়া সবটুকু মুখের উপর এনে ফেলছে। বালির পুরু চাদর উড়ছে চারপাশে। ডেকের উপর দেখতে দেখতেই বাড়ছে ঢিবি।

এ যেন ভয়ঙ্কর শক্তিশালী এক জোয়ার, একে ঠেকানো যায় না। ওরা হয়তো একটা হ্যাচ পরিষ্কার করছে, কাজ শেষ হতে না হতেই টের পাচ্ছে, অন্য তিন হ্যাচ চাপা পড়েছে চার ফুট বালির চাপড়ার নীচে। পাঁচ অভিযাত্রী ও বিশজন ক্রু হতক্লান্ত হয়ে পড়ছে। সামনে তিন ফুটের বেশি দৃষ্টি চলে না। অন্ধের মত কাজ করে যাচ্ছে সবাই। শক্ত করে বুজে রেখেছে চোখ। শরীরে তীক্ষ্ণ পিনের মত বিঁধছে বালিকণা ও কাঁকর। মহা আক্রোশে অসহায়

জাহাজটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে খ্যাপা মরুঝড়।

একঘণ্টা বদ্ধ পাগলের মত কাজ করল সবাই, তারপর টিম হেণ্ডারসনের খোঁজে গেল জিম উফোর্ড। ব্রিজে ঢুকে বলল, 'এভাবে অযথা শক্তিক্ষয় করে কোনও লাভ নেই। ঝড় কমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।' টিম হেণ্ডারসনের কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে কথা বলেছে সে। ভয়ঙ্কর ঝড়ের কারণে একই কথা তৃতীয়বার বলতে হলো।

'ঠিকই বলেছ,' চেঁচাল ফার্স্ট মেট।

ঝড়ের ভিতর বেরুল তারা, সবাইকে ফিরিয়ে আনবে।

পাঁচ মিনিট পর টলতে টলতে সুপারস্ট্রাকচারের ভিতর এসে ঢুকল ক্রুরা, প্রতি পদক্ষেপে জামা-কাপড় থেকে ঝুর-ঝুর করে পড়ছে বালি। সবার পিছনে এল উফোর্ড ও গাল্ট।

গাইডের দায়িত্ব কেউ আসতে বাদ পড়েছে কি না, তা দেখা।

তুমুল ঝড়ের ভিতর কমপ্যানিয়নওয়েতে কারও কণ্ঠ শোনা কঠিন হয়ে উঠেছে।

'হায়, যিশু! এই অভিশপ্ত ঝড় থামিয়ে দিন, ঈশ্বর!' চেঁচিয়ে উঠল জ্যাক ডাল, ভয় পেয়ে ফোঁপাতে শুরু করেছে।

'সবাই ফিরতে পেরেছে?' জানতে চাইল হেণ্ডারসন।

'মনে তো হয়,' একটা বাল্‌কহেডে হেলান দিয়ে দাঁড়াল উফোর্ড। 'তুমি মাথা গুণে দেখোনি?'

নিজের ক্রুদের গুণতে শুরু করল টিম হেণ্ডারসন। এমন সময় হ্যাচওয়ের উপর জোরালো করাঘাত হলো।

'আয়-হায়, এই ঝড়ে বাইরে কে!' একজন বলে উঠল।

হ্যাচের সবচেয়ে কাছে রয়েছে মার্ল গাল্ট, সে খুলে দিল ছিটকিনি। তুমুল হাওয়ায় দড়াম করে খুলে গেল কবাট। মেঘের মত ঢুকল বালিকণা, দেয়াল থেকে ঘষে তুলল সাদা রং। দরজায় কেউ নেই, বোধহয় খোলা কোনও ইকুইপমেণ্ট আছড়ে পড়েছে।

টলতে টলতে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে চাইল মার্ল গাল্ট। প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে কবাট, এমন সময় দীর্ঘ রুপালি একটা ফলা তার পিঠ ভেদ করে বেরিয়ে এল! বর্শার ডগা থেকে টপটপ করে পড়ছে তাজা রক্ত! পরক্ষণে এক টানে ক্ষত থেকে বের করে নেয়া হলো ফলা। ছিটকে বেরুল রক্ত। চমকে গেছে সবাই। চরকির মত ঘুরেই ধুপ করে ডেকের উপর পড়ল জুয়াড়ী। মস্ত হাঁ করে নিঃশব্দে কী যেন বলতে চাইল। শার্ট ভরে উঠেছে লাল রঙে। ঘরে এসে ঢুকেছে কুচকুচে কালো এক লোক। মাথায় গোঁজা পাখির পালক, কোমরে এক টুকরো কাপড়। হাতে বর্শা নিয়ে জুয়াড়ীর পাশে থেমেছে সে। পিছনে আরও অনেক লোক, তেড়ে আসছে! ঝড়ের উপর দিয়ে শোনা গেল ওদের ভয়াল হুঙ্কার!

'হারেরো ইমপি!' প্রলাপের মত করে বলল জিম উফোর্ড।

ঝড়ের মতই এল হারেরো রাজার সেনারা।

ওই প্রবল ঝড় ছিল দামাল প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল। প্রায় প্রতি শতাব্দিতে এমনি করেই খেলে সে। এবারের তুমুল ঝড় চলেছে দশ দিন ধরে, পাল্টে দিয়েছে আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল। বিশাল সব বালির ঢিবি সমান করে দিয়েছে, তৈরি করেছে অন্য কোথাও নতুন বালির টিলা। আগে যেখানে ছিল উপসাগর, সেখানে রয়েছে বালির বিশাল পেনিনসুলা— আঙুল বাড়িয়ে রেখেছে দক্ষিণ আটলান্টিকের শীতল জলের উপর। আফ্রিকা কোথাও কোথাও এগিয়ে গেছে পাঁচ থেকে দশ মাইল। পুরনো শত্রুকে এবার হারিয়ে দিয়ে জিতেছে কালাহারি মরুভূমি। কেউ যদি আফ্রিকার উপকূলের মানচিত্র নতুন করে আঁকতে চায়, তাকে শত শত মাইল বদলে নিতে হবে। কিন্তু কেউ তা করবে না, দক্ষ নাবিক জানে, জাহাজ সরিয়ে রাখতে হবে ওই উপকূল থেকে।

এর কিছুদিন পর এইচএমএস চ্যালেঞ্জার ও ওটার নাবিকদের

বিষয়ে অফিশিয়াল রিপোর্ট প্রকাশিত হলো: *সবই হারিয়ে গেছে আটলান্টিক মহাসাগরে।*

তাদের খুব ভুল হয়নি। তবে ওই জাহাজ শত শত ফুট পানির নীচে নেই, রয়েছে কালাহারির এক শ' ফুট তলে! বরফ-ঠাণ্ডা বেঙ্গুয়েলা স্রোত যেখানে অবিরত আছড়ে পড়ছে আফ্রিকার স্কেলিটন কোস্টে। সেখান থেকে আট মাইল ভিতরে রয়েছে এইচএমএস চ্যালেঞ্জার।

দুই

বর্তমান সময়।

আসিফ হায়দার চৌধুরি-নিকোলাস ক্রিস্টোফার ল্যাবোরেটরিজ।

জেনেভা, সুইটযারল্যাণ্ড।

যেভাবে মরা জানোয়ারের উপর হামলে পড়ে ক্ষুধার্ত শকুন, তেমনি করে মাইক্রোস্কোপের উপর ঝুঁকে পড়েছে ক্যারেন কুম্বস্— অতি মনোযোগ দিয়ে দেখছে স্লাইড। সে যেন কোনও গ্রিক মিথোলজির দেবী, জগৎ ভরা অসহায় মানুষের ছুটোছুটি দেখে আমোদ পাচ্ছে। এক অর্থে ওকে দেবীই বলা যায়। ওই স্লাইডে রয়েছে ওর নিজের তৈরি ইঞ্জিনিয়ার্ড অর্গানিজম। অনেক খাটনি দিয়ে ওটাকে প্রাণ দিয়েছে ক্যারেন।

একঘণ্টার বেশি পেরুল, মাইক্রোস্কোপের আই পিস থেকে চোখ সরায়নি সে। স্লাইডে যা দেখছে, তাতে ক্রমেই হয়ে উঠছে

আত্মবিশ্বাসী।

এত কম সময়ে এমন সফল পরীক্ষা, সত্যিই বিস্মিত হওয়ার মত!

অবশ্য আরও কিছু পরীক্ষা চাই, নইলে ত্রুটি থেকে যেতে পারে কাজে। এ মুহূর্তে সায়েন্টিফিক প্রিন্সিপ্‌ল্ মানল না ক্যারেন, ওর মন বলছে, সব ঠিক পথেই চলছে। স্কোপ থেকে সরিয়ে নিল স্লাইড, পাশের ওঅর্কবেঞ্চের উপর রাখল। বিশাল কামরার পিছন-দেয়ালে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কুলার, ওখানে চলে গেল, প্রকাণ্ড দরজা খুলে বের করে নিল এক গ্যালনের জগ। ভিতরে আরও কয়েকটি জগ রেখেছে সে। প্রতিটির তাপমাত্রা ঠিক আটষট্টি ডিগ্রি ফারেনহাইট।

সঠিক নিয়ম মেনেই তোলা হয়েছে পানি, একদিন পেরুনোর আগেই বিমানে করে পৌঁছে দেয়া হয়েছে গবেষণাগারে। এই এক্সপেরিমেন্টে অত্যন্ত দামি হয়ে উঠছে সাধারণ তাজা পানি। ওর তৈরি প্রাণীর ডিটেইল্ড জিন সিকিউয়েন্স বের করতেও এত খরচ হয়নি।

জগের মুখ খুলল ক্যারেন, নাকের কাছে নিয়ে শুঁকে দেখল। সাগরের পানি, কেমন একটু নোনা গন্ধ। জগের ভিতর ড্রপার নামিয়ে দিল, সামান্য পানি নিয়ে ফেলল স্লাইডের উপর। জগ নিয়ে ফিরে এল ওঅর্কবেঞ্চের পাশে। মাইক্রোস্কোপের নীচে রাখল স্লাইড, দেখছে অতি ক্ষুদ্র প্রাণীগুলোকে। মাত্র কয়েক মিলিলিটার পানিতে অজস্র যুপ্লাংকটন ও ডায়াটম। এককোষী এসব জীব সাগরের ফুড চেইনের প্রথম ধাপ।

গত পরীক্ষায় যেসব মাইক্রোস্কোপিক প্রাণী ও গাছ দেখেছে, সব সরিয়ে রেখেছে আগেই। এখন যেগুলো দেখছে কোনওটা জেনেটিকালি মডিফায়েড নয়।

কিছুক্ষণ পর সন্তুষ্ট হলো ক্যারেন। যাক, ট্র্যান্সপোর্টেশনের

সময় পানির স্যাম্পল সামান্যতমও নষ্ট হয়নি। বিকারের ভিতর আরও একটু পানি দিয়েছে। চোখের সামনে তুলে ধরল বিকার। ওদিক থেকে আসছে ফ্লুরোসেন্ট বাতির আলো, সে-কারণে চকচক করছে বড় ডায়াটমগুলো। ক্যারেন কুম্বস্ কাজে এতই মগ্ন, শুনতে পেল না খুলে গেছে ল্যাবোরেটরির দরজা। ভাবেইনি কেউ বিরক্ত করবে।

'ওটার ভিতর কী?' ভরাট কণ্ঠ শুনে ভড়কে গেল ক্যারেন, আরেকটু হলে ফেলে দিত বিকার।

'ওহ্, ডক্টর চৌধুরি!' নিজেকে সামলে নিতে চাইল ক্যারেন। 'বুঝতে পারিনি আপনি এসেছেন।'

'এই কোম্পানির সবাইকে বলেছি, আমাকে ডক্টর বলতে হবে না। তুমি আমাকে আসিফ বলেই ডেকো।'

সামান্য ভুরু কুঁচকাল ক্যারেন। ডক্টর আসিফ হায়দার চৌধুরিকে দেখে মন্দ লোক বলে মনে হয় না। সবার সঙ্গে নরম স্বরে কথা বলে, কেউ কখনও দেখেনি সে রেগে উঠেছে। আর সে কারণেই সন্দেহ হয়, এ লোকের ভয়ঙ্কর একটা উল্টো রূপ থাকতেও পারে। আসিফ হায়দার চৌধুরি-নিকোলাস ক্রিস্টোফার ল্যাবোরেটরিজে ক্যারেনের মত যেসব কর্মী রয়েছে, তারা ডক্টরেট পাওয়ার জন্য কাজ করলে তাদের প্রতি বাড়তি মনোযোগ দেয় আসিফ হায়দার চৌধুরি। লোকটার বয়স ঊনচল্লিশ। অবিবাহিত। নিয়মিত ব্যায়াম করে সুঠাম দেহ ধরে রেখেছে। সারা বছর স্কিইং করে। সুইস আল্পস্-এ গ্রীষ্ম এলে চলে যায় দক্ষিণ আমেরিকায়। পোশাক-আশাকে মার্জিত, কথা বলে খুব গুছিয়ে। কিছুদিন আগে মুখে প্লাস্টিক সার্জারি করেছে। ফেস লিফটের কারণে টানটান থাকে ত্বক। কেমিস্ট্রির ডক্টরেট, কিন্তু বহুদিন হলো ছেড়ে দিয়েছে ল্যাব ওঅর্ক। নিজে কাজ না করে সময়টা ব্যয় করে সবার উপর নজর রাখার কাজে। এই কোম্পানির

পিছনে প্রচুর সময় দেয়। বিশেষ করে তার বন্ধু, এক্স-পার্টনার নিকোলাস ক্রিস্টোফার কোম্পানি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে।

'ক' মাস আগে বলেছিলে কী যেন এক্সপেরিমেন্ট করবে, এটাই তোমার সেই ফ্লোকিউলেন্ট প্রজেক্ট?' ক্যারেনের হাত থেকে বিকার নিল ডক্টর চৌধুরি, কাঁচের ভিতর দিয়ে ডায়াটমগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

লোকটাকে ল্যাব থেকে বিদায় করতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু মিথ্যা খুব একটা আসে না ক্যারেনের, কাজেই বলল, 'হ্যাঁ, ডক্টর... আই মিন আসিফ।'

'তুমি যখন এই ইন্টারেস্টিং আইডিয়া নিয়ে এলে, আমি ভেবে পাইনি এটা দিয়ে কী করবে,' মন্তব্য করল ডক্টর চৌধুরি। বিকার ফিরিয়ে দিল। 'যাই হোক, আমাদের কাজই তো নানান এক্সপেরিমেন্ট করা। বিশেষ কোনও ভাবনা নিয়ে এগিয়ে চলি আমরা, চেষ্টা করি কোথাও গিয়ে পৌঁছুতে পারি কি না। ...তোমার এই প্রজেক্ট ঠিক মত চলছে?'

'এখন পর্যন্ত তা-ই মনে হচ্ছে,' বলল ক্যারেন। বস ভদ্র ভাবেই আলাপ করছে, কিন্তু তার উপস্থিতিতে মন ছোট হচ্ছে। সত্যি বলতে, বেশিরভাগ লোকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মন খারাপ হয় ওর। এটা বোধহয় কোনও বাজে মানসিক রোগ। শুধু বস নন, যে বাড়িওয়ালী বুড়ির কাছ থেকে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছে, বা সকালে যার ক্যাফে থেকে কফি কেনে, এদের সবাইকে দেখলে মনে হয়, এরা ওর পিছনে সবসময় যা-তা বলছে। 'এখন একটা আনসায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম।'

'গুড! তোমার সঙ্গে আমিও দেখব। কাজ শুরু করো।'

ক্যারেনের হাত কাঁপতে শুরু করেছে, সাবধানে স্ট্যাণ্ডের উপর রেখে দিল বিকার। প্রথম স্লাইড আবার নিল, ওটার ভিতর রয়েছে ইঞ্জিনিয়ার্ড ফাইটোপ্ল্যাংকটন। ড্রপার দিয়ে পানিটুকু টেনে নিল

সে, সব রাখল বিকারের ভিতর।

'তুমি কী নিয়ে কাজ করছিলে, ভুলে গেছি,' মেয়েটির কাঁধের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ডক্টর চৌধুরি। 'আমরা এখন কী দেখতে পাব?'

লোকটা এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কী করতে! ভীষণ অস্বস্তি লাগছে ক্যারেনের। 'আপনি তো জানেন, এসব ডায়াটমের মত ফাইটোপ্ল্যাংকটনের কোষে সিলিকা দিয়ে তৈরি একটিমাত্র দেয়াল আছে। আমি ওই দেয়ালটা গলিয়ে দিতে চাই। সেক্ষেত্রে ভিকুয়োলের ভিতর পাব সেলের ঘন স্যাপ। পানিতে আমার ইঞ্জিনিয়ার্ড স্পেসিমেন স্বাভাবিক ডায়াটমকে আক্রমণ করবে, উন্মত্তের মত নিজের মত সব ডায়াটম তৈরি করবে। এখন যদি সবই ঠিক ভাবে...' মিইয়ে গেল ক্যারেনের কণ্ঠ। আবার বিকারটা তুলে নেবে বলে হাত বাড়াল সে ইনসুলেটেড গ্লাভ্‌সের দিকে। ওটা ছাড়া ধরতেই পারবে না কাঁচ— এত গরম। এবার কাত করে ধরল বিকার, সতর্ক থাকল যেন নীচে না পড়ে পানি। একটু আগের সাদা পানি হয়ে উঠেছে খাবার তেলের মত চটচটে। ল্যাব টেবিলের উপর পানি পড়বার আগেই আবার বিকার রেখে দিল ক্যারেন।

'বাহ্!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ডক্টর চৌধুরি। যেন এইমাত্র জাদু দেখেছে। 'তুমি আঠালো করে দিয়েছ পানিকে।'

'ঠিক তা-ই। গুচ্ছের ভিতর একসঙ্গে আটকা পড়ছে এসব ডায়াটম, আর স্যাপের ভিতর বন্দি হচ্ছে পানি। ...পানি কিন্তু ঠিকই আছে, কিন্তু সাসপেনশনের ভিতর নড়তে পারছে না।'

'অকল্পনীয়! ওয়েল ডান, ক্যারেন, ওয়েল ডান!'

'এখনও পুরো সফলতা আসেনি,' বলল ক্যারেন। 'স্যাপের রিঅ্যাকশন থেকে তৈরি হচ্ছে প্রচণ্ড তাপ। ঠিক ভাবে কাজ করলে এক শ' চল্লিশ ডিগ্রি তাপ তৈরি করবে। সেজন্য বাধ্য হয়ে পুরু

গ্লাভস্ পরতে হয়েছে। এসব ইঞ্জিনিয়ার্ড ডায়াটম থকথকে জেল তৈরি করছে, তবে চব্বিশ ঘণ্টা পর সবই মারা পড়বে, আবারও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে পানি। এই রিঅ্যাকশনের প্রসেস কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আন্দাজ করছি, ওটা কোনও ধরনের কেমিকেল প্রতিক্রিয়া। জানি না একে কীভাবে ঠেকানো যায়।'

'সত্যিই দারুণ জিনিস আবিষ্কার করেছ। ...কিন্তু এ থেকে ঠিক কী আশা করছ? পানিকে আঠালো করে তুললে নিশ্চয়ই কোনও কাজে আসবে? যখন নিকোলাস ক্রিস্টোফার ও আমি অর্গানিক উপায়ে সালফার আটকে ফেললাম, ভেবেছিলাম ওটা দিয়ে পাওয়ার প্লান্টের এমিশন কমাতে পারব। এই প্রজেক্টের পিছনে নিশ্চয়ই তোমার বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য আছে?'

পিটপিট করে চাইল ক্যারেন কুম্বস্। এই লোক এমনি এমনি এত উপরে ওঠেনি। সবকিছুর পিছনে কোনও না কোনও কারণ থাকে, জানতে চাইছে সেটাই। 'আপনি ঠিকই বলেছেন,' বলল ক্যারেন। 'আমি ভেবেছি খনির পুকুরে বা পানি-শোধন প্লান্টে এটা লাগতে পারে। হয়তো ঠেকিয়ে দেয়া যাবে অয়েল স্পিলও।'

'ঠিক বলেছ। ওসব কাজে লাগতে পারে। ...তোমার পারসোনেল ফাইলে দেখেছি, তুমি এসেছ আলাস্কা থেকে।'

'জী, আলাস্কার সিওয়ার্ড থেকে।'

'তুমি বোধহয় এক্সসন ভালদেজের অয়েল স্পিল দেখেছ। তাতে ধ্বংস হয়ে যায় রিফ, সব তেল গিয়ে পড়ে প্রিন্স উইলিয়াম সাউণ্ডে। তখন বোধহয় অর্থনৈতিক কষ্টের ভিতর পড়ে তোমার পরিবার। ওই অয়েল স্পিলে ফতুর হয়ে গিয়েছিল বহু মানুষ।'

বিরক্তি চেপে কাঁধ ঝাঁকাল ক্যারেন। 'আমাদের কিছু হয়নি। আমার বাবা-মা চালাতেন ছোট হোটেল। অয়েল ক্লিনআপ ক্রুরা দক্ষ ছিল, কিন্তু আমার বান্ধবীদের অভিভাবকরা সবই হারান। আমার প্রিয় বন্ধুর বাবা-মা'র ডিভোর্স হয়ে যায়। ক্যানারির চাকরি

হারান ভদ্রলোক।'

মৃদু হাসল ডক্টর। 'জানতাম, এই রিসার্চের পিছনে নিশ্চয়ই তোমার একান্ত ব্যক্তিগত কোনও উদ্দেশ্য আছে।'

মনে মনে রেগে উঠছে ক্যারেন। লোকটা ওকে অপমান করছে? কেমন যেন ছোট করবার ভঙ্গি কণ্ঠে! 'আমার ধারণা, পরিবেশ নিয়ে ভাবে এমন যে-কেউ এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হবে।'

মৃদু হাসল আসিফ হায়দার চৌধুরি। 'নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আমি কী বলতে চেয়েছি? তুমি সেই ক্যান্সার রিসার্চারের মত, যার বাবা-মা মারা গেছেন লিউকিমিয়ায়। বা সেই ফায়ারম্যানের মত, যার বাড়ি ছোটবেলায় পুড়ে ছাই হয়েছে। তুমি কচি বয়সে ভয়ানক একটা দানব দেখেছ, এখন তার বিরুদ্ধে লড়তে চাইছ।' কিছুই বলছে না ক্যারেন কুম্বস। ডক্টর চৌধুরি ধরে নিল ওর মত করেই ভাবছে মেয়েটি। 'শত্রুর উপর প্রতিশোধ নিতে চাইলে, সেজন্য কোনও প্রতিজ্ঞা নিলে, তা খারাপ নয়, ক্যারেন। ক্যান্সার, আগুন, বা ইকোলজিকাল দুঃস্বপ্নের বিরুদ্ধে লড়াই কখনও মন্দ হতে পারে না। এসব ঠেকাতে গিয়ে তোমার মনোযোগ আরও বাড়বে। তুমি শুধু বেতনের জন্য কাজ করছ না। তোমার প্রশংসা না করে পারছি না। আজ রাতে যা দেখলাম, তাতে মনে হয়েছে তুমি সঠিক পথেই যাচ্ছ।'

'আপনাকে ধন্যবাদ,' এ কথা বলতে গিয়ে একটু লজ্জাই পেল ক্যারেন। 'কাজ শেষ করতে এখনও বহু সপ্তাহ বাকি। হয়তো লাগবে বছরের পর বছর। টেস্ট টিউবের ভিতর সামান্য স্যাম্পল মানেই বিশাল কোনও অয়েল স্পিলকে ঠেকিয়ে দেয়া নয়।'

'আমি শুধু বলব, মন দিয়ে কাজ করো। তোমার কাজ তোমাকে যেখানেই নিয়ে যাক, যত সময়ই লাগুক, হাল ছাড়বে না।' ডক্টর আসিফ হায়দার চৌধুরির বদলে অন্য কেউ হলে নিজ পিঠ চাপড়ে দিয়ে মনে মনে হাসত— দিলাম তো ছুঁড়িকে

ফুলিয়ে! কিন্তু অন্তরের গভীর থেকে কথাগুলো বলেছে বাঙালি বিজ্ঞানী।

ডক্টর চৌধুরি ল্যাবোরেটরিতে ঢুকবার পর এই প্রথমবারের মত তার চোখে চোখ রাখল ক্যারেন। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, আসিফ। আপনার কথা শুনবার পর কাজে আরও মনোযোগ দেব।'

'ভবিষ্যৎ তোমার জন্য কী রেখেছে, আমরা জানি না। আমরা যখন সালফার স্ক্রাবারের পেটেন্ট করলাম, পরিবেশবাদী একদল লোক হামলে পড়ল— আমাদের আবিষ্কার যথেষ্ট পলিউশন দূর করে না। দেখা যাক, তুমি আমাদের সুনাম পুনরুদ্ধার করতে পারো কি না।' মৃদু হেসে বিদায় নিয়ে চলে গেল আসিফ হায়দার চৌধুরি।

আবারও কাজে মন দিল ক্যারেন কুম্বস। প্রটেকটিভ গ্লাভস হাতে বিকার নাড়ছে। মাত্র দশ মিনিটে জেনেটিকালি মডিফায়েড ডায়াটমগুলো গদের আঠা হয়ে উঠেছে। ঝাঁকি দিতেই বিকারের পানি গলগলে জেলের মত নীচের দিকে নামল।

মৃতপ্রায় অটার ও সামুদ্রিক পাখিগুলোর সেই করুণ দৃশ্য মনে পড়ে গেছে ক্যারেনের, ছোটবেলায় দেখেছে প্রাণীগুলো কী ভয়ঙ্কর কষ্ট পেয়েই না মরেছে— দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে কাজে মন দিল সে।

তিন

মাতাদির দক্ষিণে, কঙ্গো নদী। গভীর রাত।

পরিত্যক্ত বিশাল প্ল্যান্টেশন এবং কাঠের তিন শ' ফুটি

পিয়ারকে ক্রমশ গ্রাস করছে গহীন অরণ্য। নিশাচর পাখি ও পোকামাকড়ের আওয়াজ ছাড়া কোথাও কোনও শব্দ নেই। নদী-তীর থেকে এক মাইল ভিতর প্ল্যান্টেশনের মূল দালান। দালানের কাঠ সব পচে গেছে, সবই ছেয়ে ফেলেছে ঝোপঝাড়, লতা ও জংলা গাছে। বেশি দিন নেই, ভেঙে পড়বে এই কাঠের ডকও। একটু দূরে মালবোঝাই বুড়ো ঘোড়ার পিঠের মত নুয়ে পড়েছে ধাতব ওয়্যারহাউসের ছাত। করাগেটেড টিনের দেয়ালগুলোর রং জ্বলে গেছে, ভালভাবেই ধরেছে জং। চারপাশে এসে পড়েছে পূর্ণিমা চাঁদের ক্ষীর-সাদা জ্যোৎস্না, কিন্তু এ এলাকা ভীষণ ভুতুড়ে, যেন অশুভ— এখানে নেচে চলেছে একদল অশরীরী প্রেতাত্মা।

পিয়ারের পাশে ভিড়তে শুরু করেছে মস্ত এক ফ্রেইটার। ওটা এতই বড়, খুদে বামন বানিয়ে দিয়েছে বিশালাকৃতি ওয়্যার-হাউসটাকে। ভাটির দিকে বো তাক করে রেখেছে জাহাজ, আপাতত রিভার্সে চলছে ইঞ্জিন। ফ্যানটেইলের নীচে খলখল শব্দে চলেছে নদী। স্রোত ঠেলে সঠিক জায়গায় থাকতে চাইছে ফ্রেইটার। কাজটা খুবই কঠিন, কঙ্গো নদীর উল্টোপাল্টা স্রোত আর জোরালো ভাটা সরিয়ে দিতে চাইছে ওটাকে।

ওয়াকি-টকি ঠোঁটে তুলে আদেশ দিয়ে চলেছে ক্যাপ্টেন, নাটকীয় ভাবে নাড়ছে আরেক হাত। পায়চারি করছে স্টারবোর্ড উইং ব্রিজে। কড়া স্বরে হেলমসম্যান ও ইঞ্জিনিয়ারকে বকে চলেছে: 'হ্যাঁ! আবার কী, বললাম না বামে সরবে!'

পাঁচ শ' ষাট ফুটি ফ্রেইটার সামান্য সরল।

একদল লোক অপেক্ষা করছে ডকে, পরনে কালো ফেটিগ, জুলজুল চোখে দেখছে জাহাজটাকে। একজন ছাড়া সবার সঙ্গে অ্যাসল্ট রাইফেল। যে লোকের একে-৪৭ নেই, তার কোমরে মস্ত বড় হোলস্টার। এই আঁধারে পরেছে রে-ব্যান সানগ্লাস। তাকে

দলের নেতা বলেই মনে হচ্ছে। হাতে একটা লিকলিকে চাবুক।

জাহাজের ক্যাপ্টেন বিশাল লোক, মাথায় গ্রিক ফিশারম্যান-ক্যাপ। একের পর এক আদেশ দিয়ে চলেছে। ব্রিজ উইঙে তার পাশে এক লোক। দৈর্ঘ্যে সে ক্যাপ্টেনের চেয়ে এক ইঞ্চি খাটো। কিন্তু ক্ষমতা যেন বেশি। কুচকুচে কালো মণিদুটো সবই দেখছে। প্রতিটি নড়চড়া মাপা।

সমতল থেকে তিনতলা উপরে ব্রিজ, কেউ এদের কথা শুনবে না।

'আপনার কী মনে হয়, স্যর?' জানতে চাইল ক্যাপ্টেন।

ডকে সশস্ত্র সেনাবাহিনী, ক্যাপ্টেনের সঙ্গী লোকটা সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে খেয়াল করছে কীভাবে পিয়ারে ভিড়ছে জাহাজ। 'ওরা অধৈর্য হয়ে উঠছে। ...আর আপনার ওয়াকি-টকির অভিনয় চমৎকার হচ্ছে, আপা।'

যন্ত্রে ব্যাটারি নেই। প্রকাণ্ড হাতের ভিতর খুদে লাগছে ওয়াকি-টকি। একবার ওটা দেখে নিল ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা। এ অপরেশনে মাসুদ রানার পরিবর্তে জাহাজের ক্যাপ্টেনের অভিনয় করছে সে। মোফিজ বিল্লাহ্ কুচকুচে কালো করে দিয়েছে সর্বাঙ্গ। কন্সোলিজ আর্মি অভ রেভোলিউশনের চিফ, টমাস গাধাধার যে লোককে পাঠিয়েছে, জানা কথা, সে কৃষ্ণ বর্ণেরই হবে। সে নিজ বর্ণের কাউকে দেখলে স্বস্তি বোধ করবে, এই ভেবেই কালো ভূত হয়েছে সবাই।

রেলিঙের দিকে চাইল নিশাত। স্থির ভাসছে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস। 'ঠিক আছে,' বলে উঠল। 'এবার সামনে-পিছনের দড়ি ফেলো।'

স্টার্ন ও বো-র হওসহোল দিয়ে মোটা দড়ি নামিয়ে দিল নাবিকরা। মাথা দোলাল সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার। দুই সৈনিক কাঁধে ঝুলিয়ে নিল রাইফেল, জাহাজের দড়ির লুপ পরিয়ে দিল

জং-ধরা বোলার্ডে। উইণ্ডল্যাসগুলো বাড়তি দড়ি টেনে নিল। ফেণ্ডারের কাজ করছে পুরনো ট্রাকের চাকা, মৃদু শব্দে পিয়ারে ভিড়ল জাহাজ। স্টার্নে জোরালো স্রোত ও কাদাটে ফেনা ছিটকে চলেছে। জাহাজটাকে একই জায়গায় আটকে রেখেছে রিভার্স থ্রাস্ট, নইলে বহু আগেই বোলার্ড উপড়ে নিয়ে রওনা হয়ে যেত ভাটিতে।

ফ্রেইটারের স্টেশন, পজিশন, গজিং কারেন্ট, উইণ্ডেজ, রাডার ও ইঞ্জিনের শক্তি দেখে নিতে এক মিনিটও লাগল না মাসুদ রানার। সন্তুষ্ট হয়ে নিশাতের দিকে চাইল। 'ঠিক আছে, আপা, চলুন এবার ব্যবসা শেষ করি।'

জাহাজের মেইন ব্রিজে ঢুকল রানা ও নিশাত। ঘরে জ্বলছে টিমটিমে দুটো লাল বাতি, সে আলোয় আবছাভাবে দেখা গেল, জায়গাটা যেন নরকের কোনও অংশ। সবই নষ্ট ও পুরনো। লিনোলিয়াম মেঝে কখনও মোছা হয় না, ওটা ফাটল ধরা, কোনাগুলো উঠে এসেছে। জানালার ভিতর অংশে প্রচুর ধুলো, বাইরে লবণের নীলচে স্তর। সিলগুলো মৃত পোকার গোরস্থান। বহুদিন ধরেই ইঞ্জিনের ব্রাস টেলিগ্রাফের একটা কাঁটা ভাঙা। পাইলটের হুইলের কিছু স্পোক নেই। এ জাহাজে মনে হয় ন্যাভিগেশনের আধুনিক কোনও যন্ত্র নেই বললেই চলে। ব্রিজের পিছনে রেডিও শ্যাক, সেখানে যে যন্ত্র, তার সাধ্য নেই বারো মাইল দূরে খবর পাঠাবে।

হেলমসম্যানের দিকে চেয়ে মৃদু মাথা দোলাল রানা। জবাবে হাসল যুবক। বয়স তার চব্বিশ, নাম জলিল খান। দক্ষ কমাণ্ডো, জাহাজের মার্কসম্যান সে। বাংলাদেশ আর্মি থেকে অব্যাহতি নিয়ে যোগ দিয়েছে রানা এজেন্সিতে। এরইমধ্যে কয়েকটি মিশনে কাজও করেছে।

ব্রিজ থেকে বেরুল রানা ও নিশাত, কমপ্যানিয়নওয়েতে চলে

এল। ঘোরালো পথে নামতে লাগল ওরা। ছাতে একটু দূরে দূরে ঝুলছে তারের খাঁচা, ভিতরে জ্বলছে নিচু ওয়াটের আলো। আড়াই মিনিট পর মেইন ডেকে নেমে এল ওরা।

এখানে অপেক্ষা করছে সুদর্শন এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবক। একবার দেখলেই বোঝা যায়, খুবই বেপরোয়া মানুষ।

'তুই তৈরি, সোহেল?' জানতে চাইল রানা।

'হুঁ।'

কারও বুঝবার উপায় নেই যুবকের বাম কনুই থেকে হাতের নীচের অংশ যান্ত্রিক। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার সে, রানার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রানার টানেই সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে যোগ দেয় তদানীন্তন পিসিআই-এ, অল্পদিনেই হয়ে ওঠে অন্যতম সেরা এজেন্ট। কিন্তু একটি মিশনে রানাকে বাঁচাতে গিয়ে চলন্ত ট্রেনের চাকার নীচে কাটা পড়ে ওর বামহাত। এরপর তাকে অ্যাকটিভ এজেন্টের কাজ থেকে সরিয়ে বসিয়ে দেয়া হয় ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের দায়িত্ব দিয়ে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বন্দি হন পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। চিফের দায়িত্ব বর্তায় মাসুদ রানার উপর। ওদিকে পিসিআইয়ের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কর্নেল শেখ ফিরে গেছেন পাকিস্তানে। তখনই হেড অফিসে ডেকে নিয়ে ওই গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার চাপিয়ে দেয় রানা সোহেলের উপর। এমনই যোগ্যতার সঙ্গে সে-দায়িত্ব পালন করল সোহেল যে পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফেরার পর সোহেলকে ওই পদেই রেখে দিয়েছেন রাহাত খান, রানা ফিরে গেছে তার পছন্দের অ্যাকটিভ এসপিওনাজে।

দুজনের বন্ধুত্ব অটুট রয়েছে আজও। অফিশিয়াল কাজ করতে করতে যখন হাঁপিয়ে ওঠে সোহেল, খাঁচায় বন্দি বাঘের মত

ছটফট করতে থাকে বিপজ্জনক কাজে ঝাঁপ দেবার জন্যে— তখন ওর মনের অবস্থা ঠিকই টের পান তীক্ষ্ণধী চিফ রাহাত খান, ওকে আটকে না রেখে ছেড়ে দেন কিছুদিনের জন্যে। রানার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে সে-ও রোমাঞ্চকর অভিযানে। এবারও চলে এসেছে ও বসের অনুমতি নিয়ে।

ডেক থেকে অ্যাটাশে কেস তুলে নিল সোহেল আহমেদ। 'মার্সেনারির সেরা বন্ধু হীরা।'

বিড়বিড় করল নিশাত, 'তা-ই নাকি? জানতাম না!'

দু' মাস আগে এই কাজের প্রস্তাব পেয়েছে ভিনসেন্ট গগল। বার কয়েক বৈঠকের পরই বদলে গেছে কঙ্গোলিজ আর্মি অভ রেভোলিউশনের চিফ টমাস গাধাধারের মনোভাব, এখন তার ধারণা, গগলই তার একমাত্র বুজুম ফ্রেণ্ড। সপ্তাহখানেক আগে ঠিক হলো কোথায় ডেলিভারি নেবে সে অস্ত্রগুলো। এই চুক্তি খুব সোজাসাপ্টা: সিকি পাউণ্ড আকাটা হীরা পাবে ভিনসেন্ট গগল, বদলে দেবে পাঁচ শ' একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল, দু' শ' রকেট-প্রপেল্ড গ্রেনেড, এক শ'টি আরপিজি লঞ্চার এবং পঞ্চাশ হাজার ওয়ারসও প্যাক্ট ৭.৬২ এমএম অ্যামিউনিশন। টমাস গাধাধার যেমন জিজ্ঞেস করেনি এত মিলিটারি হার্ডওয়্যার কোথায় পাবে ইতালিয়ান ব্যবসায়ী। তেমনি ভিনসেন্ট গগলও জানতে চায়নি কোথায় পেল গাধাধার এত হীরা। আফ্রিকার এদিকে এসব হীরকখণ্ডকে বলা হয় রক্তাক্ত হীরা। পাহাড়ি খনিতে মজুর ক্রীতদাসদেরকে ভয়ানক কষ্ট করে সংগ্রহ করতে হয় এসব পাথর— নইলে বিপ্লবের অস্ত্র আসবে কোত্থেকে?

টমাস গাধাধারের কঙ্গোলিজ আর্মি অভ রেভোলিউশনে রয়েছে তেরো বছর বয়সী বালক থেকে শুরু করে মাঝ বয়সী সৈনিক, তাদের জন্য দরকার প্রচুর অস্ত্র। এবারের এই শিপমেন্ট পেলেই নড়বড়ে বৈধ সরকারের উপর হামলে পড়বে তারা। এবং

বলা যায় না, হয়তো মুখ থুবড়ে পড়বে কঙ্গোর নাজুক সরকার।

কাঠের ডকে গ্যাংপ্লাঙ্ক নামিয়ে দিয়েছে এক নাবিক, তার দিকে না চেয়েই পিয়ারে নেমে এল নিশাত সুলতানা। বুঝবার উপায় নেই সে মহিলা! ওর পিছু নিয়ে নামল মাসুদ রানা ও সোহেল আহমেদ।

ডকে প্রহরীদের কাছ থেকে সরে এল অফিসার, সামনে এসে খটাস্ করে স্যালিউট দিল ক্যাপ্টেন নিশাতকে। পাল্টা ক্যাপের বিল স্পর্শ করল নিশাত।

'ক্যাপ্টেন রউফ, আমি কঙ্গোলিজ আর্মি অভ রেভোলিউশনের কর্নেল আদি মাধাভ মাধানা,' ফ্রেঞ্চ ও স্থানীয় সুরের মিশেল লোকটার কণ্ঠে। কোনও উত্থান বা পতন নেই, মনে হলো, রোবট কথা বলছে। চোখ থেকে সরায়নি সানগ্লাস। বাম হাতে ঝুলছে লিকলিকে চাবুক।

'কর্নেল,' হাত বাড়িয়ে দিল নিশাত সুলতানা, কিন্তু ওর পাশে চলে এসেছে মাধানার এক এইড। পাশ থেকে সে সার্চ করে দেখল কোনও অস্ত্র আছে কি না।

এবার নিশাতের হাত নিয়ে ঝাঁকিয়ে দিল মাধানা। 'আমাদের সর্বোচ্চ নেতা জেনারেল টমাস গাধাধার বলেছেন, তিনি নিজে আসতে পারেননি, সেজন্য দুঃখিত।'

আজ ক' বছর হলো জঙ্গলের ভিতর গোপন এক বেস থেকে হামলা করছে টমাস গাধাধার। স্থানীয়দের ধারণা, সত্যিই সে স্বয়ং বিষ্ণু। বহুবার তাকে ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে সরকার, একবারও লোকটার আস্তানা খুঁজে পায়নি। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সে, কিন্তু প্রতিবার পাল্টা হামলা করেছে। চোরাগোপ্তা হামলায় এরই মধ্যে মারা পড়েছে কয়েক হাজার রেগুলার সৈনিক।

'আপনারা অস্ত্র এনেছেন,' কোনও প্রশ্ন নয়, স্রেফ মন্তব্য করল কর্নেল মাধানা।

'আমার সহযোগী হীরা পরীক্ষা শেষ করলেই আপনারা অস্ত্র পাবেন,' সোহেলের দিকে হাতের ইশারা করল নিশাত।

'ঠিক যেমন চুক্তি হয়েছে,' বলল মাধানা। 'আসুন।'

ডকের উপর একটা টেবিল। পাশেই পোর্টেবল জেনারেটার চলছে। বৈদ্যুতিক তার উঠেছে টেবিলের ল্যাম্পে। চারপাশে জোরালো আলো ছড়িয়ে পড়ছে লণ্ঠন থেকে। মাধানা চেয়ারে ধপ্ করে বসল, টেবিলের একপাশে নামিয়ে রাখল চাবুক। লোকটার সামনে বাদামি বারল্যাপ ব্যাগ, ফ্রেঞ্চ ফিড কোম্পানির মনোগ্রাম আঁকা। উল্টো দিকের চেয়ারে বসল সোহেল, ব্রিফকেস খুলে কী যেন খুঁজতে শুরু করেছে। পাঁচ সেকেণ্ড পর ইলেক্ট্রনিক স্কেল নিল, সঙ্গে ওজন মাপার যন্ত্র ও প্লাস্টিকের সিলিণ্ডারের ভিতর স্বচ্ছ তরল। এবার বেরুল নোটবুক, পেন্সিল ও ছোট্ট ক্যালকুলেটার। মাধানার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল প্রহরীরা, এবার তাদের ক'জন চলে এল সোহেলের পিছনে। পালাতে চাইলে ঠেকাবে। আরও দু-তিন জন প্রহরী দাঁড়াল এসে রানা ও নিশাতের পিছনে, কর্নেল নির্দেশ দিলেই গুলি চলবে। আজ রাতে যেন বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলছে বাতাসে। আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে পরিবেশ।

ব্যাগের উপর বামহাত রাখল মাধানা, চাইল নিশাত সুলতানার দিকে। 'ক্যাপ্টেন, মনে হয় পারস্পরিক বিশ্বাসের সময় এসেছে। এবার দেখান কোন্ কণ্টেইনারে আমাদের অস্ত্র।'

'চুক্তি করবার সময় কিন্তু এমন কথা হয়নি,' বলল নিশাত। কণ্ঠে উদ্বেগ প্রকাশ পেল।

খেঁক-শেয়ালের মত খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসল মাধানার এইড।

'এইমাত্র যা বললাম,' বলল মাধানা, কণ্ঠে স্পষ্ট শয়তানি, 'পরস্পরের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। এ থেকে বোঝা যাবে আপনাদের মন পরিষ্কার।' ব্যাগের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিল সে, তর্জনী তুলে ইশারা করল। ঘুটঘুটে অন্ধকার থেকে ছুটে এল

বিশজন সৈনিক। হাতের ইশারা করল মাধানা, লোকগুলো আবারও চলে গেল জঙ্গলের ভিতর। 'ওরা চাইলে আপনাদের সবাইকে শেষ করে সমস্ত অস্ত্র কেড়ে নিতে পারে। এ থেকেই প্রমাণ হয় আমাদের সদিচ্ছার কথা।'

সামনে দ্বিতীয় কোনও পথ নেই নিশাতের। মুখ ঘুরিয়ে জাহাজের উদ্দেশে গলা ছাড়ল সে। রেলিঙে দাঁড়িয়ে আছে এক নাবিক, ক্যাপ্টেনের কথা শুনে পাল্টা হাত নাড়ল। কয়েক মুহূর্ত পর গর্জে উঠল ছোট ডিজেল ইঞ্জিন। বিশাল ফ্রেইটারের বো সেকশনে ককিয়ে উঠল তিনটে ডেরিক। জং-ধরা পুলির ভিতর দিয়ে সরতে লাগল পুরু কেবল, কার্গো হোল্ডের ভিতর ওজন নিতে শুরু করেছে ভারী কোনও কিছুর। একটু পর উঠে আসতে লাগল স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজের চল্লিশ ফুটি শিপিং কন্টেইনার। যে-কোনও বন্দরে প্রতিদিন এসব দেখা যায়। হ্যাচের ভিতর দিয়ে ক্রেন বের করে আনল কন্টেইনার, ঝুলিয়ে রাখা হলো ডেকের একটু উপরে। কন্টেইনারের দরজা খুলে ভিতরে উঠে পড়ল দুই খালাসী। তাদের চিৎকার শুনে ক্রেন চালক নতুন করে কন্টেইনার উপরে তুলল, নিয়ে এল রেলিঙের বাইরের দিকে। জাহাজের পাশে ঝুলছে প্রকাণ্ড বাক্স। এবার ডকের আট ফুট উপরে এসে স্থির হলো। আর নামানো হচ্ছে না।

কন্টেইনারের দুই খালাসী ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল, ভিতরের অংশে ফেলেছে তেলতেলে আলো। দেয়ালের পাশের র‍্যাকে ঝুলছে অসংখ্য একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল। আলো গিয়ে পড়ল আরেক দিকে, সেখানে দেখা গেল সবুজ রঙের ক্রেট। একটা ক্রেট খোলা হলো, ভিতর থেকে তুলে নেয়া হলো ফাঁপা আরপিজি টিউব। ওটা তুলে ধরা হলো কাঁধে। যেন ডেমনস্ট্রেশন চলছে। হই-হই করে উঠল তরুণ কয়েকজন সৈনিক। এমন কী কর্নেল আদি মাধাভ মাধানার ঠোঁটের দুই কোনা উপরে উঠল। সামনের ওই দৃশ্য

দেখে হাসি এসে গেছে তারও।

কন্টেইনারের দুই খালাসী লাফ দিয়ে ডকে নামল। ওখানে না থেমে এক দৌড়ে গিয়ে উঠল জাহাজে। 'এবার দেখলেন আমার বিশ্বাসযোগ্যতা,' বলল নিশাত সুলতানা।

কোনও মন্তব্য করল না মাধানা, ব্যাগটা তুলে ভেতরের মাল ঢেলে দিল টেবিলের উপর।

কাটা এবং পালিশ দেয়া হীরা পৃথিবীর সবচেয়ে ঝিকমিকে জিনিস। হীরার উপর সাদা আলো পড়লে ঝলসে ওঠে রামধনুর সাত রং। কিন্তু যখন খনি থেকে হীরা পাওয়া যায়, তা দেখে মনেই হয় না কোনও রত্ন, তার ভিতর তেমন কোনও জৌলুষ থাকে না। পাথরের স্তূপ থেকে সামান্যতম আলোর ঝলকানি দেখা গেল না। বড় হীরাগুলো যেন কমদামি কোনও ক্রিস্টালের চৌকো পিরামিড, নীচের দিকে সাদাটে কীসের যেন আভাস। অন্যগুলো সামান্য সব নুড়ি পাথর। হরেকরকম তাদের আকার। লালচে বা সাদা থেকে শুরু করে হলুদও রয়েছে। কিছু দেখা গেল প্রায় সাদা, অন্যগুলো ফাটল ধরা। তবে রানা বা সোহেল খেয়াল করল, কোনও নুড়ি এক ক্যারেটের নীচে নেই। তার মানেই নিউ ইয়র্ক, তেল আভিভ বা আমস্টারডামের ডায়মণ্ড ডিস্ট্রিক্টে লুফে নেয়া হবে এসব পাথর। মাধানা চাইলে আবারও পাথর পাবে, হয়তো বিক্রিও করতে পারবে, কিন্তু চাইলেই অস্ত্র পাবে না।

সবচেয়ে বড় পাথরটা তুলে নিল সোহেল, ওটার ওজন হবে কমপক্ষে দশ ক্যারেট। কাটা ও পালিশ করার পর থাকবে চার বা পাঁচ ক্যারেটের পাথর, কালার গ্রেড ও স্বচ্ছতার উপর নির্ভর করবে দাম, তার মানেই কমপক্ষে চল্লিশ হাজার ডলার। পাথরের উপর মনোযোগ দিল সোহেল, জুয়েলারদের ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখছে। গম্ভীর, তিক্ত চেহারা, চেপে বসেছে ঠোঁটে ঠোঁট। মনে হচ্ছে, এই লোক জীবনে হাসেনি। পাথরটা দেখা শেষ হতে

পাশে রেখে দিল সোহেল। কোনও মন্তব্য করল না। আরেকটা পাথর তুলে নিয়ে দেখতে শুরু করল। তারপর আরেকটা। বার কয়েক জিভ ও টাকরা দিয়ে বিরক্তির আওয়াজ করল। মনে হলো যা দেখছে, তাতে খুবই হতাশ। এবার শার্টের পকেট থেকে রিডিং গ্লাস নিয়ে বসিয়ে নিল নাকের উপর।

ওকে লক্ষ করছে মাধানা। নোটবুকে কী যেন লিখতে শুরু করেছে সোহেল।

'আপনি কী লিখছেন?' জানতে চাইল মাধানা। হঠাৎ অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। এমন করে কী দেখছে হীরক বিশেষজ্ঞ? আবার লেখে কেন?

'আপনাদের উচিত ছিল এসব পাথরকে হীরা না বলে নুড়ি পাথর বলা,' গম্ভীর স্বরে বলল সোহেল। নাক কুঁচকে রেখেছে। অপমানে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল মাধানা, কিন্তু হাতের ইশারা করে তাকে বসতে বলল সোহেল। 'তবে প্রাথমিক পরীক্ষা থেকে মনে হচ্ছে, আমাদের চুক্তি বাতিল করতে হবে না।'

প্যান্টের পকেট থেকে একটা টোপায বের করল সোহেল, ওটার উপর অংশ খাঁজ কাটা। 'আপনি জানেন,' লেকচারের ভঙ্গিতে বলল, 'পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন জিনিস ডায়মণ্ড। মোহ্'র স্কেলে ওটার মাত্রা দশ। কোয়ার্টয মাত্র সাত মাত্রার, অনেকে মনে করে তারা দেখছে সত্যিকারের হীরা।'

ওই একই পকেট থেকে বেরুল অষ্টকোণের একটি ক্রিস্টাল। এবার টোপাযের উপর সজোরে ক্রিস্টাল নামিয়ে আনল সোহেল। ঠং করে ভেঙে পড়ল ক্রিস্টাল। 'দেখলেন টোপায অনেক কঠিন কোয়ার্টযের চেয়ে, কাজেই টোপাযের কিছুই হলো না। মোহ্'র স্কেলে ওটা আট মাত্রার।' এবার ছোট একটা হীরা নিল সোহেল, ওটা ঘষল টোপাযের উপর। শিউরে উঠবার মত খ্যাশ-খ্যাশ আওয়াজ হলো, কয়েক সেকেণ্ড পর বোঝা গেল নীলচে টোপাযের

উপর তৈরি হয়েছে গভীর কাটা চিহ্ন। 'এখন দেখলেন মোহ্'র স্কেলে আট মাত্রার চেয়ে কঠিন একটা পাথর।'

'তার মানেই হীরা,' সন্তুষ্ট হয়ে বলল মাধানা।

মনে হলো অমনোযোগী ছাত্রের কথায় মহাবিরক্ত হয়েছে জেমোলজিস্ট। 'না, কোরানডাম হচ্ছে মোহ্'র স্কেলে নয় নম্বর মাত্রা। সেটা ধাতু।' হাতের পাথরটা তুলে দেখাল সোহেল। 'আর এই পাথর আসলে হীরা তা বুঝবার একমাত্র উপায়, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি টেস্ট।'

হীরা নিয়ে বহুবার ব্যবসা করেছে মাধানা, ভাল করেই জানে তার মূল্য কত। কিছু বুঝে উঠবার আগেই সোহেল তার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। নিচু স্বরে বলল মাধানা, 'স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কী?'

'পাথরের ওজনের বদলে কত পরিমাণ পানি সরবে, তা দেখতে হবে। হীরার বেলায় সেটা হবে তিন পয়েন্ট পাঁচ দুই।' কয়েক সেকেণ্ড স্কেল নিয়ে নাড়াচাড়া করল সোহেল। ভেলভেটের লাইনিং করা এক কেসের ভিতর রয়েছে ব্রাসের ওই মাপকগুলো। এবার স্কেলে শূন্য আসতেই প্যানের উপর সবচেয়ে বড় হীরাখণ্ড রাখল। 'পয়েন্ট টু টু ফাইভ গ্রাম্স্। অর্থাৎ ইলেভেন অ্যাণ্ড হাফ ক্যারেটস্।' মাত্রা লেখা প্লাস্টিকের সিলিণ্ডার নিল সোহেল, ওটার ভিতর ছেড়ে দিল পাথরটা। মনোযোগ দিয়ে দেখল ওই মণি কতখানি পানি সরিয়ে দিয়েছে। টুকে নিল নোটবুকে। সংখ্যা তুলে নিল ক্যালকুলেটারে। সংখ্যাগুলো এবার দেখে নিয়ে কড়া দৃষ্টিতে চাইল কর্নেল মাধানার দিকে।

বিস্ফারিত হয়েছে কর্নেলের চোখ, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। বোম রাগা রেগেছে। তার সৈনিকরা চেপে এল সোহেলের দিকে। একটা পিস্তলের নলের খোঁচা টের পেল রানা নিজের মেরুদণ্ডে। সোহেল শালা মারবে আমাদের, ভাবল রানা, কে ওকে বলেছে

এত অভিনয় করতে?

সোহেলের কঠোর দৃষ্টি হঠাৎ স্বাভাবিক হয়ে উঠল, মিষ্টি করে হাসল কর্নেলের দিকে চেয়ে। 'থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু। তার মানে, ওটা সত্যিকারের হীরা!'

ট্রিগারের উপর তর্জনী চলে গিয়েছিল আদি মাধানার, এবার হোলস্টারে পিস্তল রেখে আবার চেয়ারে বসে পড়ল।

আরও আট-দশটা পাথর পরীক্ষা করে দেখল সোহেল। প্রতিবার একই ফল হলো।

'আমি আমার চুক্তি পূর্ণ করেছি,' বলল মাধানা, 'এক পাউণ্ডের চার ভাগের এক ভাগ হীরা দিয়েছি অস্ত্রের বিনিময়ে।'

হীরাখণ্ড পরখ করছে সোহেল।

খোলা কণ্টেইনারের দিকে কর্নেলকে নিয়ে গেল নিশাত সুলতানা, হাতের ইশারা করল ফ্রেইটারের এক নাবিককে। আদেশ পৌঁছে গেল ক্রেনের চালকের কাছে। নতুন করে নামছে কণ্টেইনার। কয়েক মুহূর্ত পর ডকের উপর নেমে এল। প্রচণ্ড ওজনে মড়মড় আওয়াজ তুলল কাঠের পিয়ার

নিশাতের সঙ্গে এসেছে মাধানার পাঁচ সৈনিক। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় মাধানা ও তার লোকেরা কয়েকটি র‍্যাক থেকে তুলে নিল দশটি একে-৪৭ রাইফেল ও এক শ' রাউণ্ড অ্যামিউনিশনের বাক্স। ম্যাশেটি দিয়ে মোমের কোট করা কাগজের কার্টন খোলা হলো।

মাধানার সৈনিক উল্টোপাল্টা কিছু করতে পারে, কাজেই সোহেলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে নিশাত। খেয়াল করল, অদক্ষ লোকগুলো একে-৪৭-র কলা আকৃতির ম্যাগাযিনের ভিতর ভরছে চকচকে ব্রাস কার্ট্রিজ।

ঢোলা সুয়েটশার্টের নীচে হালকা ফ্ল্যাক জ্যাকেট পরেছে রানা, নিশাতের মত একই কারণে সোহেলের পাশে থাকল।

প্রতিটি রাইফেল থেকে দশটি গুলি ছোঁড়া হলো। দুইবার তিনটের সেট আর চারবার সিঙ্গেল শট। পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউসের পাশে দাঁড় করানো টার্গেটে গুলিবর্ষণ হয়েছে। চওড়া নদীর ওপাশ থেকে ফিরে এল জোরালো প্রতিধ্বনি। ভয় পেয়ে চিৎকার করে আকাশে উঠল ঘুম ভাঙা একদল পাখি। এক সৈনিক চলে গেল টার্গেটের ক্ষতি দেখতে। ওখান থেকে চিৎকার করে জানাল, গুলি লক্ষ্যভেদ করেছে। নিশাতের দিকে চেয়ে হাসল কর্নেল। 'গুড! ভেরি গুড!'

এদিকে পরীক্ষা চলছে সোহেলের। খালি ব্যাগের ওজন নিয়ে ক্যালকুলেটারে হিসাব কষল। কাজ শেষে মাধানার অফিসারদের সামনে লম্বা হাতলওয়ালা চামচ দিয়ে ব্যাগের ভিতর ভরতে লাগল পাথরগুলো। কাজ শেষে নতুন করে আবারও ব্যাগ মেপে দেখল। কাঁধের উপর দিয়ে রানাকে বলল, 'আট ক্যারেট কম পেলাম রে।'

ওই আট ক্যারেট মানেই কমপক্ষে দশ হাজার ডলার। কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'জান নিয়ে বেরুতে পারলেই যথেষ্ট। সঠিক ক্যারেট না পেলেও চলবে তোর।' নিশাতের উদ্দেশে গলা উঁচু করল রানা। সে মাধানার এক লোকের হাতে আরপিজি দেখছে। লোকটাকে পেশাদার মনে হলো, পদবী হতে পারে সার্জেন্ট। 'ক্যাপ্টেন রউফ, চলুন। এখানে দেরি করলে বোমা বন্দরের কর্তৃপক্ষ আমাদের বার্থ ক্যান্সাল করে দেবে।'

ফিরে চাইল নিশাত। 'ঠিক, মিস্টার গণেশ।' মাধানার দিকে ফিরল সে। 'আরও অস্ত্র দিতে পারলে ভাল হতো, কর্নেল, তবে এবারের শিপমেন্ট আচমকা জোগাড় করতে হয়েছে। পরের বার...'

'আবার যদি আচমকা শিপমেন্ট পান, দেরি না করে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।'

টেবিলের কাছে পৌঁছে গেছে নিশাত, এবার জানতে চাইল,

'আপনি সন্তুষ্ট, মিস্টার সোহেলি?'

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন, সবই ঠিক আছে।'

চতুর হাসি দিল কর্নেল আদি মাধাভ মাধানা। ইচ্ছা করেই চুক্তির চেয়ে কম হীরা দিয়েছে সে। তার সঙ্গে রয়েছে একদল সশস্ত্র সৈনিক, কম হীরা দিলেও বাধ্য হয়েই নেবে অস্ত্র চোরাকারবারীরা। ইউনিফর্ম ব্লাউজের ভিতর বাড়তি হীরা রেখেছে সে। সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টকে আরও ফাঁপিয়ে তুলবে ওটা।

'ঠিক আছে, তা হলে সবাই চলুন,' সোহেলের হাত থেকে ব্যাগ নিল নিশাত। দ্রুত পায়ে গ্যাংপ্লাঙ্কের দিকে হাঁটতে শুরু করল। প্রায় ছুটে চলেছে সে, তাল মিলাতে চাইল রানা ও সোহেল। তবে গ্যাংপ্লাঙ্কের কাছে পৌঁছুনোর আগেই ব্যস্ত হয়ে উঠল কর্নেল মাধানার সৈনিকরা। সবচেয়ে কাছের দুই সৈনিক বাধা দিতে চাইল। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে জঙ্গল থেকে ছুটে এল বেশ কয়েকজন, ভূত-পেত্নীর মত চিৎকার ছাড়ছে। কমপক্ষে বারোজন লোক ঘিরে ফেলল অস্ত্রের কন্টেইনার, ডেরিক থেকে খুলে নিতে চাইছে কার্গো।

আগেই সন্দেহ করেছে, নইলে মস্ত বিপদে পড়ত রানা-সোহেল-নিশাত।

এক সেকেণ্ড পর গলা ছাড়ল মাধানা, নির্দেশ দিল হামলার। ততক্ষণে দৌড়াতে শুরু করেছে মার্ভেল টিম। গ্যাংপ্লাঙ্কের মুখে যে দুই সৈনিক, তাদের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। তখনও তারা তাক করতে পারেনি অস্ত্র। পাশ থেকে তরুণ সৈনিকের কাঁধে গুঁতো দিল নিশাত, ছিটকে ফেলে দিল জাহাজ ও পিয়ারের মাঝখানের পানিতে। অন্যজনের কণ্ঠার উপর ঘুষি বসিয়ে দিয়েছে রানা, লোকটা মস্ত হাঁ করতেই কেড়ে নিল একে-৪৭, পরক্ষণে কুঁদোর গুঁতো পড়ল লোকটার পেটে। ডকের উপর পড়ে বলের মত গোল হয়ে গেল সৈনিক।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল রানা, সোহেল ও নিশাতের জন্য কাভার ফায়ার দিল। দু' সেকেণ্ড পর গ্যাংপ্লাঙ্কে উঠল নিশাত ও সোহেল। পিছন থেকে একটা বুলেট উড়িয়ে নিল নিশাতের ক্যাপ। বেরিয়ে এল দীর্ঘ চুলের বেণীদুটো। ঢালু র‍্যাম্পে উঠেই রেলিঙের নীচে একটা সুইচ টিপে দিল রানা। গ্যাংপ্লাঙ্কের শেষ পাঁচ ফুট উপরের দিকে ছিটকে উঠল। দু'পাশে আগে থেকেই রেলিং ছিল, এবার পিছন দিকটা হয়ে উঠল নব্বুই ডিগ্রি দেয়াল। পিছনের ওই দেয়ালে এসে লাগছে একের পর এক গুলি। রানাদের মাথার উপর দিয়ে ছুটছে বেশির ভাগ বুলেট, ফ্রেইটারের গায়ে লেগে ছিটকে পড়ছে। বদ্ধ অংশে আটকা পড়েছে রানারা।

'এ-ই হবে জানতাম,' গুলির আওয়াজের উপর দিয়ে বলল সোহেল। 'আপা, আমাদের মাল ঠিক আছে তো?'

'সব ঠিক, সোহেল ভাই,' জবাব দিল নিশাত। বুকের কাছে ধরে রেখেছে হীরার ব্যাগ।

জাহাজের এক অপারেটার ডক থেকে তুলে নিল গ্যাংপ্লাঙ্ক, নামিয়ে দিল ডেকের উপর। সুপারস্ট্রাকচারের ভিতর দৌড়ে ঢুকল রানা, সোহেল ও নিশাত। ইন্টারকমের সামনে দৌড় থামাল রানা, বাটন দাবিয়ে জানতে চাইল, 'সিচুয়েশন রিপোর্ট, নবী।'

জাহাজের পেটের ভিতর বিশেষ একটি মনিটরে ফুটে উঠেছে ক্যামেরার দৃশ্য, ওদিক থেকে চোখ না সরিয়েই জানাল নবী, 'গ্যাংপ্লাঙ্ক উঠে এসেছে। তবে এখনও কয়েকজন গুলি করছে। হামলার জন্য দল গুছিয়ে নিচ্ছে মাধানা। সঙ্গে কমপক্ষে এক শ' যোদ্ধা।'

'কন্টেইনারের কী অবস্থা?'

'লাইন প্রায় খুলে ফেলেছে। এক মিনিট, মাসুদ ভাই। হ্যাঁ, পেয়ে গেছে কন্টেইনার। এবার আমরা সরে যেতে পারি।'

'গগলকে বলো ডক থেকে সরতে।'

'মাসুদ ভাই, আমরা কিন্তু এখনও ডকের সঙ্গে বাঁধা,' দ্বিধা নিয়ে বলল নবী।

একটা বুলেট সুপারস্ট্রাকচারে লেগেছে, সঙ্গে নিয়েছে রঙের চল্টা। তারই চোখা এক অংশ লেগেছে রানার গালে। খোঁচা খেয়ে কেটে গেছে গাল। জায়গাটা স্পর্শ করল রানা, আঙুলে দেখতে পেল এক ফোঁটা রক্ত। 'বোলার্ড উপড়ে রওনা হোক।'

পরিত্যক্ত ডকে ভিড়েছে অতি পুরনো চেহারার জাহাজ। কিন্তু বেশির ভাগ লোক জানে না, ওটা অত্যন্ত আধুনিক এক রণতরী। কয়েক রঙের পোচ দেয়া খোল, ডেরিক যেন ভেঙে পড়ছে। ডেক একটা জঙের আড়ত। কিন্তু এসবই মানুষের চোখ ফাঁকি দেয়ার জন্য। কেউ ভাববে না সাগরে পাখির মত উড়তে পারে এই জাহাজ।

খোলের ভিতর রয়েছে দুনিয়ার সেরা ওয়েপন্স সিস্টেম। ঘুষখোর এক আমেরিকান অ্যাডমিরালের কাছ থেকে ক্রুজ মিসাইল ও টর্পেডো কিনে দিয়েছে গগল। এ ছাড়াও রয়েছে .৩০ এমএম গ্যাটলিং গান ও ১২০ এমএম ক্যানন। ওটার টার্গেটিং টেকনোলজি নেয়া হয়েছে এম১এ২ অ্যাব্রাম্‌স্ ট্যাঙ্ক থেকে। আরও রয়েছে চারপাশে সার্ভো কন্ট্রোল্ড .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগান। প্রতিটি অস্ত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছে ডেক-প্লেটের ওপাশে। দূর থেকে চালু করা যায় .৩০ ক্যালিবারের অস্ত্রগুলো। লুকিয়ে রাখা হয়েছে জং ধরা সব ড্রামের ভিতর। নির্দেশ দিলেই খুলে যায় ঢাকনি, অস্ত্রের সঙ্গে তৈরি থাকে লো-লাইট ও ইনফ্রারেড ক্যামেরা।

জাহাজের ব্রিজের ক' তলা নীচে সত্যিকারের অপারেশন্স সেন্টার, ওটাই জলযানের মগজ। ওখান থেকে প্রতিটি অপারেশন পরিচালিত হয়। স্থির করা হয় কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে ইঞ্জিন, ডাইন্যামিক পজিশনিং সিস্টেম বা অস্ত্রগুলো। ওই ঘরে রয়েছে

দুনিয়ার সবচেয়ে দামি রেইডার ও সোনার গিয়ার।

কিছুদিন আগে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর বিশজন সদস্য আর বিসিআইয়ের বেশ কিছু নতুন এজেন্ট যোগ দিয়েছে জাহাজে।

এখন অপারেশন্স সেন্টারে কাজ করছে ভিনসেন্ট গগল। বো'র অথওয়ার্টশিপ ও স্টার্নের থ্রাস্টারগুলো দিয়ে এক ঘণ্টা আগে সে-ই ডকে ভিড়িয়ে দিয়েছে জাহাজটাকে। সাহায্য নেয়া হয়েছে গ্লোবাল পজিশনিঙের। এসব কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে একটি সুপার কমপিউটার। মেশিনটি একইসঙ্গে লক্ষ্য রাখে বাতাসের গতি, স্রোতোধারা ও অন্যান্য অন্তত বিশটি বিষয়ের। আপাতত কঙ্গো নদীর স্রোতের বিরুদ্ধে কাজ করছে মার্ভেলের রিভার্স থ্রাস্ট, ওটাই একই জায়গায় আটকে রেখেছে জাহাজকে।

রানা ও সোহেল ঢুকে পড়ল একটি ইউটিলিটি ক্লজিটে। ভিতর অংশে তারপিনের কড়া গন্ধ। রানাদের সঙ্গে আসেনি নিশাত, চলে গেছে সানজিদা স্বর্ণার সঙ্গে যোগ দিতে। ওদের দায়িত্ব কাউকে জাহাজে উঠতে না দেয়া। বেসিনের কল মুচড়ে দিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে পিছন-দেয়াল সরে গেল। দেখা গেল দীর্ঘ হলওয়ে।

একটু আগে সস্তা লিনোলিয়ামের মেঝে ছিল, কিন্তু সামনের গোপন করিডোরে পারস্যের কার্পেট পেতে রাখা। চারপাশে কমনীয় আলো। দু'পাশের দেয়ালে দামি মেহগনি প্যানেল। এক পাশে দেখা গেল সত্যিকারের উইনস্লোর পেইন্টিং: কাঠের একটি জাহাজ থেকে শিকার করা হচ্ছে তিমি। আরেক দিকে গত ছয় শতকের সব বর্ম ও তলোয়ার। এগুলো জোগাড় করেছেন মার্ভেলের মালিক, গ্রিক টাইকুন চ্যাণ্ড্রো পাপাগোপালা।

এক পাশে বেশ কিছু কেবিন পেরিয়ে গেল রানা ও সোহেল, থামল অপারেশন্স সেন্টারের দরজায়। সুইচ টিপতে সরে গেল

কবাট, ঘরে ঢুকে পড়ল ওরা। নিচু সিলিঙের ঘরটা যেন নাসার মিশন কন্ট্রোল রুম। চারদিকে একের পর এক কমপিউটার কন্সোল। ওগুলো থেকে আসছে নীলচে আলো। সামনের দেয়ালে রয়েছে বিশাল একটি ফ্ল্যাট প্যানেল ডিসপ্লে। ওখানে দেখা যাচ্ছে পিয়ার ও চারদিকের দৃশ্য। সামনের দিকে বসেছে হেলমসম্যান ভিনসেন্ট গগল ও ওয়েপন্স কন্ট্রোলের খোরশেদ নবী। একটু পিছনে জাহাজের কমিউনিকেশন অ্যাণ্ড কমপিউটার স্পেশালিস্ট রায়হান রশিদ। পিছন-দেয়ালে ড্যামেজ কন্ট্রোলারদের মনিটর, দুইজন জাহাজের ইনটিগ্রেটেড সেফটি সিস্টেমের উপর নজর রাখছে। ঘরে আপাতত নেই চিফ ইঞ্জিনিয়ার, তার চেয়ার ফাঁকা।

যার যার চেয়ারে বসে পড়ল রানা-সোহেল, কানে পরে নিল পিন মাইক্রোফোন, চোখ ফেলল কমপিউটারের ডিসপ্লের উপর।

'ও-দুটো কী?' রেইডার স্কোপের সবজেটে আলোয় অদ্ভুত দেখাল রায়হানকে। 'বোধহয় হেলিকপ্টার। মাটি ছুঁয়ে আসছে। ইটিএ চার মিনিট।'

'আগে শুনিনি টমাস গাধাধারের কপ্টার আছে,' সিট থেকে বলল গগল। 'তবে রায়হান একটা বুলেটিন শুনেছিল। এক অয়েল এক্সপ্লোরেশন কোম্পানি থেকে দুটো কপ্টার চুরি হয়েছে। হতে পারে ওই কোম্পানির পাইলটদের হাইজ্যাক করেছে এরা।'

মাথা দোলাল রানা, কোনও মন্তব্য করল না। এখনও জানে না কী ভাবা উচিত।

পার্সোনাল ভিউ স্ক্রিনে স্টার্নের উপরের ক্যামেরা দেখছে গগল। 'আমাদের পিছনে মুভমেন্ট,' বলে উঠল।

পিছনের নদী তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে, সেখান থেকে আসছে দুটো বোট। বাতি জ্বলছে পাইলট হাউসের উপর। বোঝা গেল না সশস্ত্র কি না। ওয়েপন্স স্টেশন থেকে বলে উঠল খোরশেদ নবী, 'ডেটাবেস বলছে ওটা কঙ্গোলিজ মিলিটারি ক্রাফ্‌ট্। আমেরিকার

তৈরি সুইফ্‌ট্‌ বোট।'

'নিশ্চয়ই ঠাট্টা, নবী?' জানতে চাইল সোহেল।

যেন শুনতেই পায়নি নবী: 'ওজন বারো টন। বারোজন ক্রু। ছয়টা ফিফটি ক্যালিবারের মেশিনগান। টপ স্পিড পঁচিশ নট। ডেটাবেস থেকে পড়ছি। বোটে মর্টার যোগ করেছে কঙ্গোলিজ ফোর্স। কাঁধ থেকে ফায়ার হয় এমন মিসাইলও থাকতে পারে।'

প্রতি মুহূর্তে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে। সিদ্ধান্ত নিল রানা: 'রায়হান, স্যামুয়েল আবালার সঙ্গে যোগাযোগ করো।' এই অপারেশনে সরকারের সঙ্গে ওদের কন্ট্যাক্ট ওই ডেপুটি ডিফেন্স মিনিস্টার আবালা। 'তাকে বলবে মিলিটারি বোধহয় হামলা করতে আসছে। তাদের ধারণা নেই, আমরা তাদের পক্ষের লোক। আবার এ-ও হতে পারে, তাদের দুটো সুইফট বোট দখল করে নিয়েছে টমাস গাধাধারের লোক। ...গগল, আমাদেরকে সরিয়ে নাও পিয়ার থেকে। ...নবী, চারপাশে নজর রাখো। কিন্তু কিছু না বলা পর্যন্ত কোনও গুলি ছুঁড়বে না। সত্যিই যদি আমাদের ছদ্মবেশ হারিয়ে যায়, মাধানা বুঝে ফেলবে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে অস্ত্র ফেলে সরে পড়বে। ...ভাল কথা, রায়হান, দেখো তো ওগুলো কাজ করছে কি না।'

কি বোর্ড টিপতে শুরু করেছে কম্পিউটার উইযার্ড। 'আরডিএফ ট্যাগ অ্যাক্টিভেট হয়েছে। ফাইভ বাই ফাইভ, সাড়া দিচ্ছে।'

'ঠিক আছে,' সোহেলের দিকে চাইল রানা। 'তোর কী মনে হয়?'

গম্ভীর হয়ে গেছে সোহেল। 'চিফ ইঞ্জিনিয়ারের বক্তব্য অনুযায়ী, আমরা চলছি ব্যাটারি দিয়ে। চাইলেও বিশ নটের বেশি গতি পাবে না মার্ভেল।'

খুবই সফেসটিকেটেড মেরিন প্রপালশন সিস্টেমে চলে দ্য

মার্ভেল অভ গ্রিস জাহাজটি। ওটার ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিনগুলো চলে সুপার কণ্ডাকটিভ কয়েলে। সাগরের পানি থেকে সংগৃহীত ইলেকট্রনকে ঠাণ্ডা করা হয় হিলিয়াম দিয়ে, ফলে পাওয়া যায় ইলেকট্রিসিটি। ওটা আবার চালায় চারটে বিশাল পাম্প জেট ইঞ্জিনকে। দুটো ভেক্টার নযল আছে জাহাজের স্টার্নে, ওগুলো গতিবেগ স্থির করে। ইঞ্জিনগুলো এতই শক্তিশালী, এগারো হাজার টনি জাহাজকে অফশোর রেসিং বোটের মত দেখতে না দেখতে প্রচণ্ড গতি তুলে দেয়। সাগরের পানি থেকে শক্তি পায় বলে মার্ভেলের জ্বালানির অভাব হয় না। কিন্তু গত কয়েক বছর আগে এমনই একটি ক্রুজ শিপে ভয়ঙ্কর আগুন ধরে। এরপর দুনিয়ার সবখানে মেরিটাইম সেফটি বোর্ড নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেঃ যেহেতু ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিন পুরোপুরি নিরাপদ নয়, এ ধরনের ইঞ্জিন ব্যবহার করা চলবে না। বর্তমানে মার্ভেলই একমাত্র জাহাজ যেটা গোপনে এই ইঞ্জিন ব্যবহার করছে।

এই মুহূর্তে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে আশি মাইল ভিতরে কঙ্গো নদীর তীরে রয়েছে মার্ভেল। এখন বড় সমস্যা, চারপাশে আছে শুধুই মিঠা পানি। লবণাক্ত পানি নেই, তাই পূর্ণ শক্তি পাবে না ইঞ্জিন। আপাতত জেট ইঞ্জিনগুলোকে ব্যবহার করতে চাইলে লাগবে সারি সারি সিলভার-জিঙ্ক ব্যাটারি।

ব্যাটারির পুরো শক্তি বড়জোর ষাট মাইল টানতে পারবে মার্ভেলকে। অর্থাৎ, নদীর মোহনায় পৌঁছুতে পারবে না।

'গগল, তিন ঘণ্টা পরের টাইডাল কণ্ডিশন?' জানতে চাইল রানা।

'আড়াই ঘণ্টা পর জোয়ার।' একবারও ডেটাবেস দেখল না গগল। এসব ওর মুখস্থ।

'একেই বলে জীবন-মরণ সমস্যা,' বলল সোহেল। 'ওরা ধাওয়া করবে।'

'ঠিক আছে, গগল, মাধানার লোক আসার আগেই রওনা হও,' বলল রানা।

বাম হাতে পালস্ জেট্ চালু করল গগল। ক্রাইয়োপাম্প ও অ্যানসিলারি ইকুইপমেন্ট কাজ শুরু করতেই নিঃশব্দে চলতে লাগল ম্যাগনোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিনগুলো। টিউবের ভিতর খলখল শব্দে পিছাল পানি। ডায়াল করে বো এবং স্টার্নের থ্রাস্টারকে শক্তি দিল গগল। ডক থেকে সরে যেতে চাইল বিশাল জাহাজ। টানটান হয়ে উঠল বোলার্ডের দড়িগুলো।

শিকার পালাতে চেষ্টা করছে, ব্যস্ত হয়ে উঠল মাধানার লোক। জাহাজের পাশ থেকে গুলিবর্ষণ করছে। বো থেকে শুরু করে স্টার্ন পর্যন্ত গুলির মুখে পড়ল। ব্রিজের জানালাগুলো বিস্ফোরিত হলো। ভেঙে পড়ল কয়েকটা পোর্টহোল। খোলে লেগে ছিটকে আরেক দিকে ছুটছে বুলেট। এ দৃশ্য দেখবার মত, টেরোরিস্টরা যতই চেষ্টা করুক, সামান্য রং চটে যাওয়া ও কয়েকটি কাঁচ ভাঙা ছাড়া কোনও ক্ষতি হলো না বিশালাকার মার্ভেলের।

পিছন থেকে আসা প্যাট্রল বোটগুলো .৫০ ক্যালিবারের মেশিনগান চালু করেছে। তাতেও কিছু হলো না। নদীতে এই রন্দেভুর জন্য দু' পাশের বিশেষ ব্যালাস্ট ত্যাগ করেছে মার্ভেল, ফলে অনেক উঁচু হয়ে উঠেছে জাহাজ। বোটের গানাররা পরিষ্কার দেখতে পেল রাডার। এবং সে কারণেই রাডার পোস্টের উপর গুলিবর্ষণ শুরু হলো। লোকগুলো ভাবতে শুরু করেছে হাল নষ্ট হলেই অসহায় হয়ে উঠবে জাহাজ। মার্ভেল স্বাভাবিক কোনও জাহাজ হলে সত্যিই বেকার হয়ে যেত, স্রোত ওটাকে নিয়ে যেমন খুশি খেলত। কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, রাডার ছাড়াও মার্ভেল চলতে পারে। ড্রাইভ টিউবের কারণে যে-কোনও দিকে নযলগুলো সরাতে পারে মার্ভেলকে, সরিয়ে নিতে পারে জাহাজ। ওই ড্রাইভ

টিউব আছে মার্ভেলের কিল-এর নীচে।

যুদ্ধের দিকে মনোযোগ নেই গগলের, ক্যামেরা দিয়ে দেখছে ডক। ওখানে পিয়ারের উপর গাঁথা লোহার বোলার্ড। মোটা দড়িগুলো বাধা দিতে চাইছে মার্ভেলকে। আড়াআড়ি ভাবে সরে আসতে চাইছে জাহাজ। স্টার্নের দড়ির দিকে ছুটে এল দুই টেরোরিস্ট, কয়েক সেকেণ্ড পর দেখা গেল ইঁদুরের মত দড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে, কাঁধে ঝুলছে একে-৪৭ রাইফেল। স্টার্নের থ্রাস্টার চালু করল গগল। ঠাস্-ঠাস্ আওয়াজ তুলে ফাটছে পচা কাঠ। পরক্ষণে দেখা গেল ডক থেকে ছিটকে উঠেছে ব্যাঙের ছাতার মত বোলার্ড, যেন ডাক্তারের তোলা পোকা ধরা দাঁত। প্রচণ্ড ওজনের কারণে জিনিসটা ছিটকে এসে লাগল মার্ভেলের গায়ে। প্রকাণ্ড ঘণ্টির মত ঢং-ঢং আওয়াজ হলো।

প্রথম টেরোরিস্ট ধড়াস্ করে পানিতে পড়ল। জাহাজ সরিয়ে নেয়ার জন্য স্টার্নের থ্রাস্ট রিভার্সে নিয়েছে গগল, ওটার ব্লেডের ভিতর কুচিকুচি হলো লোকটার দেহ। মুহূর্তের জন্য জাহাজের পাশে লাল রঙের পানি দেখা গেল, পরক্ষণে মিশে গেল স্রোতের ভিতর। দ্বিতীয় লোকটি দু'হাতে দড়ি ধরে ঝুলে রইল। অটোমেটেড নোঙরের সঙ্গে উঠে আসছে। হওসহোলের কাছে পৌঁছেই লাফ দিয়ে ডেকে উঠতে চাইল। কিন্তু ওখানে রয়েছে স্বর্ণা ও নিশাতের টিম। নিজ নিজ কমব্যাট ভেস্টের ট্যাকটিকাল ভিউ স্ক্রিনে প্রত্যেকে দেখেছে লোকটাকে।

ডেকে উঠবার আশায় বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে তার চোখ, কিন্তু স্বর্ণার কাঁধে দেখতে পেল ফ্র্যাঞ্চি স্পাস-১২ কমব্যাট শটগান। লোকটার কানের ভিতর গ্লক পিস্তল গুঁজে দিল জলিল খান।

'তোমার যা খুশি, বন্ধু,' নরম স্বরে বলল স্বর্ণা।

হাত দুটো আস্তে করে সরিয়ে নিল লোকটা, ঝুপ করে নেমে গেল নদীর বুকে। ফেনার ভিতর তাকে আর দেখা গেল না।

অপারেশন্স সেন্টারে দ্বিতীয় বোলার্ডের দিকে চাইল গগল। শত শত টন চাপ পড়ছে, কিন্তু ডক থেকে উপড়ে আসছে না ওটা। বদলে সামনের দিকের তক্তা ফাটতে শুরু করেছে। ডকের পনেরো ফুট লম্বা দুটো তক্তা ছিটকে উঠল, ও-দুটোর বাড়ি খেয়ে পানিতে গিয়ে পড়ল তিন সৈনিক। তক্তা শুধু গেল তা-ই নয়, গোটা ডকের একটা পাশ কাত হয়ে ঝুলে পড়ল।

'ছাড়া পাওয়া গেছে,' বলল গগল।

'তা হলে ভাগো!' তাড়া দিল রানা। ট্যাকটিকাল ডিসপ্লে দেখছে। আর মাত্র দু'মিনিট পর হাজির হবে কপ্টার। ঘণ্টায় এক শ' মাইল ওগুলোর গতি। রানার ধারণা, বিশাল হবে অয়েল কোম্পানির কপ্টারগুলো, তেমনি আধুনিক। মার্ভেলের চারপাশে যে অস্ত্র, তাতে সহজেই ডকের সৈনিক ও কপ্টার দুটোকে ফেলে দিতে পারবে ওরা। বোটগুলো ধ্বংস করতেও সময় লাগবে না। কিন্তু ওদের মিশন এখানে ভিন্ন। একটা কাজ নিখুঁতভাবে শেষ করবার ভার দেয়া হয়েছে ওদেরকে। 'গগল, বিশ নট গতি তোলো,' বলল রানা।

'বিশ নট,' বলল গগল।

মসৃণ ভাবে গতি তুলছে মার্ভেল। স্রোতের তীব্র টানে হুড়মুড় করে নদীর ভিতর পড়ল ডকের অর্ধেক অংশ, সঙ্গে সঙ্গে ভেসে গেল কাঠগুলো। একটু পর তীর থেকে থেমে গেল রাইফেলের গুলি। কিন্তু ধেয়ে আসছে দুই প্যাট্রল বোট, পঞ্চাশ ক্যালিবারের গুলি এসে লাগছে জাহাজের গায়ে।

'আরপিজি লঞ্চ,' তীক্ষ্ণ শোনাল নবীর কণ্ঠ।

জঙ্গলের ভিতর আছে মাধানার ট্রাক, লোকগুলো মার্ভেলের পিছু নিয়েছে। ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে ছিটকে বেরুল খুদে মিসাইল, পানির উপর দিয়ে আসছে। মার্ভেলের বো-র উপর লাগল গ্রেনেড। জাহাজকে রক্ষা করছে আর্মার্ড প্লেট। কিন্তু

বিস্ফোরণটা হলো কান ফাটানো। ডেকের উপর দিয়ে বইল লাল আগুনের হলকা। কয়েক সেকেণ্ড পর একটা সুইফ্‌ট্ বোট থেকে এল আরপিজি। নীচ থেকে ছুঁড়ে দেয়ায় স্টার্নের উপর দিয়ে গেল মিসাইল। রেলিঙের রং পুড়ে গেল, তারপর সোজা গিয়ে চিমনির উপর আছড়ে পড়ল গ্রেনেডটা। চিমনির ভিতর রয়েছে মার্ভেলের সফেসটিকেটেড রেইডার ডোম, ওটা ধ্বংস হলো না, কিন্তু বিস্ফোরণে বিকল হয়ে গেল সিস্টেম।

'আমি দেখছি কী করা যায়,' দ্রুত বলল রায়হান। ফাঁকা হয়ে গেছে ওর মনিটর। অপারেশন্স সেণ্টার থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল সে। একই সময়ে ফায়ার কণ্ট্রোল টিম ও ইলেকট্রনিক্স স্পেশালিস্টদের সংকেত দিল কমপিউটার। সবাই ছুটল উপরে।

রায়হান চলে যেতে না যেতেই ওঅর্ক স্টেশনে এসে বসল সানজিদা স্বর্ণা। ওর কণ্ঠ অতি তীক্ষ্ণ, তার চেয়ে তীক্ষ্ণ কথার খোঁচাগুলো। 'এক মিনিটের ভিতর আসছে কপ্টার, মাসুদ ভাই। শেষবার রেইডার কাজ করার সময় দেখা গেছে নদীর সামনে থেকে আসছে কোনও জলযান।'

সামনের ক্যামেরাগুলোর রেজোলিউশন বাড়াতে বলল রানা। নদীর স্রোত যেন কুচকুচে কালো তেলের তৈরি। দু' পাশে একের পর এক টিলা, চাঁদের আলো পড়ে রুপালি মনে হচ্ছে। দূরের বাঁকে ঘুরছে বড়সড় একটি ফেরি। ওটার তিনটে ডেক, নাক-বোঁচা বো, কিন্তু মার্ভেলের সবার মনোযোগ কেড়ে নিল অন্য কারণে। ইনফ্রারেড ক্যামেরা পরিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছে, সবচেয়ে উঁচু ডেকে অজস্র মানুষ! শুধু তা-ই নয়, নীচের দুই ডেকেও গিজগিজ করছে যাত্রী। সবাই চলেছে মাতাদি নদী-বন্দরে।

'ফেরিতে অন্তত পাঁচ শ' লোক!' চাপা স্বরে বলল গগল।

'নিয়ম মানলে বড়জোর দু' শ' যাত্রী থাকত,' বলল রানা। 'মার্ভেলের পোর্ট সাইডে রাখো ফেরিটাকে। ওই পুরনো বালতি

আর আরপিজির মাঝে রাখতে হবে মার্ভেলকে।'

কাজ শুরু করেছে গগল, একবার দেখে নিল ফ্যাদোমিটার। বড় দ্রুত উঠে আসছে নদীর মেঝে। 'রানা, কিলের নীচে মাত্র বিশ ফুট পানি। আঠারো। পনেরো। দশ। সাত!'

'থেমো না,' বলল রানা। জঙ্গলের ভিতর থেকে এল গুলির আওয়াজ। রোমান মোমবাতির মত জ্বলছে রাইফেলের মাযল-ফ্লাশ। লঞ্চ করা হলো বেশ কয়েকটা আরপিজি, লেজে লাল আগুন নিয়ে আসছে।

ফেরির দিকে চলেছে মার্ভেল, তারই ভিতর একের পর এক রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড এসে পড়ছে জাহাজের উপর। কেঁপে কেঁপে উঠছে মার্ভেল, লালচে হয়ে উঠেছে মাথার উপরের আকাশ। একটা মিসাইল লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, পলকের জন্য থমকে গেল মার্ভেলের সবাই। এবার বোধহয় ফেরির গায়ে গিয়ে পড়বে গ্রেনেড। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ওটার মোটর থেমে গেল। ফেরির খোল থেকে বিশ ফুট দূরে বিস্ফোরিত হলো। ভীষণ ভয় পেয়ে পাগলের মত ছোটাছুটি শুরু করেছে যাত্রীরা, সবার একমাত্র উদ্দেশ্য: গুলি থেকে সরবে।

'লেফটেন্যান্ট আফতাব, এখনই পুরো গতি চাই!' সিংহের মত গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। মাধানার লোকের দায়িত্বহীনতা দেখে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে ওর। 'লোকগুলোকে আড়াল দিতে হবে।'

এক সেকেণ্ড পর ইঞ্জিনরুমে ব্যাটারির সার্কিট থেকে সেফটিগুলো খুলে ফেলল নেভির ইঞ্জিনিয়ার। পাম্প জেটগুলো কয়েক অ্যাম্পিয়ার বাড়তি শক্তি পেল। আরও তিন নট গতি বাড়ল। কিন্তু এর ফলে কমবে ওদের রেঞ্জ, এক মাইল কম এগুতে পারবে মার্ভেল। অথচ, এখন একমাত্র কাজ হওয়া উচিত মোহনার কাছে যাওয়া, ওখানে আছে সাগরের লবণাক্ত পানি।

নদীর মাঝে সরে এল ফেরি, ওটাকে পাশ কাটাতে হলে তীর

ঘেঁষে যেতে হবে মার্ভেলকে। যে-কোনও সময়ে চরে আটকা পড়বে জাহাজ। ক' মুহূর্ত পর দু'পাশে সরে গেল সুইফট বোটদুটো, তীরে গিয়ে আছড়ে পড়ল ফেনায়িত পানি। দুই বোট তেড়ে আসছে মার্ভেলের দিকে। ইঞ্জিনওয়ালা ছোট এক নৌকা আসছিল, ফেরির ঢেউ মাতাল করে দিল ওটাকে। একটা সুইফট বোট ঢেউয়ের ভিতর দিয়ে গুঁতো দিল নৌকার মাঝ বরাবর। সঙ্গে সঙ্গে ফেটে গেল ডিঙির কাঠের খোল। পাঠাতনের উপর দুই লোক ছিল, ছিটকে দশ হাত দূরে পানিতে পড়ল। জায়গাটা পেরিয়ে গেল সুইফট বোট, লোকদুটোকে আর দেখা গেল না।

কন্ট্রোল নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে গগল, ওর দিকে চাইল রানা। এত বড় জাহাজ নদীর ভিতর সরানো কঠিন, তার উপর সামনে থেকে আসছে বড় আকারের জলযান। তবে গগলের উপর বিশ্বাস আছে রানার, বিপদ সামলে মার্ভেল নিয়ে এগিয়ে যাবে আর্মস্ ডিলার। যদি বড় কোনও ভুল হয়ে যায়, রানা ওর চেয়ারে বসেই জাহাজ চালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিতে পারবে।

রানার কানের ভিতর বলে উঠল একটা কণ্ঠ: 'স্যর, আমি নিশাত। এইমাত্র কপ্টার দুটো দেখেছি। এত দূর থেকে বোঝা গেল না কোন্ কোম্পানির। তবে প্রকাণ্ড। একেকটায় অন্তত দশজন আঁটবে। বোধহয় এখনই ফেলে দেয়া উচিত।'

'না। পাইলট দুজন সিভিলিয়ান। গাধাধারের লোক ওদের কিডন্যাপ করেছে। তা ছাড়া, ওদের বুঝতে দেয়া চলবে না আমাদের ক্ষমতা কতটা। আগেই এ নিয়ে কথা হয়েছে। চিন্তা করবেন না, মার্ভেল হয়তো আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাগরে পৌঁছবেই। এখন শুধু খেয়াল রাখুন, কপ্টার থেকে যেন জাহাজে লোক নামাতে না পারে।'

'আমরা তৈরি।'

'ঠিক আছে।'

খরস্রোতা কঙ্গো নদীতে পরবর্তী একটি ঘণ্টা ছুটে চলল মার্ভেল। বারবার ফাঁকি দিতে চাইল সুইফট বোট দুটোকে। ওগুলো থেকে মার্ভেলে এসে লাগছে আরপিজি। কখনও কখনও দু'পাশের জঙ্গল থেকেও এল গুলি। কোথাও কোথাও নদীর পাশ দিয়ে গেছে সড়ক, সেসব জায়গায় মার্ভেলকে অ্যাম্বুশ করতে চাইল মাধানার ফোর্স। সর্বক্ষণ মাথার উপর থাকল কপ্টার দুটো। এখন পর্যন্ত জাহাজে লোক নামাতে চায়নি। রানার ধারণা: ওরা আশা করছে আরপিজির কারণে নদীর তীরে আটকা পড়বে মার্ভেল। সহজে কপ্টার থেকে জাহাজে নামিয়ে দেবে লোক।

ইনগা ড্যাম পেরুতে শুরু করেছে মার্ভেল। ওটা বিশাল এক কংক্রিটের বাঁধ, কঙ্গোয় এসে মেশা ইনগা নদীর পানি আটকে রেখেছে উজানে। ইনগা ও অন্য আরও দুই বাঁধ থেকে মিলছে আফ্রিকার এদিকটার বেশিরভাগ ইলেকট্রিসিটি। দু' নদীর স্রোত মিশে যেতেই ভয়ঙ্কর তাণ্ডব শুরু করল ঢেউগুলো। শক্তিশালী জাহাজ মার্ভেল, কিন্তু তারপরেও টলমল করতে লাগল। বাধ্য হয়ে রিভার্স থ্রাস্ট ব্যবহার করল গগল। পালস জেটগুলো কাজ করছে, নইলে আড়াআড়ি ভাবে মার্ভেলকে তীরের উপর আছড়ে ফেলত প্রকাণ্ড সব ঢেউ।

'মাসুদ ভাই, লাইনে স্যামুয়েল আবালা অপেক্ষা করছেন,' বলল স্বর্ণা। 'আপনার স্টেশনে লাইন দিলাম।'

'ডেপুটি মিনিস্টার আবালা, আমি ক্যাপ্টেন মাসুদ রানা,' বলল রানা। 'আশা করি জানেন এখানে কী ঘটছে?'

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন। কর্নেল আদি মাধাভ মাধানা ওর হীরা ফেরত চাইছে।' ডেপুটি ডিফেন্স মিনিস্টারের ইংরেজি এতই বিকৃত, কষ্ট করে বুঝে নিতে হচ্ছে রানার। 'আর আমাদের দুটো রিভার বোট চুরি করেছে লোকটা। আমাদের দশজন সৈনিক মাতাদি ডকে মারা পড়েছে। ওই বোট দুটো ওখানে থাকার কথা ছিল।'

'একটা অয়েল কোম্পানি থেকে দুটো কপ্টারও পেয়েছে।'

'তা-ই?' আর কোনও মন্তব্য করলেন না আবালা।

'আমাদের সাহায্য দরকার।'

'তাই নাকি? আপনাদের চিফ, মেজর জেনারেল রাহাত খান কিন্তু আমাদের প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছেন: আপনারা নিজেদের দেখভাল করতে জানেন।'

লোকটাকে ধমকে উঠতে মন চাইল রানার। মনে পড়ল কিছুদিন আগের কথা।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভিনসেন্ট গগল যখন ওকে বলল, তার একটা কাজ করে দিতে পারে কি না, কোনও মন্তব্য করেনি রানা। শুধু ভুরু নাচিয়ে বলেছে, 'সত্যি বিয়ে করবে?'

'মরতে?' ঘনঘন মাথা নেড়েছে গগল। 'সুখে থাকতে ভূতে কিলায়? আমি খুবই আনন্দে আছি।'

এরপর খুলে বলেছে কঙ্গোলিজ সরকারের সঙ্গে ওর চুক্তির কথা। ওর কাছ থেকে বেশ কিছু অস্ত্র কিনবে সরকার। তবে সেসব অস্ত্র নিজেরা নেবে না, ওসব তুলে দিতে হবে প্রতিপক্ষ বিদ্রোহীদের হাতে। তাদের গুপ্তচর ঢুকে পড়েছে বিদ্রোহী-নেতা ঠাণ্ডা মাথার জাত খুনি টমাস গাধাধারের দলে। এবং সেই সরকারী এজেন্টই রক্ত-পিশাচটাকে বুঝিয়েছে, কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারলে দখল করে নিতে পারবে তারা দেশের ক্ষমতা। গগলের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা সে-ই জানিয়েছে তাদের। গাধাধার অস্ত্র কিনতে রাজি হতেই গগলের সঙ্গে চুক্তি করেছে তার সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড, কর্নেল আদি মাধাভ মাধানা: তারা সিকি পাউণ্ড আকাটা হীরার বদলে অস্ত্র কিনবে।

এদিকে চুক্তি অনুযায়ী অস্ত্রের জন্য কঙ্গোলিজ সরকার আগাম টাকাও দিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, টমাস গাধাধারের কাছ থেকে সত্যিই যদি কোনও হীরা পাওয়া যায়, তা-ও পাবে গগল।

'রানা, আমি মার্ভেলকে অস্ত্র সরবরাহকারী জাহাজ হিসেবে চাইছি,' খুবই সঙ্কোচের সঙ্গে বলেছে আর্মস ডিলার।

'আমি রাজি,' বলেছে রানা। 'কিন্তু আমার বসের সঙ্গে...'

'তার আগে শোনো,' বাধা দিয়ে বলেছে গগল। 'যতটুকু জানি, কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট তোমার বসের ক্লাসফ্রেণ্ডের ছেলে। শ্বযুদ্ধে ওঁর বাবা ও তোমার বস একই ফ্রন্টে লড়াই করেছেন। ইফ হালালি সে সময় ছিলেন সার্জেন্ট, আর রাহাত খান ছিলেন জর। প্রেসিডেন্টের কাছে শুনেছি, তোমার বস কয়েকবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁর বাবার প্রাণ বাঁচান। অন্য সূত্র থেকে জেনেছি, সাইফ হালালিও একবার প্রাণ বাঁচিয়েছেন মেজর জেনারেলের। পদ উঁচু-নিচু হলেও কখনও বন্ধুত্বে ঘাটতি পড়েনি। মনে করি না তোমার বস্ অরাজি হবেন। তা ছাড়া, আমি রানা এজেন্সির সাহায্য চাইছি টাকার বিনিময়ে। কোনও হীরা পেলে তা দিয়ে দেব রানা এজেন্সিকে। তা যদি পাওয়া না যায়, উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেব।'

'ধরে নাও কাজটা করছি,' বলেছে রানা। গগলের সামনেই বিসিআই চিফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

রানা সংক্ষেপে সব বলবার পর মেজর জেনারেল রাহাত খান বলেছেন, 'শুনেছি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই বিপদের মুখে আছে রাইফ হালালি। খুবই খারাপ লোক ওই টমাস গাধাধার, এরই মধ্যে কয়েক হাজার মানুষ খুন হয়েছে ওর হাতে। ওখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নয়জন অফিসার ও সৈনিক ইউএনও থেকে পিস কিপার ছিল, তাদেরকেও কাফে শহরের কাছে খুন করেছে লোকটা। যদি সম্ভব হয়, আমরা অবশ্যই চরম প্রতিশোধ নেব। যদি হালালির কোনও সাহায্যে আসতে পারো, তো খুবই ভাল। তোমার তো ছুটিও চলছে।'

যা বলবার বলে দিয়েছেন চিফ, তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে

গগলকে জানিয়ে দিয়েছে রানা: রানা এজেন্সির সামুদ্রিক ফ্রন্ট মার্ভেলকে নিয়ে যাবে কঙ্গো নদীতে— তবে গগলকেই চালাতে হবে জাহাজটা।

বাস্তবে ফিরল রানা, মেজাজ বিগড়ে গেছে, কিন্তু স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'মিস্টার আবালা, আমরা যদি মাধানার লোকের লাশ ফেলতে শুরু করি, তা হলে তাদের মনে অস্ত্রের ব্যাপারে সন্দেহ ঢুকবে। আপনাদের কথা মত অস্ত্রের ভিতর লুকানো হয়েছে রেডিও ডিরেকশন ট্যাগ, ভাল করে খুঁজলে সবই ফাঁস হয়ে যেতে পারে। অস্ত্রগুলো থেকে ট্যাগ বের করে তারপর টমাস গাধাধারের আস্তানায় নিলে আপনাদের উদ্দেশ্য পুরোপুরি ব্যর্থ হবে।'

এ চুক্তি হওয়ার পর এই নিয়ে লোকটাকে তৃতীয়বার একই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে রানা। এখন ওর ধারণা হয়েছে: লোকটার মাথায় তাজা গোবরও নেই, আছে শুধু শুকনো ঘুঁটে।

কী যেন বলতে শুরু করেছে স্যামুয়েল আবালা, কিন্তু মর্টারের আওয়াজে প্রথম কথাগুলো শোনা গেল না। সুইফট বোট থেকে মর্টার এসে পড়ছে মার্ভেলের কাছে। জলোচ্ছ্বাসের মত পানি এসে লাগছে জাহাজের পাশে। '...রওনা... বোমা থেকে। পৌঁছুতে কমপক্ষে এক ঘণ্টা।'

'দয়া করে আরেকবার বলুন, মিনিস্টার। আপনি কি আর্মি পাঠাচ্ছেন?'

হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল অপারেশন্স সেন্টার, চেয়ার থেকে ছিটকে পড়ল সবাই। কঙ্গো নদীর মেঝের ভিতর গেঁথে গেছে মার্ভেলের তলা। এত দ্রুত থেমেছে জাহাজ, মেস হলে চুর-চুর হয়েছে দামি সব চায়নিজ ডিশ। মেডিকেল বে-তে পোর্টেবল এক্স-রে মেশিন আলগা ছিল, ডক্টর ফারার অসতর্কতার ফলে, ওটা পড়ে বিকল হয়েছে।

সবার আগে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল রানা। 'গগল, কী

অবস্থা?'

'হঠাৎ উঠে এল নদীর তলা। আগে এ জিনিস কখনও দেখিনি। বুঝতেই পারিনি এমনও হতে পারে।'

'আফতাব, ইঞ্জিনের কী অবস্থা?'

এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকে সুপার কমপিউটার, জাহাজ আটকা পড়তেই ওটা থামিয়ে দিয়েছে ইঞ্জিনগুলোকে। কিছুক্ষণ আগে অপারেশন্স সেন্টারে এসে বসেছে আফতাব, এখন স্ক্রিনে কী যেন দেখছে। ভুরু কুঁচকে গেছে। নাকের ডগা ডলছে হাতের তালু দিয়ে। তারপর কি বোর্ড টিপতে শুরু করল।

'আফতাব?' দ্বিতীয়বার জানতে চাইল রানা।

'পোর্ট টিউব কাদায় ভরে গেছে। স্টারবোর্ডের টিউব বিশ পার্সেন্ট কাজ করবে। পিছাবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। আর যদি এগুতে চাই, ওটাও বুজে যাবে।'

'গগল, হেলম আমি দেখছি,' বলল রানা।

'তোমার হাতে তুলে দিলাম।' মার্ভেলের ক্ষতি হয়েছে ভাবতে গিয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে গগলের। প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসে ও এই জাহাজটিকে।

পালস জেট টিউব খুব মসৃণ হয়, জিনিসটা যেন রাইফেলের ব্যারেলের ভিতর অংশ। বিশেষ এক অ্যালয় দিয়ে তৈরি। ময়লা বা জং ওটার বারোটা বাজাতে পারে। সামান্য ক্ষতি হলেও গতির উপর তা খারাপ প্রভাব ফেলবে। রানা জানে, কাদা-মাটি লেপে ফেলেছে টিউবদুটোকে। এখন যদি ইঞ্জিন দিয়ে চাপ তৈরি করে, একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে টিউব। ঝুঁকি নেয়া মস্ত ভুল হবে।

পোর্ট সাইড টিউব স্ট্যাণ্ডবাই রাখল রানা, একটু একটু করে রিভার্সে গতি দিতে শুরু করেছে স্টারবোর্ড টিউবকে। বাইরের ক্যামেরার উপর চোখ রেখেছে, জাহাজের বো থেকে বলকে বেরুচ্ছে কাদা-পানি। একইসঙ্গে খেয়ালে রাখছে জেট প্রপাল-

শনের ইণ্ডিকেটার। ডায়াল করে আরেকটু গতি বাড়াল রানা। পঁচিশ পার্সেন্ট শক্তি দিতে গিয়ে গাল কুঁচকে গেল ওর। চেয়ে আছে সোহেল। বুঝতে পারছে, হৃৎপিণ্ড মোচড় খাচ্ছে প্রিয় বন্ধুর।

মোটেই নড়ল না মার্ভেল। নিজের বিপুল ওজন নিয়ে কাদার ভিতর ভাল মতই আটকা পড়েছে।

'মাসুদ ভাই,' সতর্ক স্বরে বলল মেরিন ইঞ্জিনিয়ার আফতাব।

তার আগেই পাম্পগুলো বন্ধ করে দিয়েছে রানা। হাতে কোনও উপায়ই নেই ওর। কোনও পরিকল্পনা করতে বড়জোর পনেরো সেকেণ্ড পাবে, এরপর আসবে কপ্টারগুলো, বিদ্রোহী সৈনিকরা নেমে আসবে মার্ভেলের ডেকের উপর। বিশ এমএম গ্যাটলিং গানের পাঁচ সেকেণ্ডের দুটো গুলির স্রোত আকাশ থেকে উড়িয়ে দেবে কপ্টার দুটোকে। কিন্তু তার মানেই, বেসামরিক পাইলটদের মৃত্যু। শুধু তা-ই নয়, প্রমাণ হবে ওদের এই মার্ভেল স্বাভাবিক কোনও জাহাজ নয়। এরপর ধ্বংস করতে হবে সুইফট বোট দুটোকে। তাতেই থামবে না লড়াই, মাধানা যে মুহূর্তে বুঝবে মার্ভেল আটকা পড়েছে, আরও বোট ও সৈনিক পাঠাবে সে। হীরাগুলো হাত ছাড়া করা, বা মিশন বাতিল করবার কথা একবারও ভাবছে না রানা।

'আফতাব, হাওয়া আসছে আমাদের পিছন থেকে, তুমি ঘন ধোঁয়া তৈরি করো। মার্ভেল যেন হারিয়ে যায় ধূম্রজালে। চালু করো ফায়ার সাপ্রেশন ক্যানন।' মার্ভেলের সুপারস্ট্রাকচারে চার কোনায় রয়েছে চারটে জল-কামান। মাত্র এক মিনিটে প্রতিটি পাম্প একহাজার গ্যালন পানি ছুঁড়তে পারে। মার্ভেলের ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিন লাগে না, পাম্পগুলো চলে ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে। 'জল-কামানের রেঞ্জ দু' শ' ফুট, কাজেই ধারণা করছি, এতেই কপ্টারগুলো জাহাজে লোক নামাতে পারবে না।' মাইক্রোফোনে বলল রানা, 'আপা, আমরা ওয়াটার গান চালু

করছি, তৈরি থাকুন। এতে যদি কাজ না হয়, সবাইকে অনুমতি দেয়া হলো, আপনারা শটগান ও পিস্তল ব্যবহার করবেন। মনে করি না ও-দুটো অস্ত্র ব্যবহার করলে মাধানা সন্দেহ করবে।'

'ঠিক আছে, স্যর।'

'আর, আপা, আপনি জলিলকে নিয়ে বোট গ্যারাজে আমার সঙ্গে দেখা করুন। আপনাদের জন্য একটা মিশন আছে। যুদ্ধের জন্যে পুরো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসুন।'

চেয়ার থেকে নেমে পড়েছে রানা, চলেছে এলিভেটরের দিকে। বোট গ্যারাজে যেতে হলে আরও দুটো তলা নামতে হবে ওকে। পাশ থেকে হাতের ইশারা করল সোহেল। 'কীরে? ধোঁয়া আর জল-কামান বুঝলাম, কিন্তু আপা আর জলিলের জন্য কীসের মিশন?'

'কেন, মার্ভেলকে নিয়ে ভাগতে হবে না?'

ওদের বন্ধুত্ব এমনই সুদৃঢ়, একে অপরের ক্ষমতাকে কখনও ছোট করে দেখে না। সোহেল এখনও পূর্ণ-বিশ্বাসই রাখল। নিচু স্বরে বলল, 'কয়েক হাজার টন কীভাবে সরাবি রে, প্রিয় শ্যালক?'

দরজার দিকে রওনা হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমি জাহাজই সরাব না, দশ ফুট উঁচু করে দেব নদী!'

চার

নামিবিয়া, ওয়ালভিস বে-র দক্ষিণে।

মসৃণ পাকা সড়কের উপর হু-হু হাওয়ায় উড়ছে ধুলো। ঠাণ্ডা

বাতাস বইছে মরুভূমিতে, তপ্ত অ্যাসফল্টের উপর এখানে ওখানে তৈরি হচ্ছে বালির খুদে ঢিবি, কোথাও সামান্য গর্ত— সব যেন ধোঁয়া বা ঝুরঝুরে তুষার। বহু আগেই অস্তে গেছে সূর্য, চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে ফ্যাকাসে সাদা ঢিবি।

দীর্ঘ এ পথে চলেছে একটি পিকআপ। জোরালো হাওয়ায় যেন সরে যেতে চাইছে সড়ক, একপাশে সৈকতে মাথা কুটছে বহু পথ অতিক্রম করে আসা পরিশ্রান্ত ঢেউ। এখন সোয়াকোপ্‌মুণ্ড ও বন্দর-শহর ওয়ালভিস বে থেকে বিশ মাইল দক্ষিণে রয়েছে ফোর হুইল পিকআপ। রাতের এই নির্জনতায় যে কেউ ভাবতে পারে, ওই গাড়িই দুনিয়ায় একমাত্র চলন্ত যান।

ড্রাইভিং সিটে হঠাৎ শিউরে উঠল কার্টা অস্টিন। 'হুইলটা ধরবে?' সঙ্গীর দিকে চাইল।

হাত বাড়িয়ে স্টিয়ারিং হুইল নিল ওর সঙ্গী।

মাথার ঢাকনিওয়ালা সুয়েটশার্ট পরতে লাগল কার্টা অস্টিন। কলারের ভিতর থেকে বের করে নিল দীর্ঘ কেশ, সব এলিয়ে পড়ল কাঁধ জুড়ে। সন্ধ্যায় সূর্যের শেষ কিরণে বালির ঢিবি যেমন হয়, তেমনি লালচে রঙা ওর চুল। ভোরে যেমন হয় গম্ভীর-শান্ত সাগর, ঠিক তেমনি গভীর নীল ও নিঃসঙ্গ ওর চোখদুটো।

'আমি এখনও বলব, সকাল তক অপেক্ষা করা উচিত ছিল। পারমিট নিয়েই ঢুকতে পারতাম স্যাণ্ডউইচ বে-তে।' এ নিয়ে তৃতীয়বার অভিযোগ করেছে রন কুবলিকি। ওরা দু'জন ইংরেজ। হোটেল থেকে বেরিয়েছে বহুক্ষণ। 'আপনি ভাল করেই জানেন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ চায় না সংরক্ষিত এলাকায় টুরিস্টরা ঘুরঘুর করুক।'

'কুবলিকি, আমরা ডায়মণ্ড কোম্পানির লিয নেয়া মাইনিং এলাকার দিকে যাচ্ছি না, চলেছি একটা বার্ড স্যাংচুয়ারিতে,' প্রায় ধমক দিল কার্টা।

'সেটাও আইনত দণ্ডনীয়।'

'তা ছাড়া, ভাল লাগেনি লাজরাসের কথাবার্তা। আমার ধারণা ও আমাদেরকে দেখা করতে দিতে চায় না দাদু এবেলের সঙ্গে। মনে হয়েছে, কী যেন লুকাচ্ছে।'

'কে লুকাতে চেয়েছে? দাদু এবেল?'

'না, আমাদের বাচাল গাইড, ব্র্যাড এন লাজরাস।'

'আপনার কেন এমন মনে হলো? আমরা আসার পর থেকে নানান সাহায্য করছে সে।'

মুখ ঘুরিয়ে সঙ্গীর দিকে চাইল কার্টা অস্টিন। ড্যাশ-বোর্ডের সবুজ আলোয় রন কুবলিকিকে জেদি ছেলে মনে হচ্ছে। এখনও যেন পূর্ণাঙ্গ পুরুষ হয়ে ওঠেনি। 'তোমার মনে হয় না একটু বেশি সাহায্য করতে চাইছে? লোকটা নিজে থেকে হোটেলে এসে কাজ নিয়েছে। ওয়ালভিস বে'র সব জেলেকে চেনে। ট্যুর কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করে পাইয়ে দিয়েছে হেলিকপ্টার। বদলে খুব কম পয়সা নিয়েছে। এ থেকে কী মনে হয়?'

'আমাদের কপাল ভাল।'

'সৌভাগ্যের উপর ভরসা করি না আমি।' নতুন করে সড়কের উপর চোখ রাখল কার্টা। 'আমরা যখন বুড়ো জেলে এবেলের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলাম, তখন থেকেই নানাভাবে বাধা দিতে চাইছে লোকটা, বলছে ওখানে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না। প্রথমে বোঝাতে চাইল, বুড়ো এবেল অতি সাধারণ এক জেলে, তীর থেকে কখনও সাগরের এক মাইল ভিতরেও যায় না। তারপর বলল, ওই লোকের মাথা খারাপ। তাতেও যখন যেতে চাইলাম, বলল দাদু এবেল ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক মানুষ— শোনা যায় মানুষও খুন করেছে।

'তুমি তো জানো, জেলেদের কথা শুনেই ধারণা করেছি দাদু এবেলের সঙ্গে দেখা করা উচিত আমার।' মাথা দোলাল কার্টা।

'জেলেরা বলছে, স্কেলিটন কোস্টের আশপাশের পানি ওই বুড়োর চেয়ে বেশি কেউ চেনে না, কখনও চিনবেও না। এ থেকে মনে হতেই পারে, বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলা উচিত। আমাদের প্রজেক্টে সে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। অথচ আমাদের গাইড চাইছে, যেন বুড়োর সঙ্গে দেখা না করি। ...বলতে পারো, কেন? কুবলিকি, আমার ধারণা: আমাদের নয়, অন্য কোনও দলের হয়ে কাজ করছে লোকটা।'

'আমরা আগামীকাল সকালে রওনা হতে পারতাম।'

তখন তখনই মন্তব্য করল না কার্টা। কিছুক্ষণ পর বলল, 'এখন প্রতিটি মুহূর্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেউ না কেউ ঠিকই টের পেয়ে যাবে আমরা কী করছি। এরপর হাজারো লোক হাজির হবে কঙ্কাল উপকূল খুঁজতে। আর তখনই সরকার হুকুম জারি করবে সৈকতের কাছে যাওয়া চলবে না। বন্ধ করে দেয়া হবে সবরকম মাছ ধরা, প্রয়োজনে কারফিউ জারি করবে। সেক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে উঠবে আমাদের এক্সপিডিশন। তুমি আগে কখনও এ ধরনের কাজ করোনি, কিন্তু আমি করেছি।'

'এত ঘুরে কী পেয়েছেন?' প্রচ্ছন্ন টিটকারির সুরে বলল কুবলিকি। জানে, উত্তর কী হবে।

'না, পাইনি কিছুই,' স্বীকার করল কার্টা। 'তবে তার মানে এটা নয় যে আমি আমার কাজ জানি না।'

আফ্রিকার বেশির ভাগ দেশের সড়ক খুবই ভাঙাচোরা, কিন্তু নামিবিয়ার যোগাযোগ মন্ত্রণালয় প্রচুর কাজ করেছে গত কয়েক বছরে। সড়কে সামান্যতম গর্ত নেই। রাত চিরে এগিয়ে চলেছে টয়োটা ফোর-হুইল-ড্রাইভ গাড়িটা। আরও কিছুক্ষণ পর একটা মোড়ে পৌঁছে গেল, এখানে একটু থামল কার্টা। সামনে পিকআপের চাকার চেয়ে উঁচু বালির প্রান্তর। অনেক আগেই ঢাকা পড়েছে অ্যাসফল্ট। ক্লাচ টিপে নিচু গিয়ার ফেলল কার্টা, তারপর

বালির স্তূপ ঠেলে এগুতে শুরু করল। এখানে এলে আটকা পড়ত টু-হুইল-ড্রাইভ গাড়ি। পঁচিশ মিনিট এগুনোর পর একটা পার্কিং এরিয়ায় পৌঁছে গেল পিকআপ। একটু দূরে দেখা গেল সাইক্লোন ফেন্স। ওখানে ঝুলছে সাইনবোর্ড:

গাড়ি আর সামনে যাবে না। এখানেই রাখুন।– কর্তৃপক্ষ।

স্যাণ্ডউইচ বে-তে পৌঁছে গেছে ওরা। সামনে বিস্তৃত লেগুন। মাটির নীচের পাথর থেকে বেরিয়ে আসছে এই মিঠা পানি। প্রতি বছর ভিড় করে এখানে পঞ্চাশ হাজার মৌসুমী পাখি। পার্কিং এরিয়ায় গাড়ি রাখল কার্টা, তবে এখনও চলছে ইঞ্জিন। কুবলিকির জন্য অপেক্ষা না করেই সিট থেকে নেমে পড়ল, নরম বালির নীচে ডুবে গেল বুটের গোড়ালি। টয়োটার পিছনে চলে এল। ওখানে রেখেছে ইনফ্লেটেবল রাফ্‌ট্। সঙ্গে রয়েছে ইলেকট্রিক পাম্প। গাড়ির বারো ভোল্টের সিস্টেম ওটাকে চালাবে।

দেখতে না দেখতে ফুলে উঠল রাফ্‌ট্, ব্যাগ ভরা গিয়ার নামিয়ে নিল কার্টা। পরীক্ষা করে দেখল ফ্ল্যাশলাইটের ব্যাটারি ঠিক আছে কি না। রাফটের উপর ব্যাকপ্যাক ও বৈঠা রাখল দু'জন, তারপর লেগুনের ধারে নিয়ে গেল ভেলা। খোলা সাগর থেকে আড়ালে এই লেগুন, বিশাল সাগরের পাশে যেন সামান্য এক পচা ডোবা।

'জেলেরা বলেছে, লেগুনের দক্ষিণে থাকে দাদু এবেল।' ভেলা ভাসিয়ে দিল কার্টা। উঠে পড়ল ওরা, বৈঠার গুঁতো দিয়ে তীর থেকে গভীর পানিতে সরে গেল। আঁধার রাতে টর্চ জ্বেলে কমপাস দেখে নিল কার্টা, তারপর সব পকেটে রেখে প্রশান্ত জলে বৈঠা বাইতে লাগল।

কার্টা জানে, রন কুবলিকিকে যাই বলুক, আসলে ও স্রেফ জুয়া খেলছে। হয় বিশাল সাফল্য আসবে, নইলে পুরো সময় নষ্ট হবে। শেষেরটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। গত তিন বছর গুজব বা

অর্ধ-সত্য ওকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে নানা দিকে। অবশ্য ওর কাজই তো এ-ই। একবারের জন্যও হাতের মুঠোয় আসেনি বিজয়। একের পর এক জায়গায় খুঁজে চলেছে— একাকী, ক্লান্ত, একটু হতাশ। তবে রন কুবলিকির মত কখনও হাল ছেড়ে দেয়নি।

বৈঠা বেয়ে দক্ষিণে চলেছে ওরা। আঁধার লেগুনের ভিতর ঝপাস্ আওয়াজ তুলে ঘাই দিচ্ছে বড় মাছ। কখনও শোনা যাচ্ছে খসখস ও ঠাসঠাস আওয়াজ, ঝোপঝাড়ের ভিতর পালক ঠিক করছে পাখি। লেগুনের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছুতে দেড় ঘণ্টা লাগল। আর সব লেগুনের মতই দেখতে, সামান্য লবণাক্ত পানিতে চারপাশে শুধু নলখাগড়া। তীরের দিকে আলো ফেলল কার্টা, খুঁজতে শুরু করেছে সঠিক জায়গাটা। উদ্বেগ নিয়ে বিশ মিনিট কাটিয়ে দিল, তারপর দেখল দীর্ঘ ঘাসের মাঝে সরু ফাটল। ওখান দিয়ে লেগুনের ভিতর নেমেছে সরু ঝর্না।

নিঃশব্দে ওদিক দেখাল কার্টা।

ফাটলের দিকে রাফট নিয়ে চলল দু'জন।

এখানে জন্মেছে সাত ফুটি সব নলখাগড়া। মাথার উপর হারিয়ে গেল আকাশ ও রূপালী চাঁদ। ওরা যেন জীবন্ত কোনও সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে চলেছে। অপ্রশস্ত ঝর্নায় স্রোত নেই বললেই চলে, বেশ দ্রুতই এগুতে পারল। নলখাগড়ার ভিতর দিয়ে এক শ' গজ ভিতরে ঢুকে দেখল, সামনেই মাঝারি আকারের এক পুকুর— চারপাশে দেয়াল তৈরি করেছে ঝোপঝাড় ও নলখাগড়া। পুকুরের মাঝে ছোট্ট দ্বীপ, জোয়ারের সময় পানির সামান্য উপরে জেগে থাকে। চাঁদের আলোয় দেখা গেল ওখানে অদক্ষ হাতে গড়া কুটির, জোয়ারে ভেসে আসা কাঠ ও প্যাকিং ক্রেট দিয়ে তৈরি। দরজা নেই, বদলে ঝুলছে কাঁথা। কুটিরের সামনে ছোট্ট এক গর্ত। সেখানে নিভতে শুরু করেছে আগুন। কাঠ-কয়লার

ছাইয়ের ভিতর থেকে আসছে লালচে আলো। ডানদিকে একটা মাচা, ওখানে শুকানো হয় মাছ। পাশেই মিষ্টি পানির জন্য জং ধরা কয়েকটা ব্যারেল। দ্বীপের পাশে ভাসছে কাঠের ছোট্ট নৌকা, সরু দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। মাস্তুলে জড়িয়ে রাখা হয়েছে পাল। সমতল খোলের ভিতর রাখা পাটাতন ও হাল। সাগরে মাছ ধরবার জন্য উপযুক্ত নয় এসব নৌকা। হতাশই হলো কার্টা। ঠিকই বলেছে ব্র্যাড এন লাজরাস, দাদু এবেল বোধহয় তীর থেকে বেশি দূরে যায় না।

চারপাশ দেখে মনে হলো এই ক্যাম্প খুবই সাধারণ। কিন্তু ঝানু লোক এখানে টিকে থাকতে পারবে বহু কাল।

'এবার কী?' ফিসফিস করে জানতে চাইল কুবলিকি। সৈকতে ভিড়েছে ইনফ্লেটেবল।

চাপা হাওয়া ও ঢেউয়ের শব্দ ছাপিয়ে কুটিরের ভিতর থেকে আসছে জোরালো গর্জন। কয়েকজন নয়, মাত্র একজন লোকই, কিন্তু তুমুল ভাবে নাক ডাকছে। দরজা-কাঁথার দিকে পা বাড়াল কার্টা। তবে কয়েক পা গিয়ে সৈকতের দিকে পিঠ দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। ব্যাগ থেকে বের করে নিল ল্যাপটপ, চালু করে টাইপ শুরু করেছে। দুই সারি দাঁতের মাঝে চেপে ধরেছে নীচের ঠোঁট।

'এবার?' একটু তাগাদার সুরে বলল কুবলিকি।

'অপেক্ষা করব। উঠুক ঘুম থেকে।'

'কিন্তু ওই লোক যদি এবেল না হয়? এখানে হয়তো অন্য কেউ থাকে। জলদস্যু বা ডাকাত হলে?'

'তোমাকে তো বলেছি, আমি কপালের উপর নির্ভর করি না। আর কো-ইনসিডেন্সেও বিশ্বাস করি না। আমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে কোথায় আসতে হবে, তার মানে এখানে এই কুটিরেই থাকবে দাদু এবেল। মাঝরাতে তাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না।

সকালে ঘুম থেকে উঠুক, কথা বলব।'

কুটিরের ভিতর এখনও বাজখাঁই নাসিকা গর্জন চলছে, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল নেংটি পরা এক আফ্রিকান বুড়ো বেরিয়ে এসেছে কাঁথা সরিয়ে। সরু সরু দুই পা, পাঁজরের সবক'টা হাড় গোনা যায়। কলার বোনের নীচে বড়সড় গর্ত। চওড়া থ্যাবড়ানো নাক, খরগোশের কানের মত কানদুটো, তাতে হাড়ের দুল। শনের মত পাকা চুল নেমে এসেছে কাঁধে। চোখদুটো হলদেটে। লোকটা নাক ডেকে চলেছে, বোধহয় ঘুমের ভিতর হাঁটছে। কিন্তু খসখস করে পিঠ চুলকে নিল, থুতু ফেলল আগুনের উপর।

উঠে দাঁড়াল কার্টা, নামিবিয়ান জেলের চেয়ে কমপক্ষে এক ফুট উঁচু ও। বৃদ্ধের দেহে বোধহয় বুশম্যানদের রক্ত আছে। 'দাদু এবেল, আপনার সঙ্গে দেখা করতে অনেক দূর থেকে এসেছি। ওয়ালভিস বে-র জেলেরা বলেছে, আপনিই সবার ভিতর সবচেয়ে জ্ঞানী।'

কার্টা ধারণা করেছে জেলে ইংরেজি জানে, কিন্তু তার মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। অবশ্য নাক ডাকা থামিয়ে দিয়েছে। এতে উৎসাহী হলো কার্টা। 'আপনি কোথায় মাছ ধরেন তা জানতে এসেছি। কঠিন সব জায়গা, যেখানে জাল বা সুতো হারিয়েছেন। দাদু এবেল, এ ব্যাপারে জানতে চাইলে আপনি কি জবাব দেবেন?'

কুটিরের দিকে ফিরতি পথ ধরল বৃদ্ধ। কাঁথা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণ পর আবারও বেরিয়ে এল। এখন তার কাঁধের উপর পাতলা কাঁথা। কয়েকটি চাদর ও পাখির পালক দিয়ে তৈরি জিনিস। প্রতি পা ফেললে দুটো একটা করে পালক খসে পড়ছে। একটু দূরে সরে গেল, তারপর ছরছর করে তুমুল বেগে প্রস্রাব করল পানিতে। আরাম করে চুলকে চলেছে পেট।

ফিরে এসে আগুনের গর্তের সামনে বসে পড়ল। পিঠ দিয়েছে

কার্টা ও কুবলিকির দিকে। মেরুদণ্ডের হাড়ের সারি দেখাল কালো মুক্তার মত। নিভন্ত কয়লায় ফুঁ দিয়ে নতুন করে আগুন জ্বেলে নিতে চাইল, ঠুঁসে দিল আরও কয়েকটা ডাল। তারপর আগুন ভাল ভাবে জ্বলে উঠতেই বলল, 'এদিকের পানিতে বহু কঠিন জায়গা আছে। সেসব জায়গায় মাছ ধরা খুব শক্ত।' এত মোটা গলা, চমকে গেল কার্টা। এ যেন চড়ুইয়ের বুক থেকে বেরিয়ে আসছে সিংহের গর্জন! পিঠ ফিরিয়েই রাখল দাদু এবেল। 'প্রতিটা জায়গায় মাছ ধরেছি। বাজি ধরে বলতে পারি, আমার মত করে কেউ ধরতে পারেনি। যে সুতো হারিয়েছি, সেটা মাপলে এখান থেকে ওই কেপ ক্রস বে পেরিয়ে যেত।' ওই এলাকা এখান থেকে উত্তরে, দূরত্ব কমপক্ষে আশি মাইল। 'সেই সুতো আবার ফিরে আসত এখানে।' উদ্ধত কণ্ঠ। 'যে জাল হারিয়েছি, তাতে নামিবিয়ার মরুভূমি ঢেকে দেয়া যেত। সাগরে এমন সব ঝড় দেখেছি, অন্য কেউ হলে ভয়ে মুতে দিত। এমন সব মাছ ধরেছি, সবচেয়ে বড় জাহাজের চেয়ে ওগুলো বড় ছিল। এমন সব জিনিস দেখেছি, অন্য কেউ দেখলে ভয়ে পাগল হয়ে যেত।'

এবার দেহ ফিরিয়ে বসল বুড়ো এবেল। আগুনের কাঁপা কাঁপা লাল আলোয় চোখদুটো পিশাচের চোখের মত জ্বলজ্বল করছে। হঠাৎ হেসে ফেলল, বেরিয়ে এল পাশাপাশি তিনটে দাঁত, যেন জিপগাড়ির তিন গিয়ার। আর কোনও দাঁত নেই। নিঃশব্দে হেসে চলেছে, হাসির আওয়াজ শুরু হলো একটু পর। মাঝ পথে থেমে গেল, খকখক করে কাশতে লাগল। কাশি থামতে বলল, 'দাদু এবেল কখনও নিজের গোপন তথ্য জাহির করে না। আমি এমন সব কথা জানি, যেগুলো তোমরা জানতে চাইবে। কিন্তু কোনওদিন জানবে না। জানবে না, কারণ আমি কখনও বলব না।'

'কেন বলবেন না, দাদু এবেল, মানুষের যদি উপকার হয়?'

কার্টা বুঝেছে, এ বৃদ্ধ জটিল চিন্তা করবার মানুষ। তার পাশে বসে পড়ল ও।

'দাদু এবেল দুনিয়ার সেরা জেলে। সে কেন তোমাদের এসব জানিয়ে নিজের শত্রু তৈরি করবে?'

'আমি এদিকের পানিতে মাছ ধরতে চাই না। এসেছি একটা জাহাজ খুঁজতে। ওটা বহু বছর আগে ডুবে গেছে। আমার বন্ধু আর আমি...' রন কুবলিকির দিকে হাতের ইশারা করল কার্টা। যুবক এগুতে শুরু করেছিল, কিন্তু জেলের গায়ের ভয়াবহ দুর্গন্ধ নাকে যেতেই যেন ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। 'আমরা ওই জাহাজটা খুঁজছি, কারণ...' গল্প বানাতে শুরু করেছে কার্টা। 'কারণ এক লোক আমাদের কাজে নিয়েছে। ওই জাহাজের ভিতর তার একটা জিনিস রয়ে গেছে। খুব দামি। এখন আমরা ভাবছি, আপনি যদি আমাদেরকে সাহায্য করতেন।'

'তা হলে ওই লোক নিশ্চয়ই অনেক ধনী? আমাকে পয়সা দেবে?' দাদু এবেল জ্বলজ্বলে চাহনি নিয়ে চেয়ে রইল মেয়েটির চোখে।

'কিছু টাকা তো দেবেই।'

দাদু এবেল দুই হাত নাচাল, মনে হলো অন্ধকারে উড়ে চলেছে বাদুড়। 'কিন্তু দাদু এবেলের কখনও কোনও টাকা লাগে না।'

'সাহায্য করবার জন্যে তা হলে কী নেবেন আপনি?' হঠাৎ জানতে চাইল রন কুবলিকি।

ঘাবড়ে গেল কার্টা। বুড়ো রেগে যেতে পারে। এক পলক পর বুঝল, তা-ই হয়েছে। জ্বলন্ত চোখে কুবলিকির দিকে চাইল বৃদ্ধ।

'ছোকরা, আমি তোমাকে সাহায্য করব না।' যুবকের দিক থেকে কার্টার দিকে চাইল দাদু এবেল। 'কিন্তু তোমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করব। তুমি মেয়েমানুষ, তার উপর কখনও মাছ ধরবে

না, কাজেই আমার শত্রুও তৈরি হবে না।'

কার্টা জীবনেও দাদু এবেলকে বলবে না, সেই ছোটবেলা থেকে নদীর তীরে মানুষ হয়েছে। গ্রীষ্মের সময়ে বাবার ভাড়া দেয়া নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। তারপর যখন মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে বাবার অ্যালযেইমার্স হলো, তখন থেকে ওই ব্যবসা নিজেই চালিয়েছে। 'সত্যিই অনেক ধন্যবাদ, দাদু এবেল।' ব্যাকপ্যাক থেকে বড় মানচিত্র বের করল কার্টা, ওটা আগুনের পাশে মাটির উপর বিছিয়ে দিল। একটু এগিয়ে এল কুবলিকি, ফ্ল্যাশলাইটের রশ্মি ফেলল মানচিত্রের উপর। দেখা গেল নামিবিয়ার উপকূল। তীর থেকে একটু দূরে আঁকা হয়েছে অন্তত বারোটা নক্ষত্র। বেশির ভাগ ওয়ালভিস বে-র আশপাশের। অন্যগুলো তীর থেকে বেশ দূরে।

'বেশ কয়েকজন জেলের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা জানিয়েছে কোথায় কোথায় সুতো ও জাল হারিয়েছে। ধারণা করছি এসব জায়গায় থাকবে ডুবে যাওয়া জাহাজ। এবার এটা দেখে বলুন কোনও জায়গা বাদ পড়ল কি না।'

চার্টের দিকে চেয়ে রইল দাদু এবেল, একটা একটা করে নক্ষত্র দেখছে। তারপর আঙুল সরতে লাগল উপকূল ভাগ থেকে। কয়েক মুহূর্ত পর মুখ তুলে চাইল।

মানুষটার চোখের তারায় উন্মাদনা, ভাবল কার্টা।

'আমি তো এই এলাকা চিনিই না,' বলল দাদু এবেল।

স্যাণ্ডউইচ বে-র উপর আঙুল রাখল কার্টা। 'এই যে, আমরা এখানে আছি।' এবার আরেক দিক দেখাল। 'আর এই যে কেপ ক্রস।'

'বুঝলাম না,' মাথা নাড়ল দাদু এবেল। আঙুল তাক করল উত্তর দিকে। 'কেপ ক্রস ওদিকে। ওটা আবার কী করে এখানে আসে, মেয়ে?'

কার্টা বুঝল, দাদু এবেল সারাজীবন সাগরে কাটিয়েছে বটে, কিন্তু জীবনে দেখেনি নটিক্যাল চার্ট। মনে মনে নিজের মাথায় চাপড় দিল কার্টা।

পরবর্তী দু' ঘণ্টা বুড়ো জেলের কাছ থেকে জানল, মানুষটা কোথায় কোথায় সুতো বা জাল হারিয়েছে। সাগরের নীচে উপকূল থেকে এক শ' মাইল দূরেও রয়েছে মরুভূমির বালি, ওখানে থাকতেই পারে পাথর ও নিমজ্জিত জাহাজ। এসবই ছিঁড়ে দিতে পারে জাল ও সুতো। দাদু এবেল জানাল, স্যাণ্ডউইচ বে থেকে দুই দিনের পথ দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে একটা জায়গা। বা পাঁচ দিন উত্তর-পশ্চিমে মিলবে আরেকটা খারাপ জায়গা। প্রতিটি এলাকার বর্ণনা দিল বুড়ো, আর সে অনুযায়ী মানচিত্রের নক্ষত্র দেখে নিল কার্টা। ব্যবসায়ী-জেলে বা ওয়ালভিসের ক্যাপ্টেনদের কাছ থেকে আগেই যেসব জেনেছে, সেগুলো নতুন করে টুকল না।

দাদু এবেলের কথা অনুযায়ী, মাত্র একটি জায়গা পাওয়া গেল। ওটার কথা আগে কেউ বলেনি। অন্যান্য চিহ্ন থেকে কমপক্ষে সত্তর মাইল দূরে। দাদু এবেল জানাল, সাগরের ওদিকে মাছ নেই বললেই চলে। কোর্স থেকে সরে যেতে হয়েছিল, ওখানে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় পাগলা হাওয়া।

চার্টে নক্ষত্র এঁকে নিল কার্টা, দেখল ওদিকের সাগর দেড় শ' ফুট গভীর। ওর যা সংক্ষিপ্ত বিদ্যা, দেড় শ' ফুট নীচে স্কুবা ডাইভ করতে হলে ঝুঁকি নিতে হবে। অবশ্য ভয় পাবে না। সমস্যা অন্যখানে, খুব পরিষ্কার পানিতেও অত গভীরে কিছুই বোঝা যায় না। হয়তো বুঝবেই না একটু দূরেই ডুবে যাওয়া জাহাজ পড়ে আছে। হেলিকপ্টারে করে ওই এলাকার উপর চক্কর কেটেও খুব একটা সুবিধা হবে না।

চোখে কল্পনা এঁকে ভবিষ্যৎ দেখছে ও। নিষেধ করল দাদু এবেল, 'ভুলেও ওখানে যেয়ো না।'

বৃদ্ধের উপর মনোযোগ ফিরিয়ে আনল কার্টা। 'কেন, দাদু এবেল?'

'ওই সাগরে আছে ধাতুর তৈরি বিশাল সাপ। আমার মনে হয় ওগুলো তৈরি করেছে কোনও দুষ্ট জাদুকর।'

'ধাতব সাপ?' নাক কুঁচকে ফেলল রন কুবলিকি।

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল বৃদ্ধ জেলে, আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল চেহারা। 'তুমি দাদু এবেলকে মিথ্যুক ভাবছ?' বজ্রের মত গর্জে উঠল। একগাদা ছিটানো থুতু গিয়ে পড়ল রন কুবলিকির মুখের উপর। 'ওরকম বারোটার বেশি সাপ আছে। কয়েক শ' ফুট লম্বা, পানির ভিতর শরীর মুচড়ে চলেছে। তারই একটা আরেকটু হলে আমার নৌকা ডুবিয়ে দিত। হাঁ করে গিলে নিত নৌকা, কিন্তু শেষ সময়ে দুনিয়ার সর্বকালের সেরা নাবিক নিজের জান বাঁচাতে পেরেছে। যদি দেখতে ওই সাপ, তুমি মুতে দিতে, শিশু বাচ্চার মত ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদতে।' পাগলাটে দৃষ্টি ফেলল সে মেয়েটির চোখে। 'পরে আবার বোলো না দাদু এবেল তোমাদেরকে সাবধান করেনি। যাও তা হলে ওখানে, তোমাদেরকে গিলে ফেলবে ওগুলো। এবার বিদায় হও এখান থেকে!' ছোট্ট আগুন ও ধোঁয়ার সামনে বসল সে, দুলে দুলে দুলতে লাগল। কোন্ এক অচেনা ভাষায় বিড়বিড় করে কীসব বলছে।

বৃদ্ধকে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়ল কার্টা, কিন্তু জবাবে কিছু বলল না জেলে। ইনফ্লেটেবল বোটের কাছে ফিরল কার্টা ও কুবলিকি, ফিরতি পথে রওনা হলো। পিছনে পড়ে গেল জেলের খুদে আস্তানা। নলখাগড়ার ভিতর দিয়ে আবারও মূল লেগুনে বেরিয়ে এল ওরা। বড় করে দম ফেলল কুবলিকি। 'ব্যাটা আস্ত পাগল! ...ধাতব সাপ? ...শুনলে হাসবে লোকে!'

'দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ, হোরেশিয়ো, দ্যান আর ড্রেম্ট্ অভ ইন ইয়োর ফিলোসফিয।'

'কী বলতে চাইছেন?'

'হ্যামলেটের ছত্র, তাতে বলা হয়েছে, আমরা যতটা কল্পনা করি, তার চেয়ে অনেক বিস্ময়কর এই দুনিয়া।'

'আপনি নিশ্চয়ই ওই পাগলের কথায় কান দেবেন না?'

'ধাতব সাপের ব্যাপারে? না, বিশ্বাস করিনি। তবে নিশ্চয়ই ওখানে কিছু দেখেছে ও, নইলে এত ভয় পেত না।'

'আমার ধারণা, ওটা কোনও সাবমেরিন। হয়তো দক্ষিণ আফ্রিকান নেভি এদিকের সাগরে টহল দিয়েছে।'

'হতে পারে।' কয়েক মুহূর্ত পর বলল কার্টা, 'আমাদের হাতে এখন অনেক কাজ। অন্তত চোদ্দোটা জায়গায় যেতে হবে। ধাতব সাপ বা সাবমেরিন নিয়ে ভাবার সময় আছে? আজ বিকেলে লাজরাসের সঙ্গে কথা বলব। ঠিক করে নিতে হবে কোন্ পথে এগুব আমরা।'

সূর্য উঠবার একটু আগে বিলাসবহুল সোয়াকোপ্‌মুণ্ড হোটেলে পৌঁছুল ওরা। নিজের রুমে ফিরে দীর্ঘ শাওয়ার নিল কার্টা, দেহ থেকে বিদায় করল কচকচে বালির কণা ও সামুদ্রিক লবণের আঁশটে গন্ধ। স্নান শেষে তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছে উঠল আরামদায়ক বিছানায়। চাদর টেনে নিল বুক পর্যন্ত। কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়ল। ওর স্বপ্নে হাজির হলো সাগরের বিশাল সব সাপ, একটা আরেকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

পাঁচ

জাহাজের সুপারস্ট্রাকচারের পিছনে বেশ নীচে গ্যারাজ, সেদিকে ছুটে চলেছে রানা। কমিউনিকেশন ইউনিট থেকে শুনছে ড্যামেজ রিপোর্ট। খালি করা হয়েছে বিলজ। এরপরও ভেসে ওঠেনি মার্ভেল। অবশ্য নদীর তলার থকথকে কাদা আটকে রাখতে পারবে না জাহাজকে। কিলের দরজার কারণে চিন্তিত হয়ে পড়েছে রানা। জাহাজের নীচে রয়েছে প্রকাণ্ড দুটো কবাট, বাইরের দিকে খোলে, তৈরি হয় মুন পুল। ওখান দিয়ে সাগরে বেরোয় মার্ভেলের সাবমারসিবল দুটো। সেগুলোর একটি পানির এক হাজার ফুট নীচে নামতে পারে, সামনে রয়েছে ম্যানিপুলেটার বাহু, যে-কোনও জিনিস শক্ত করে ধরতেও পারে। দ্বিতীয় সাব-মারসিবলটি অগভীর পানিতে কাজ করে।

রানা জানতে চাওয়ায় মুন পুল থেকে ডিউটিরত টেকনিশিয়ান জানিয়ে দিল, কবাট দুটো ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। নিরাপদে ক্রেডলে ঝুলছে সাবমারসিবল দুটো।

এক মিনিট পেরুনোর আগেই বোট গ্যারাজে পৌঁছে গেল রানা। প্রকাণ্ড গুহার মত কামরায় জ্বলছে ব্যাটল ল্যাম্প, চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে রক্তিম আলো। বাতাসে ভাসছে নোনা পানি ও গ্যাসোলিনের গন্ধ। মার্ভেলের পিছনে, এক পাশে রয়েছে বড়সড় দরজা, আপাতত বন্ধ। ক্রুরা দ্রুত হাতে গুছিয়ে দিচ্ছে কালো

যোডিয়াক ইনফ্লেটেবল। ওটার ট্র্যানসমে প্রকাণ্ড এক আউটবোর্ড ইঞ্জিন, চল্লিশ নটের বেশি গতি তুলতে পারে। রয়েছে ছোট একটি ইলেকট্রিক মোটর, ওটা নিঃশব্দে ঠেলে নিয়ে যায় রাফট। এ ছাড়া গ্যারাজে রয়েছে গভীর খোলওয়ালা সিল অ্যাসল্ট বোট, প্রচণ্ড গতি তুলতে সক্ষম। ওটাতে বসতে পারে দশজন সশস্ত্র যোদ্ধা।

দশ সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল নিশাত ও জলিল। জঙ্গলের ধারে, ডকে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ হেলম্‌স্‌ম্যানের ভঙ্গি করেছে কমাণ্ডো, আর ক্যাপ্টেনের নিখুঁত অভিনয় করেছে নিশাত। এখন ওদের পরনে কালো কমব্যাট ফেটিগ, বেল্ট থেকে ঝুলছে অ্যামিউনিশন পাউচ, ছোরা এবং অন্যান্য গিয়ার। ওদের সঙ্গে রয়েছে এম-৪এ১ অ্যাসল্ট কারবাইন। অস্ত্রটি এম-১৬-এর আধুনিক সংস্করণ। আজকাল আমেরিকান স্পেশাল ফোর্স ওটাই ব্যবহার করছে।

'কী কাজে চলেছি, স্যর?' জানতে চাইল নিশাত।

'আপনি তো জানেন আটকা পড়েছে মার্ভেল। বর্ষা মৌসুম আসতে বহু দেরি, তার আগে ছাড়া পাবে না। কিন্তু আমাদের হাতে সময় মোটেই নেই। ...নিশ্চয়ই মনে পড়ে কয়েক মাইল আগে একটা বাঁধ ফেলে এসেছি?'

'মাসুদ ভাই, আপনি চান আমরা বাঁধ উড়িয়ে দেব?' অবিশ্বাস নিয়ে বলল জলিল।

'না, তা চাই না। তোমরা বাঁধে উঠবে, খুলে দেবে ফ্লাডগেটগুলো। মনে করি না ওখানে গার্ড আছে। যদি থেকেও থাকে, কাউকে গুরুতর আহত করবে না।' নিশাত ও জলিল মাথা দোলাল। এবার বলল রানা, 'ফ্লাডগেট খুলে গেলে হুড়মুড় করে চলে আসবে পানি। একবার মার্ভেলকে ভাসিয়ে তুললেই এগুতে পারব। ফলে তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। তোমরা উপকূলে বোমা শহরে চলে আসবে। ওখান থেকেই তোমাদেরকে

পিক করব।'

'ভাল প্ল্যান,' বলল নিশাত।

রানা জানে, শত বাধা এলেও পিছাবে না দুজনের কেউই।

সুইচ টিপে ওয়াল মাইক চালু করল রানা। 'নবী, কখন গ্যারাজের দরজা খোলা যাবে, জানাও। আপা আর জলিল যোডিয়াক নিয়ে নদীতে নামবে। ...প্যাট্রল বোটগুলো কোথায়?'

'দূরে ভাসছে একটা, মনে হয় আরও মর্টার ফেলবে। অন্যটা এইমাত্র আমাদের স্টার্ন পেরুল। চলে আসছে পোর্ট সাইডে।'

'তীর থেকে কোনও হামলা আসতে পারে?'

'ইনফ্রারেড বলছে আশপাশে কেউ নেই। তবে যে-কোনও সময়ে চলে আসতে পারে কর্নেল মাধানা।'

'ঠিক আছে, নবী।' মার্ভেলের ক্রুদের দিকে চেয়ে ইশারা করল রানা। প্রায় নিঃশব্দে উপরের দিকে উঠে গেল গ্যারাজের দরজা। জাহাজের ভিতর ঝাঁপিয়ে এল জঙ্গলের পচে যাওয়া গাছ ও ঝোপঝাড়ের বদ গন্ধ, সঙ্গে হাজির হয়েছে বাইরের প্রচণ্ড গরম। বাতাস এতই ভেজা, ওদের মনে হলো দম আটকে পানির নীচে সাঁতরে চলেছে। জাহাজ ঘিরে তৈরি করা হয়েছে ধোঁয়ার স্ক্রিন, তা থেকে আসছে কেমিক্যালের কড়া ঘ্রাণ। নদীর তীর কুচকুচে কালো, প্রকাণ্ড সব গাছ মিলে তৈরি করেছে ঘন অরণ্য। নবী বলেছে আপাতত দু' তীরে কেউ নেই, কিন্তু রানার অন্তর বলছে, অসংখ্য সৈনিক নিয়ে ছুটে আসছে মাধানা।

কাদার ভিতর মার্ভেল আটকা পড়ায় অনেক উঁচুতে রয়েছে ওটার ডেক। নদী থেকে পাঁচ ফুট উপরে বোট গ্যারাজের লঞ্চ র‍্যাম্প। পিছন থেকে ইনফ্লেটেবল বোটে ধাক্কা দিল নিশাত ও জলিল। পিছলা র‍্যাম্প বেয়ে নেমে গেল কালো বোট, ঝপাস্ করে গিয়ে পড়ল নদীতে। এবার স্রোতে ভাসতে ভাসতে হারিয়ে যাবে। দেরি না করে ডাইভ দিল নিশাত ও জলিল, পাঁচ সেকেণ্ড পর

ভেসে উঠল ইনফ্লেটেবল বোটের পাশে। ওটার নরম দেহ খপ্ করে ধরল, তারপর গড়িয়ে উঠে গেল উপরে। অস্ত্রগুলো ঠিক ভাবে রাখবার কাজে ব্যস্ত জলিল, ওদিকে ইলেকট্রিক মোটর চালু করেছে নিশাত। ঘুটঘুটে আঁধারে মন্থর গতি তুলে রওনা হলো যোডিয়াক, সহজে কারও চোখে পড়বে না।

আকাশ থেকে বোমার মত নামছে পানির গোলা, নিশাতকে এঁকেবেঁকে এগুতে হলো। মার্ভেলের ওয়াটার ক্যানন দূরে সরিয়ে রেখেছে দুই কপ্টারকে। দূরে মৌমাছির মত গুঞ্জন তুলছে যান্ত্রিক ফড়িংদুটো, তবে তাদের অনেক সরে থাকতে হচ্ছে। এগুতে গিয়ে দুই পাইলট বুঝেছে, পানির ভয়ঙ্কর গোলা লাগলে বিধ্বস্ত হবে কপ্টার।

আকাশযানের ভিতর কী পরিস্থিতি, বুঝতে পারছে নিশাত। অয়েল কোম্পানির পাইলটদেরকে হুমকির পর হুমকি দিয়ে চলেছে গাধাধারের সৈনিকরা। তবে এটাও জানে, জল-কামানের পানি সরাসরি লাগলে থেমে যাবে কপ্টারের টারবাইন, ফলে অনেক উপর থেকে ছিটকে পড়বে নীচের নদীতে। ফলাফল: আকস্মিক মৃত্যু!

ধূম্রজাল থেকে বেরিয়ে এসেছে নিশাত ও জলিল, চারপাশ দেখে নিল। অনেক দূরে দুই প্যাট্রল বোট। নিশ্চিন্ত হয়ে আউটবোর্ড ইঞ্জিন চালু করল নিশাত। চার স্ট্রোকের ইঞ্জিন ভাল ভাবে মাফ্‌ল্‌ড্ করা, তারপরও নিচু গম্ভীর আওয়াজ ছাড়ছে। পানির উপর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভেসে গেল আওয়াজটা। তীব্র গতি তুলে হরিণীর মত ছুটছে ওয়াটার ক্রাফট।

চল্লিশ নট গতিবেগে কোনও কথা বলা অসম্ভব। কাজেই যে যার চিন্তা নিজ মনেই রাখল। শিরার ভিতর দৌড়াচ্ছে অ্যাড্রেনালিন। যে-কোনও বিপদের জন্য তৈরি। উজানের দিকে চলেছে যোডিয়াক। ওরা শুনতে পেল না উঁচু, তীক্ষ্ণ আওয়াজটা।

জানেই না সামনে থেকে ছুটে আসছে বড়সড় একটা বোট। তীর ঘেঁষা এক ছোট দ্বীপের পাশ থেকে বেরুল ওটা।

মনে হলো বুঝি দুই জলযানের ভিতর মুখোমুখি সংঘর্ষ হবে। তীরের মত ডানদিকে বাঁক নিল নিশাত, পলকের জন্য দেখল ভীত-বিস্মিত একটা চেহারা— কর্নেল আদি মাধাভ মাধানা! মুহূর্তের জন্য নিশাতকে দেখতে পেয়েছে সে, চিনেও ফেলেছে!

পুরো থ্রটল খুলে দিল নিশাত, মনে মনে বলল, ছোট্, বাবা, জলদি ভাগি!

ততক্ষণে ঘুরতে শুরু করেছে কর্নেলের বোট, ধাওয়া করবে ইনফ্লেটেবলকে। লোকটার বোট একদম নতুন ও চুরুট আকৃতির, দীর্ঘ। প্রচণ্ড গতি তুলবার জন্য নিচু করে তৈরি খোল, রয়েছে শক্তিশালী দুটি আউটবোর্ড ইঞ্জিন। মাধানা ছাড়াও বোটে রয়েছে চারজন লোক, হাতে একে-৪৭ রাইফেল।

'আপনি ওকে চেনেন, আপা?' গলা ফাটিয়ে জানতে চাইল জলিল।

'হ্যাঁ। জেনারেল টমাস গাধাধারের ডানহাত, কর্নেল মাধানা!'

ঘুরেই তেড়ে এল বোট। যোডিয়াকের সঙ্গে তফাত কমিয়ে আনছে। দূরে দেখা গেল, বোটের স্টার্নে মোরগের লেজের মত পানির ধারা তৈরি হয়েছে।

'জলিল, যদি ব্যাটার সঙ্গে রেডিও থাকে, আমাদের খেলা শেষ।'

'হায় আল্লা, আমি এ কথা ভাবিইনি। আমরা এখন কী করব, আপা?'

'ওরা আসুক,' খপ্ করে রাইফেল তুলে নিল নিশাত, বাড়িয়ে দিল জলিলের দিকে। 'ওদের চোখের সাদা অংশ না দেখা পর্যন্ত গুলি করবে না।'

'ততক্ষণে আমরা মরে ভূত, আপা। রেঞ্জে এলেই গুলি

করব।'

'ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে এক মিনিট অপেক্ষা করো।' থ্রটল নিউট্রাল করল নিশাত। তীক্ষ্ণ বাঁক নিতে শুরু করেছে। রাফটের খোল একেবারেই সমতল, মাটির পাতিলের ভাঙা টুকরো যেভাবে পানির উপর দিয়ে ছিটকে যায়, তেমনি করে ছুটে চলেছে। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে হঠাৎ করেই থেমে গেল, নিজের তৈরি ঢেউয়ের ভিতর দুলতে লাগল। এবার যথেষ্ট ভারসাম্য পাবে, কাঁধে অস্ত্র তুলে তৈরি হয়ে গেল নিশাত ও জলিল।

কমপক্ষে পঞ্চাশ মাইল গতি তুলে আসছে মাধানার বোট। দু' শ' গজ দূরে থাকতে গুলি শুরু করল নিশাত ও জলিল। বদলে বোট থেকে দেখা গেল লাল আগুনের ঝলকানি। পাল্টা জবাব দিচ্ছে একে-৪৭। তবে অনেক বেশি গতি নিয়ে আসছে বোট, ওখান থেকে লক্ষ্যভেদ প্রায় অসম্ভব। যোডিয়াক থেকে অনেক বামে ও দূরে গিয়ে পানিতে পড়ছে বুলেট। মাধানার লোকের মত সমস্যা নিশাত ও জলিলের নেই। দ্রুত কাছিয়ে আসছে বোট, ফলে ওদের লক্ষ্যভেদ আগের চেয়ে ভাল হচ্ছে।

তিন রাউণ্ডের গুলিবর্ষণ করল নিশাত, গুঁড়িয়ে দিল বোটের খুদে উইণ্ডস্ক্রিন। একটা গুলি খুবলে নিল বো-র ফাইবারগ্লাস। ড্রাইভারের উপর মনোযোগ দিয়েছে জলিল, খুব শান্ত ভঙ্গিতে সাবধানে একটা একটা করে গুলি করছে। চতুর্থ গুলিতে লোকটা কাত হয়ে পড়ে গেল ডেকে। কেউ হুইল না ধরায় বাঁক নিয়ে অন্যদিকে রওনা হলো বোট। অবশ্য অন্য এক লোক এসে ধরল হুইল। বাকি তিনজন ম্যাগাযিনের পর ম্যাগাযিন খালি করছে। জলিল ও নিশাতের খুব কাছ দিয়ে গেল এক পশলা গুলি। গায়ে লাগল তপ্ত হলকা। কেউ ওরা বসে পড়ল না, বা চোখের পাতাও ফেলল না। অগ্রসরমান বোটের দিকে হিসাব কষে গুলি করছে ওরা। একজন একজন করে কমছে শত্রু। পরবর্তী ষোলো

সেকেণ্ডে হুইলের পিছনে রইল মাত্র একজন, গুটিসুটি মেরে বসে আছে। দীর্ঘ বো-র কারণে তাকে দেখা যাচ্ছে না।

একই সঙ্গে গুলি করছে নিশাত ও জলিল। হাতের ইশারা করল নিশাত, গুলি করতে থাকুক জলিল। নিজে ও চলে এল ইঞ্জিনের কাছে। শত্রুর বোট মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। সরাসরি যোডিয়াকের দিকেই আসছে। যেন ক্ষিপ্ত হাঙর, ছিঁড়েখুঁড়ে দেবে অসহায় শিকারকে। ওটার ড্রাইভার চাইছে ইনফ্লেটেবলের উপর চড়িয়ে দেবে বোট। লোকটাকে কাছে আসতে দিল নিশাত।

আর মাত্র বিশ ফুট দূরে স্পিডবোট!

এবার থ্রটল খুলে দিল নিশাত, স্পিডবোটের উঁচু বো-র নীচ থেকে সরে যেতে লাগল। আগেই গ্রেনেড বের করেছে জলিল, দু' সেকেণ্ড আগে খুলে ফেলেছে স্পুন, তুলে নিয়েছে পিনও। এবার গ্রেনেড ফেলে দিল ককপিটের ভিতর। পাশ দিয়ে তীরের মত বেরুল বোট। এক এক করে আঙুল গুনতে শুরু করেছে জলিল। ঝপ্ করে বসে পড়ল ওরা। শেষ আঙুল খুলতেই ফাটল গ্রেনেড, পরক্ষণে দেখা গেল স্পিডবোটের ফিউয়েল ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হয়েছে। চারপাশে ছিটকে উঠল কমলা আগুনের শিখা। বোটের খোল চরকির মত পানির উপর দিয়ে আরেক দিকে চলেছে। জ্বলন্ত গ্যাসোলিনের সঙ্গে বৃষ্টির মত নেমে আসছে ফাইবারগ্লাসের অজস্র টুকরো ও ক্রুদের দেহাবশিষ্ট।

'ঠিক জায়গায় ফেলেছ,' সন্তুষ্ট স্বরে বলল নিশাত।

'আপনার দোয়া, আপা।' খুশি হয়ে হাসল জলিল।

পাঁচ মিনিট পর ইনগা ড্যামের কাঠের জেটিতে ভিড়ল যোডিয়াক। মুখ তুলে উঁচু বাঁধের দিকে চাইল ওরা। বিশাল আকৃতির বাঁধ, ফেরো-কংক্রিট ও রড দিয়ে তৈরি। নদীর উজানে আটকে রেখেছে বিপুল পরিমাণের পানি। দিনের বেলায় প্রকাণ্ড ওই রিযারভয়েরের হাইড্রো-ড্যাম থেকে মেলে প্রচুর

ইলেকট্রিসিটি। প্রাক্তন কাটাঙ্গা প্রভিন্সের সাবা'র খনিগুলো তাতেই চলে। আপাতত গাই-গরুর প্রস্রাবের মত সামান্য পানি বেরুচ্ছে ফ্লাডগেট দিয়ে। নদী থেকে টেনে হিঁচড়ে যোডিয়াক তুলল ওরা, শক্ত করে বাঁধল এক গাছের সঙ্গে। কে জানে, কত উঁচু হয়ে ছুটে আসবে প্লাবন!

বাঁধের বুকে রয়েছে সিঁড়ি, অনেক উপরে উঠতে হবে; যে যার অস্ত্র কাঁধে ঝুলিয়ে নিল নিশাত-জলিল, তারপর দৌড়ে উঠতে শুরু করল।

ওরা মাত্র সিঁড়ির আধাআধি উঠেছে, এমন সময় নীচ থেকে শুরু হলো প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ। মুহূর্তে ছিঁড়েখুঁড়ে গেল নীরবতা। ওদের চারপাশে এসে ছিটকে লাগছে শ্র্যাপনেল ও ভাঙা কংক্রিট। সিঁড়ির মাঝে একদম খোলা জায়গায় আটকা পড়েছে ওরা। দেরি না করে ধাপের উপর শুয়ে পড়ল, পাল্টা জবাব দিল রাইফেল কাঁধে তুলে। বহু নীচে জেটিতে এসে ভিড়েছে স্থানীয় দুটো ডিঙি নৌকা। ডক থেকে আসছে অজস্র গুলি। ওই দলের ক'জন দৌড়ে উঠে আসছে বাঁধের সিঁড়ি বেয়ে।

'এখন বুঝলাম মাধানার সঙ্গে রেডিও ছিল,' তিক্ত স্বরে বলল জলিল। কাঁধ থেকে এম-৪ নামিয়ে পাশে রাখল, ওটার গুলি শেষ। হোলস্টার থেকে বের করে নিল গ্লক পিস্তল। নতুন উদ্যম নিয়ে নীচের সিঁড়ির দিকে গুলি শুরু করল। পাশেই নিশাত, ডক লক্ষ্য করে অ্যাসল্ট রাইফেলের ৫.৫৬ এমএম রাউণ্ড ছুঁড়ছে।

প্রায় দৌড়ের ভঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে তিনজন লোক। খেঁকিয়ে উঠল জলিলের পিস্তল। বুকে দুটো গুলি নিয়ে পড়ে গেল প্রথম লোকটা। রক্তাক্ত লাশ ওখানেই থামল না, জড়িয়ে পেঁচিয়ে সবাইকে নিয়ে নেমে গেল নীচে। পিস্তল রেখে এম-৪-এর ম্যাগাযিন বদলে নিল জলিল। তত্ক্ষণে ডক থেকে গুলি আসা প্রায় থেমে গেছে। একটি মাত্র একে-৪৭ এখনও

জবাব দিচ্ছে। তারপর সেটাও থেমে গেল। নিশাতের এক পশলা গুলি ডক থেকে ছিটকে নদীতে ফেলল লোকটাকে। জোরালো স্রোত টেনে নিল মৃতদেহকে, তবে কয়েক ফুট গিয়েই ডুবে গেল ওটা।

নিশাত ও জলিল থমকে গেছে। বাঁধের উপর থেকে ভেসে আসছে কান ফাটানো ঘণ্টি, সবাইকে সতর্ক করা হচ্ছে।

'জলদি চলো!' তাড়া দিল নিশাত। এক শ' মিটার স্প্রিন্টের ভঙ্গিতে ছুটতে শুরু করেছে ওরা। একেকবারে দুই থেকে তিন ধাপ টপকে উঠছে।

দেখতে না দেখতে বাঁধের উপর পৌঁছে গেল। ওপাশে রয়েছে প্রকাণ্ড রিযারভয়ের। একপাশে চৌকো আকৃতির দালান। ওটার জানালা থেকে আসছে উজ্জ্বল আলো।

'কন্ট্রোল রুম, আপা?' বলল জলিল।

'তাই তো মনে হয়, জলিল,' থুতনির পাশে থ্রোট মাইক নিল নিশাত, বলে উঠল, 'স্যর, আমি নিশাত। আমরা বাঁধের উপর। কন্ট্রোল সেন্টারের দিকে চলেছি।' বাড়তি কিছু বলবার দরকার নেই, আওয়াজ শুনেই মাসুদ স্যর বুঝবে ওদের বিনা অনুমতির প্রবেশ ধরা পড়েছে।

'গুড, আপা। গেটগুলো খোলার ব্যবস্থা করুন।'

'ঠিক আছে।'

কুঁজো হয়ে ছুটতে শুরু করেছে ওরা। নক্ষত্র জ্বলা আকাশের পটভূমিতে ওদেরকে চট করে কেউ দেখবে না। বাঁধের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। বামদিকে ছড়িয়ে রয়েছে বিশাল রিযারভয়ের। অতি শান্ত লেক, চকচক করছে চাঁদের আলো পড়ে। ডানে এক শ' ফুট নীচে বোল্ডারে ছাওয়া জমিন। ওখান থেকেই উঠে এসেছে প্রকাণ্ড বাঁধ।

চৌকো সাদা দালানের সামনে পৌঁছে গেল ওরা। বাড়িতে

একটি মাত্র দরজা, দু' দিকে দুটো জানালা। দালানের পিছনে, বাঁধের নীচের দিকে দীর্ঘ এক দালান, ওখানে টারবাইনকে পানি ভাগ করে দেয় স্লুইস গেট ও পেনস্টক। আপাতত কয়েকটি চ্যানেলে ছুটছে পানি, ওই কারেন্টের কারণে তৈরি হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি, সেটা দেয়া হচ্ছে মাবাতি শহরকে।

চৌকো দালানের দরজার সামনে থামল নিশাত। পাশেই জলিল, বাগিয়ে ধরেছে পিস্তল। নব ধরে মোচড় দিল নিশাত, কিন্তু ওটা খুলল না। তালার ফুটোর দিকে ইশারা করল জলিল, ভাব দেখে মনে হলো ওর কাছে চাবি আছে। নিশাতের দিকে চেয়ে বার কয়েক ভুরু নাচাল। আতাসি ও রানার কাছ থেকে তালা খুলবার সব কৌশলই শিখেছে ওরা। কিন্তু সে সব যন্ত্র সঙ্গে আনেনি।

চোখ পাকিয়ে জলিলের দিকে চাইল নিশাত। নিজেও আনেনি পিকলক। বেল্টে হাত চলে গেল ওর, পাউচ থেকে বের করে নিল সামান্য সেমটেক্স প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। দরজার হাতলে পেঁচিয়ে দিল প্লাস্টিক, তার ভিতর গেঁথে দিল ইলেকট্রনিক ডেটোনেটার।

একটু দূরে গিয়ে থামল ওরা। ডেটোনেট করবে, তার আগেই ব্লক-হাউসের কোনা ঘুরে বেরুল এক প্রহরী। লোকটার পরনে কালো ইউনিফর্ম, ডানহাতে পিস্তল, বামহাতে ফ্ল্যাশলাইট। অভ্যাস বসে তার বুকে পিস্তল তাক করল জলিল, ট্রিগারে চেপে বসছে তর্জনী। তবে শেষ মুহূর্তে নিশানা বদলে নিল, গুলি করল প্রহরীর পিস্তলে। ঝটাং করে ছিটকে বেরিয়ে গেল অস্ত্রটা। শিয়ালের ডাকের মত চিৎকার শুরু করেছে লোকটা। ধপ্ করে বসে পড়েই বামহাতে চেপে ধরেছে ডান পাঞ্জা। কয়েক পা গিয়ে তার সামনে থামল জলিল, আগেই বের করে ফেলেছে ফ্লেক্স কাফ, দেরি না করে প্রহরীর দুই হাত আটকে দিল। চট্ করে দেখে নিল সে কতটা আহত। প্রায় কিছুই হয়নি, শুধু মচকে গেছে

কব্জি। লোকটার দুই গোড়ালি শক্ত করে বেঁধে দিল জলিল, মুখে গুঁজে দিল রুমাল। চিত করে শুইয়ে দিল তাকে। চোখ বড় বড় করে ওর দিকে চেয়ে রইল লোকটা। কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এল, 'কঁকঁক্!'

'কিছু মনে নিয়ো না, সোনাভাই মোরগ,' কানের কাছে বলেই নিশাতের পাশে ফিরল জলিল।

এবার চার্জ ফাটিয়ে দিল নিশাত। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে বেরিয়ে গেল হাতল। দেরি না করে এক লাথিতে দরজা খুলল নিশাত, এম-৪ হাতে সামনের দিক কাভার করল। প্রায় দৌড়ে ঢুকে পড়ল ওরা ঘরে।

কন্ট্রোল রুমে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। এক দেয়াল জুড়ে অসংখ্য ডায়াল ও লিভার, পাশের দেয়ালে তাক ভরা প্রাচীন কমপিউটার। নিশাত ও জলিল অস্ত্র হাতে ঢুকতেই চমকে গেছে রাতের তিন অপারেটার। মুখ শুকিয়ে গেল তাদের।

'সোজা মেঝেতে শুয়ে পড়ো!' হুমকির সুরে বলল নিশাত। 'মেঝেতে! জলদি!'

লোকগুলো বোধহয় ইংরেজি জানে না।

তারপর একজন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, মাথার উপর তুলে ধরেছে হাত। ধুলোভরা মেঝের উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। ভীষণ ভয়ে বিস্ফারিত চোখ।

তাকে অনুকরণ করল অন্য দু'জন।

'যা বলব, ঠিক ভাবে মানলে আপনারা মরবেন না,' বলল জলিল। বুঝতে পারছে, আতঙ্কিত লোকগুলোর কাছে কেমন লাগছে ওর কথা।

দালান বলতে বড় এই ঘর, কবুতরের খুপরির মত টয়লেট ও একটি কনফারেন্স রুম। টয়লেটে তিন ইঞ্চি লম্বা একদল তেলাপোকার রাজত্ব। এক চক্কর চারপাশ ঘুরে এল নিশাত।

তিন অপারেটারকে বসিয়ে তাদের হাত কোমরের পিছনে নিয়ে গেল জলিল, আটকে দিল হাতকড়া।

'আমাদেরকে মেরে ফেলবেন?' করুণ স্বরে জানতে চাইল একজন। পরনে তার নীল জাম্পসুট, ইংরেজি সে-ই বলছে। বুকের আইডি কার্ডে লেখা: অদ্রে মাকাবো। টেকনিশিয়ান, ইনগা ড্যাম।

'মাকাবো, আগেই বলেছি, আমরা আপনাদের ক্ষতি করব না। তবে আপনাদেরকে বলতে হবে কীভাবে খোলা যায় ইমার্জেন্সি ফ্লাডগেটগুলো।'

'আপনারা রিযারভয়ের খালি করে দেবেন?'

এক পাশে টেবিলের উপর বেশ কয়েকটা টেলিফোন। একটা ছাড়া অন্যগুলোর লিস্ট কল জ্বলজ্বল করছে। 'আপনারা এরই ভিতর উর্ধ্বতন কমকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন,' বলল নিশাত। 'নিশ্চয়ই লোক পাঠাবে তারা। আমরা মাত্র এক ঘণ্টার জন্য গেট খুলে দেব। ...এবার দেখান কীভাবে অপারেট করতে হয়।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল অদ্রে মাকাবো। জলিল হোলস্টার থেকে বের করে ফেলেছে পিস্তল। অবশ্য কারও দিকেই তাক করেনি। ভয়ঙ্কর চেহারা করে বলল, 'আপনাকে পাঁচ সেকেণ্ড সময় দিলাম। এরপর গুলি করব।'

'ওই যে ওই প্যানেল,' দূরের দেয়াল দেখিয়ে দিল মাকাবো। 'উপরের পাঁচটা সুইচ সেফটি প্রটোকল ডিযএনগেজ করবে। পরের পাঁচটা গেটের মোটরগুলোর সার্কিট থামিয়ে দেবে। শেষের পাঁচটা খুলে দেবে গেটগুলোকে।'

'এসব গেট ম্যানিউয়ালি বন্ধ করা যায়?'

'হ্যাঁ। বাঁধের উপর বড় একটা হুইল আছে। ওটা ঘোরাতে হলে কমপক্ষে দু'জনকে লাগে।'

দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে নিশাত, কোনও গার্ড এলে ঠেকাবে। প্যানেলের সুইচগুলো অফ করছে জলিল। খেয়াল করল লাল জ্বলজ্বলে বাতি নিভছে, বদলে জ্বলে উঠছে সবুজ বাতি। তৃতীয় সারির সুইচ অফ করবার আগে থ্রোট মাইকে বলল, 'মাসুদ ভাই, তৈরি হোন। আমরা গেট খুলে দিচ্ছি।'

'ঠিক সময়ে যোগাযোগ করেছ,' বলল রানা। 'সুইফট বোট থেকে মর্টার সরিয়ে তীরে বসিয়ে নিয়েছে মাধানা। কয়েক রাউণ্ড ফেললেই বুঝবে কোথায় তাক করতে হবে।'

'কঙ্গোলিজ সরকারের কমোডের ফ্লাশ টেনে দিলাম,' বলেই শেষ সুইচগুলো নামিয়ে দিল জলিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিচু আওয়াজ শুরু হলো। কয়েক সেকেণ্ড পর আওয়াজ হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর, কান ফাটিয়ে দিতে চাইল। থরথর করে কাঁপছে দালান। উপরের দিকে উঠে আসছে ফ্লাডগেটগুলো। শুরু হয়েছে বজ্রের মত গর্জন। লক্ষ লক্ষ গ্যালন পানি নিরেট দেয়ালের মত গিয়ে পড়ছে নদীর খাদে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ এলো। নদীতে শুরু হয়েছে আট ফুট উঁচু প্লাবন। ভেসে গেল দুই তীর। গাছ ও ঝোপঝাড় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। ক্রমেই বাড়ছে পানির প্রাচীরের গতি ও উচ্চতা।

'বোধহয় এতেই চলবে,' বলল জলিল। প্যানেলের উপর কারবাইন তাক করেছে, গুলি শুরু হতেই পাতলা ধাতুর তৈরি প্যানেল ও পুরনো ইলেকট্রনিক্স নানা দিকে ছিটকে গেল। ছেঁড়া তার থেকে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎশিখা।

'চলো এবার,' তাড়া দিল নিশাত। 'তার আগে এদের আটকে নাও।'

একে একে টেকনিশিয়ানদের বামহাতের কাফ খুলল জলিল। নিশাত অস্ত্র তাক করে রাখল, সে সুযোগে ভারী টেবিলের পায়ার সঙ্গে লোকগুলোর হাত আটকে দিল জলিল।

এরপর আর অপেক্ষা করল না, বাড়িটা থেকে বেরুল ওরা, দৌড়াতে শুরু করে কয়েক মুহূর্ত পর পৌঁছে গেল সিঁড়ির চাতালে। চারপাশে পানির প্রচণ্ড গর্জন। উড়ছে কোটি জলকণা। একটু দূরেও দেখা যায় না। মুহূর্তে ভিজে গেল ওদের পোশাক।

সিঁড়ি বেয়ে ছুটে নামতে শুরু করল ওরা। একবার মৃতদেহের রক্তে পা পিছলে গেল নিশাতের। কোনওমতে সামলে নিল। নীচে নেমে এল ওরা, দু'জন মিলে যোডিয়াক নিয়ে গেল নদীর তীরে। আগের চেয়ে একটু শান্ত হয়েছে প্লাবনের তোড়, সাবধানে ইনফ্লেটেবল ভাসাল ওরা, তারপর চট্ করে উঠে পড়ল।

ওদের যেতে হবে অনেক ভাটিতে, বোমা শহরে।

এদিকে, দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসে পূর্ণ সতর্কাবস্থায় অপেক্ষা করছে মাসুদ রানা। কর্নেল মাধানা বুঝে গেছে, সুইফট বোট বড় বেশি অস্থির, ওখান থেকে মর্টার ফেলে সুবিধা হবে না। জঙ্গল ও নদীর তীরে মর্টার বসিয়েছে সে, তার গোলন্দাজরা এখন ডায়াল করে ঠিক করছে রেঞ্জ। শেষ গোলা পড়েছে মার্ভেলের স্টারবোর্ডের রেলিঙের বিশ ফুট দূরে।

সমস্যা শুধু সেটাই নয়, উজান থেকে হাজির হচ্ছে একের পর এক স্থানীয় নৌকা। তাতে গিজ গিজ করছে গাধাধারের সৈনিক। এখন পর্যন্ত মার্ভেলের জল-কামান ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে: ওই কামান রয়েছে মাত্র চারটে। সবসময় দুটো লাগছে দুই হেলিকপ্টারতে সরিয়ে রাখতে। একটু সুযোগ পেলেই জাহাজে নেমে আসবে বিদ্রোহী সেনারা।

রেইডার ডোম থেকে রায়হানকে ফিরিয়ে এনেছে রানা। প্রতিরক্ষা বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে স্বর্ণার উপর। ডেকের উপর উঠে গেছে সে। ওরা শুধু পিস্তল ব্যবহার করবে, বলে দিয়েছে রানা। একটু আগে নবী জানিয়েছে, খুব কাছে ভিড়ে

এসেছে একটা নৌকা। স্বর্ণারা উপর থেকে গুলি করছে ওটার দিকে। জঙ্গল থেকে ওদের দিকে আসছে অজস্র গুলি।

'ঠিক আছে,' কমিউনিকেশন স্টেশন থেকে বলে উঠল রায়হান। 'টেকনিশিয়ানরা রেইডার ঠিক করেছে।'

'দূর থেকে প্লাবন দেখতে পাবে?' জানতে চাইল রানা।

'না, নদীতে বাঁক অনেক বেশি। একেবারে শেষ সময় ছাড়া কিছুই দেখব না।'

'তাই বা কম কোথায়।'

জাহাজের পাশে এসে পড়ল আরেকটা মর্টার শেল, এক ইঞ্চির ফারাকে পোর্ট রেইলে লাগল না। মাধানার গোলন্দাজরা লক্ষ্যস্থির করেছে। পরের রাউণ্ড ভয়ঙ্কর ক্ষতি করবে। মার্ভেলের সামনে-পিছনে এবং দু'পাশ আর্মার্ড স্টিল দিয়ে তৈরি, কিন্তু সে তুলনায় ডেক অনেক দুর্বল।

'তৈরি হয়ে নাও ড্যামেজ কন্ট্রোল টিম,' শিপবোর্ড নেটে বলল রানা। 'এবার গোলা পড়বে।'

'আরি আল্লাহ্,' চেঁচিয়ে উঠল রায়হান।

'কী?'

'শক্ত করে কিছু ধরুন!'

কলিশন অ্যালার্ম বাজিয়ে দিল রানা। এইমাত্র রেইডার স্ক্রিন ও বিশাল মনিটরে দেখেছে, পিছন থেকে আসছে প্রকাণ্ড জল-প্রাচীর— এক তীর থেকে আরেক তীর জুড়ে। উচ্চতা হবে অন্তত দশ ফুট। কমপক্ষে বিশ নট গতি তুলে গড়িয়ে আসছে অ্যানাকোণ্ডার মত। একটা সুইফট বোট বাঁক নিয়ে প্লাবনের আগে ছুটতে চাইল। কিন্তু পুরো বাঁক নেয়ার আগেই হাজির হলো জলোচ্ছ্বাস। বোটকে পাশ থেকে ধাক্কা দিল জল-প্রাচীর। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে ছিটকে পড়ল আরোহীরা। এবং ঠিক তখনই মানুষগুলোর উপর কাত হয়ে পড়ল ভারী বোট। মুহূর্তে সলিল

সমাধি হলো মানুষ ও বোটের।

আরোহী নিয়ে এক পলকে তলিয়ে গেল স্থানীয় নৌকাগুলো, কোথাও কোনও চিহ্ন থাকল না। যারা জঙ্গলের ধারে রাইফেল ও মর্টার নিয়ে ব্যস্ত, সব ফেলে ঠেলাঠেলি করে পালাতে লাগল তারা— উঁচু জমিতে পৌঁছুতে না পারলে নিশ্চিত মৃত্যু! জল-প্রাচীরের গতিপথে যাই পড়ল, সবই ভাসিয়ে নিয়ে গেল ওটা।

মার্ভেলের কন্ট্রোল নিজ হাতে নিয়েছে রানা, তবে জল-প্রাচীর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। প্লাবনও এল, ওর আঙুলগুলো পিয়ানো-বাদকের আঙুলের মত নাচতে লাগল কন্ট্রোলের উপর। থমথম করছে মুখ। ও যেন এমন এক বাদক, ভাল করেই জানে ওই সুর কেউ কখনও তুলতে পারবে না। কি বোর্ডের উপর স্থির হলো ওর আঙুল। ডানহাতে ধরেছে জয়স্টিক।

আংশিক খোলা ড্রাইভ টিউবকে বিশ পার্সেন্ট শক্তি দিল রানা। জলোচ্ছাস আসতেই কাদা থেকে উঠে এসেছে মার্ভেলের স্টার্ন। মনে হলো সুনামির ভিতর পড়েছে জাহাজ। একদম স্থির অবস্থা থেকে এক মুহূর্তে বিশ নট গতি পেল। পিছনের নদীতে বিস্ফোরিত হলো দুটো মর্টারের শেল। মার্ভেল আগের জায়গায় থাকলে ওটার রিয়ার কার্গো হ্যাচ বিধ্বস্ত হতো, রিট্র্যাকটেবল এলিভেটরের উপর ধ্বংস হতো এমডি-৫২০এন হেলিকপ্টার।

ইঞ্জিন রিডআউট, পাম্প টেম্পারেচার, বটম স্পিড, ওয়াটার স্পিড, ওদের পজিশন ও কোর্স— বারবার সব দেখছে রানা, চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে একের পর এক স্ক্রিনে। আসলে পানির ভিতর মাত্র তিন নট গতি তুলছে মার্ভেল। কিন্তু বাঁধ ভাঙা নদীর জলোচ্ছ্বাস কমপক্ষে পঁচিশ নট গতি তুলে নিয়ে চলেছে জাহাজকে। পিছন থেকে তাড়া দিচ্ছে ইনগা ড্যামের বিপুল পরিমাণের পানি।

আফতাব চলে গেছে ইঞ্জিন রুমে। মুখ না তুলেই প্রিয় বন্ধুকে

বলল রানা, 'সোহেল, অন্য টিউব পরিষ্কার হলেই জানাবি। আমি যথেষ্ট স্টিয়ারেজ স্পিড পাচ্ছি না।'

গ্রটল সামনে বাড়িয়ে দিল ও। স্রোতের বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করেছে। উথাল-পাতাল ঢেউ সামনের এক দ্বীপের উপর আছড়ে ফেলতে চাইল মার্ভেলকে। কি বোর্ডের উপর নাচছে রানার আঙুলগুলো। জাহাজ সোজা রাখতে বো এবং স্টার্ন থ্রাস্টারগুলো কাজে লাগাল। একই সঙ্গে সোজা করে নিচ্ছে জাহাজ। দু'পাশে বিদ্যুদ্বেগে পিছিয়ে চলেছে গহীন অরণ্য।

ওরা পেরিয়ে এল দ্বীপ, সামনে পড়ল তীক্ষ্ণ এক বাঁক। মার্ভেলকে পাশ থেকে ঠেলছে প্লাবনের তোড়, যেন আছড়ে ফেলবে ওদিকের তীরে। ভাটি থেকে আসছিল এক ছোট কার্গো জাহাজ, ওটার বো গেঁথে গেছে তীরে। তবে কঙ্গো নদীর কিছু অংশ দখল করে রেখেছে ওটার স্টার্ন। থ্রাস্টারগুলোর পুরো ক্ষমতা ব্যবহার করল রানা, যেন পানি থেকে তুলে সরিয়ে নিতে চাইল মার্ভেলকে। দ্রুত গতিতে স্টারবোর্ডে সরছে জাহাজ, তবে শেষ রক্ষা হলো না। উপকূলীয় ফ্রেইটার ঘেষটে এগোলো ওরা। প্রচণ্ড আওয়াজ শুরু হলো। কানে তালা ধরে গেল। দু' সেকেণ্ড পর সরে গেল দুই জাহাজ। পানির প্রবল তোড়ে তীব্র গতি তুলে এগিয়ে চলেছে মার্ভেল।

'খোলের প্লেটে গভীর একটা দাগ থাকবে,' বলল কট্টর গগল। অবাক হয়ে দেখছে রানার অকল্পনীয় জাহাজ চালনা। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, নিজে ও কখনও এতটা দক্ষতার সঙ্গে ওই বাঁক পেরুতে পারত না।

মার্ভেলের চারপাশের নদী ফুটন্ত পানির মত বলকে উঠছে। প্রচণ্ড গতি তুলে ভাটির দিকে ছুটে চলেছে জাহাজ। কেউ দেখলে ভাববে, যেন নর্দমার ভিতর গিয়ে ভেসে চলেছে শুকনো পাতা। কোর্স পরিবর্তনের সুযোগ খুবই কম, ইঞ্জিন থেকে বাড়তি ক্ষমতা

ব্যবহার করতে শুরু করেছে রানা। বারবার নদীর স্রোতের বিরুদ্ধে লড়ছে, নইলে পাশের তীরে আটকা পড়বে মার্ভেল। অথবা, আবারও অগভীর পানিতে গেঁথে যাবে মাটির ভিতর। কিছুক্ষণ আগে একটা কাদার চর ঘেঁষে বেরিয়ে এসেছে জাহাজ, তখন প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়েছে সবাই। নদীর কাদায় তৈরি হয়েছে গভীর খাত। রানা ধারণা করেছিল এবার আটকা পড়বে মার্ভেল। সুপার কমপিউটার বন্ধ করে দেয় পালস জেট। কিন্তু প্রচণ্ড স্রোত ওদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে। জাহাজের কিল ছাড়া পেতেই আবারও গতি পেয়েছে ওরা।

ছুটন্ত তীরের গতি পেয়েছে মার্ভেল। এবং বোধহয় সে কারণেই চ্যালেঞ্জটা উপভোগ করছে রানা। তীব্র প্লাবনের বিরুদ্ধে সামান্য একজন মানুষ ও, নিজের দক্ষতার সাহায্যে সবাইকে নিয়ে বিপদ থেকে সরে যেতে চাইছে। তা প্রকৃতির বিরুদ্ধে হোক বা শক্তিশালী কোনও লোক বা দলের বিরুদ্ধে, কখনও পিছিয়ে যায়নি ও। ওর জানা আছে নিজ ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, কিন্তু আজও এমন পরিস্থিতি দেখেনি যা সামলে উঠতে পারেনি। অন্য কেউ ভাবতে পারে, মাসুদ রানা বড় বেশি গোঁয়ারগোবিন্দ, কিন্তু আসলে নিজের উপর আস্থা ওকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে।

'এইমাত্র আফতাব জানাল বারবার ইঞ্জিন ব্যবহার করায় খুলে গেছে দ্বিতীয় টিউবের মুখ,' ঘোষণার সুরে বলল সোহেল। 'তবে বলে দিয়েছে, আপাতত বেশি ব্যবহার না করাই ভাল। পরে টিম নিয়ে গিয়ে দেখবে কী ধরনের কতটা ড্যামেজ হয়েছে।'

ডায়াল করে দ্বিতীয় টিউব চালু করল রানা, টের পেল সাড়া দিচ্ছে জাহাজ। আর মন্থর গতিতে নড়ছে না। এবার থ্রাস্টারগুলো কম ব্যবহার করলেও চলবে। গতি দেখে নিল রানা। তলদেশের বেগ আটাশ নট। পানির ভিতর আট নট গতি তুলছে জাহাজ। যথেষ্ট গতি পেয়েছে মার্ভেল, এবার সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে

পারবে। তা ছাড়া, কয়েক মাইল পেরুবার পর এখন ক্ষিপ্ত প্লাবন হয়ে উঠেছে প্রায় সাধারণ ঢেউ। বোধহয় নদীর তীরে মারা পড়েছে কর্নেল মাধানার সেনাবাহিনী, নইলে অনেক পিছনে পড়ে গেছে। জলোচ্ছ্বাস হওয়ার পর অয়েল কোম্পানির কন্টারদুটো চলে গেছে।

কিছুক্ষণ পর বলল রানা, 'গগল, তোমার মাল বুঝে নাও। আমরা সরাসরি বোমা বন্দরে যাব।'

হেলম্‌স্ নিল গগল। বসে পড়েছে সিটে।

নিজ সিটে ফিরল রানা। ওর কাঁধের উপর হাত রাখল সোহেল। 'দারুণ শিপ ড্রাইভিং দেখালি!'

'আর কখনও এ কাজ করতে চাই না,' মৃদু হাসল রানা।

'আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল,' সামনে থেকে বলল গগল। 'এমন বিপদ দেখলে এখন থেকে তোমার হাতে গছিয়ে দেব মার্ভেলকে।' গগল নিজে অত্যন্ত দক্ষ ক্যাপ্টেন, কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাসুদ রানাকে অন্তর থেকে প্রশংসা জানাতে কার্পণ্য করল না।

চুপ করে থাকল রানা।

'ভাল লাগত জঙ্গল আর নদী থেকে বেরুতে পারলে,' বলল সোহেল। 'আফতাব জানাচ্ছে, ব্যাটারির চার্জ অবশিষ্ট আছে আর মাত্র ত্রিশ পার্সেন্ট। নদীতে স্রোত থাকলেও সাগরের দশ মাইল আগেই আটকা পড়ব।'

'রানার উপর বিশ্বাস রাখতে পারো,' বলল গগল। 'ও কোনও বুদ্ধি বের করবে।' মৃদু হাসছে। কী যেন জানে।

'কী করবি এবার?' বন্ধুর দিকে চাইল সোহেল।

'গগল তো আগেই জবাব দিয়ে দিয়েছে,' বলল রানা। হাত ঘড়ি দেখল। 'জোয়ার আসছে, আর বড়জোর দেড় ঘণ্টা। কঙ্গো নদীর পনেরো থেকে বিশ মাইল ভেতরে চলে আসবে সাগরের জোয়ার। তখন নোনা পানিতে ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক

ইঞ্জিন চালু করব, রেসের গাড়ির মত গতি তুলে বেরিয়ে যাব সাগরে।'

'আমি এটা ভাবিইনি,' আফসোস করে বলল রায়হান। 'আগে জানলে এত চিন্তা করতাম না।'

'আফতাব বলেছে, বোমা বন্দরে থামলে ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে টিউবগুলো দেখবে,' বলল সোহেল। 'তবে এটাও বলেছে, কমপিউটার থেকেই বুঝতে পারছে, তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি।'

টিউব রি-লাইন করতে হলে লাগবে কয়েক মিলিয়ন ডলার।

'সেক্ষেত্রে আমরা বোমা শহরে বেশিক্ষণ থাকব না,' বলল রানা। 'আপা ও জলিলকে তুলে নিয়েই আন্তর্জাতিক জলসীমায় চলে যাব।'

'ঠিকই বলেছিস,' বলল সোহেল। 'ইনগা ড্যামে অপারেশনের কারণে মিনিস্টার স্যামুয়েল আবালা বা প্রেসিডেন্ট হালালি খেপে যেতে পারে। নেতাদের মাথা খাওয়ার লোকের অভাব হয় না।'

'তা ছাড়া, ডকে থেমে টিউব দেখতে হবে, তা-ও নয়,' বলল গগল। 'আমরা খোলা সাগরেও টিউব দেখে নিতে পারব।'

'ড্যামেজ রিপোর্ট থেকে নতুন কোনও ক্ষতির কথা জানা গেল?' জানতে চাইল রানা।

'মেডিকেল বে-তে একটা এক্স-রে মেশিন নষ্ট হয়েছে,' বলল সোহেল। 'মোস্তাফা আবুলের অসংখ্য কাঁচের গ্লাস ও ডিশ ভেঙেছে।' এই চিফ স্টুয়ার্ড নেভি থেকে অবসর নেওয়ার পর মার্ভেলে বাবুর্চির কাজ নিয়েছে। জাহাজে সে-ই সবচেয়ে বয়স্ক। সর্বক্ষণ পরনে থাকে কড়া ইস্তিরি দেয়া দামি জামা-কাপড়। চৌকস লোক। নেভির আইন মেনে চলে। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন সবাইকে দারুণ সব ডিশ রেঁধে খাওয়ায়। এবং কীভাবে যেন সবার হাঁড়ির খবর থাকে তার কাছে। তার চেয়ে খারাপ কথা: বেমক্কা সময়ে সেগুলো বলেও দেয় অন্যকে। তার সঙ্গে

কথা বলবার সময় সতর্ক থাকে মার্ভেলের অফিসাররা।

'মোস্তাফা আবুলকে বলবি, বেশি দামি ডিশ যেন না চায়।'

'মানবে সে?' আপন মনে বলল সোহেল।

ফ্ল্যাটস্ক্রিন ক্লিপবোর্ড নিয়ে রানার দিকে এগিয়ে এল রায়হান, কুঁচকে গেছে ভুরু। 'মাসুদ ভাই, কয়েক মিনিট আগে এটা ধরেছে ছোঁক-ছোঁক কুকুর।' জাহাজের চারপাশের সারভেইল্যান্স অ্যারে-র নাম দিয়েছে ওরা ছোঁক-ছোঁক কুকুর। ওটার ইলেকট্রনিক স্পেকট্রাম কয়েক মাইল দূরের সবই গ্রহণ করে। সাধারণ রেডিও ব্রডকাস্ট থেকে শুরু করে এনক্রিপ্টেড সেল ফোনও রক্ষা পায় না। মাত্র আধ সেকেণ্ড সময় পেলেই সব তথ্য সংগ্রহ করে মার্ভেলের সুপার কমপিউটার। 'কমপিউটার এইমাত্র কোড ভেঙেছে। আমি ওটাকে বলব উচ্চ-বিত্ত মানুষের তথ্য আদান-প্রদান বা মধ্যম লেভেলের মিলিটারি এনক্রিপশন।'

'ওটার সোর্স?' রেডিও ও কমপিউটার এক্সপার্ট রায়হান রশিদ। তার হাত থেকে জ্বলজ্বলে ক্লিপবোর্ড নিল রানা, তবে ওটার দিকে চাইল না।

'স্যাটালাইট ফোন ব্রডকাস্ট, মাসুদ ভাই। লোকটা ছিল আকাশে, চল্লিশ হাজার ফুট উপরে।'

'তার মানে মিলিটারি এয়ারক্রাফট, বা কোনও এগযিকিউটিভ প্লেন। সাধারণত কমার্শিয়াল জেটলাইনার আটত্রিশ হাজার ফুটের বেশি ওপরে ওঠে না।'

'আমিও তাই জানি। সরি, মাসুদ ভাই, সেই লোক মাত্র যোগাযোগ করেছে, এমন সময় ওটা ধরল ছোঁক-ছোঁক কুকুর। আর ঠিক তখনই ঘুরতে শুরু করেছে রেইডার ডোম। আবার যখন খুঁজতে শুরু করল, তার আগেই রেঞ্জের বাইরে চলে গেছে বিমান।'

মাত্র দুটো লাইন, উচ্চারণ করে পড়ল রানা: '...এত দ্রুত

নয়। ভোর চারটের সময় ডেভিল্‌স্ ওয়েসিসে আসিফ হায়দার চৌধুরিকে পাবে।' এবার নীরবে আর একবার পড়ল রানা, তারপর রায়হানের দিকে চাইল। 'কিছুই তো বোঝা গেল না।'

'জানি না শয়তানের মরূদ্যান কী, তবে আমরা যখন ডকে অস্ত্র খালাস করছি, ঠিক তখন স্কাই নিউজে একটা খবর শুনেছি। বাঙালি বিজ্ঞানী আসিফ হায়দার চৌধুরি ও তার এক অ্যাসোশিয়েটকে জেনেভা থেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। এমনও হতে পারে খবরটা অনেক পরে শুনেছি, আর এর একটু পর আমাদের মাথার উপর দিয়ে তাঁকে নিয়ে গেছে। তখনই কলটা ইন্টারসেপ্ট করেছে ছোঁক-ছোঁক।'

'যদি ধরে নিই ইনি-ই আসিফ হায়দার চৌধুরি-নিকোলাস ক্রিস্টোফার ল্যাবোরেটরিজের সেই একই বিজ্ঞানী, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু খোঁজ-খবর নিতেই হবে,' বলল রানা।

'ভদ্রলোক বিলিয়নেয়ার, আবিষ্কার করেন কীভাবে কয়লাকে পরিশোধন করে ইণ্ডাস্ট্রিতে কাজে লাগানো যায়,' বলল সোহেল। 'এর ফলে তাঁর উপর খেপে ওঠে পরিবেশবাদী দলগুলো। তাদের বক্তব্য: পরিবেশের জন্য কয়লা এখনও অনেক বেশি ক্ষতিকর।'

'কেউ কোনও মুক্তিপণ দাবি করেছে?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল রায়হান। 'এখনও নয়।'

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল রানা। 'ঠিক আছে, নবীকে নিয়ে ইন্টারনেট ঘাঁটতে শুরু করো। কিছু পেলে আমাকে জানাবে। তোমাদেরকে জানতে হবে আসিফ হায়দার চৌধুরিকে কে বা কারা কিডন্যাপ করতে পারে, তদন্তের দায়িত্ব কে পেয়েছে, কী এবং কোথায় ডেভিল্‌স্ ওয়েসিস। ভদ্রলোক কী ধরনের কাজ করছিলেন, তাও জানবে। আসিফ হায়দার চৌধুরি ও নিকোলাস ক্রিস্টোফারের পুরো ব্যাকগ্রাউণ্ড জানতে চাই।'

'আমরা এসবের সঙ্গে জড়াব, কারণ ভদ্রলোক বাঙালি?'

জানতে চাইল রায়হান।

'ওটা বড় একটা কারণ,' বলল রানা। 'তবে সবচেয়ে বড় কারণ, ভদ্রলোক বাংলাদেশকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়েছেন। প্রতিটি বন্যা, ঝড় বা জলোচ্ছ্বাসে।'

এক সেকেণ্ড পর মন্তব্য করল সোহেল, 'শুনেছি উনি চান বাংলাদেশের ফ্যাক্টরিগুলোর পরিবেশ ভাল হোক, এবং সেজন্য বিনা পয়সায় নিজের প্রডাক্ট দেবেন।'

'তার মানে উনি শুধু বিশাল বড়লোক বলে আগ্রহী হয়ে উঠিনি আমরা, তা-ই না?' জানতে চাইল রায়হান।

'ঠিক তা-ই,' বলল রানা।

গম্ভীর স্বরে বলল সোহেল, 'তাঁর কয়েক শ' হাজার কোটি টাকার কথা তো আমার মনেই নেই! ...বাপরে!'

ছয়

আরামদায়ক সুইভেল চেয়ারে বসে ডেস্কের উপর দুই পা তুলে দিয়েছে মাসুদ রানা, কোলের উপর বারো বাই ছয় ইঞ্চির কাঠের বোর্ড, তার উপর রেখেছে ট্যাবলেট পিসি। নিশাত সুলতানা ও জলিল খানের কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্ট পড়ছে। একের পর এক ঝুঁকি নিয়েছে ওরা, তবে লেখা পড়ে মনেই হয় না কোনও বিপদের ভিতর ছিল। ছোট ছোট বাক্যে সবই লিখেছে, সংক্ষেপে। গম্ভীর মুখে কয়েক জায়গায় লাইট পেন দিয়ে নোট

লিখল রানা। তার ভিতর থাকল: নিশাত ও জলিল প্রথমেই টেবিলের পায়ার সঙ্গে লোকগুলোর হাত আটকে দিতে পারত। তাতে সময় বাঁচত।

কাজ শেষে কমপিউটার আর্কাইভে ইলেকট্রনিক রিপোর্ট রেখে দিল রানা। এবার পড়তে লাগল ওয়েদার সার্ভিসগুলোর রিপোর্ট। এ বছর আটলান্টিক সাগরে বড় আকারের ন'টা ঝড় হয়েছে। উত্তর দিকে তৈরি হচ্ছে নতুন একটা। অবশ্য ওটা মার্ভেলের জন্য বিপজ্জনক নয়। এক মাস যায়নি মৌসুম শুরু হয়েছে, তারই ভিতর তিনটি সামুদ্রিক ঝড় হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর হারিকেন। ফোরকাস্টাররা ধারণা করছেন, দু' হাজার পাঁচ সালের মতই এ বছরও একের পর এক হারিকেন আঘাত হানবে আমেরিকার উপর। তাঁরা জানিয়েছেন, এটা খুবই স্বাভাবিক, এমন হতেই পারে। অবশ্য পরিবেশবাদীরা গলা ফাটিয়ে বলছে: ভয়ঙ্কর সব হারিকেন তৈরি হচ্ছে শুধু গ্লোবাল ওয়ার্মিঙের কারণে।

আপাতত আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল পরিষ্কার। পাঁচ দিন জ্বলজ্বলে সূর্য দেখা দেবে।

ফোরকাস্টারদের ওয়েব সাইট বন্ধ করে দিল রানা, হাত পিছনে নিয়ে আড়মোড়া ভাঙল। মনে পড়ল, গত রাতে ধচাপচা জাহাজের লোভী এক অফিসারের অভিনয় করেছে। তারপর কাকডাকা ভোরে বেরিয়ে এসেছে ওরা সাগরে। কেবিনে ফিরে শেভ শেষে দীর্ঘ শাওয়ার নিয়েছে, ঝরঝরে অনুভূতি নিয়ে পরে নিয়েছে ইংলিশ-কাট নীল জিন্স, টার্নবুল ও গলা খোলা অ্যাসার শার্ট। ডেকে চলবার উপযোগী জুতো পায়ে।

সরিয়ে দিয়েছে কেবিনের আর্মার্ড পোর্টহোল কাভার। ঝলমলে আলো এসেছে ভিতরে। একটু বিশ্রাম নিয়েছে। তারপর নাস্তার জন্য ডাক পড়েছে মেস হলে। ওখান থেকে ফিরে এসেই রিপোর্টগুলো পড়তে শুরু করেছে।

সিগারেট ধরিয়ে ডেস্কের পাশে লাইটার রেখে দিল রানা। মনের ভিতর কথাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে। বিসিআইয়ের চিফ, মেজর জেনারেল রাহাত খানকে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। কি-বোর্ডে আঙুল ঠেকিয়েছে, এমন সময় দরজার উপর টোকার আওয়াজ হলো।

'খোলা,' জানিয়ে দিল রানা। ডেস্কের উপর সরিয়ে রাখল পিসি ও বোর্ড।

রায়হান রশিদ ও খোরশেদ নবী এসেছে। ওরা বিসিআইয়ে যোগ দেয়ার পর কিছু দিনের ভিতর পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেছে। আগে বাংলাদেশ আর্মিতে ক্যাপ্টেন ছিল নবী, ওয়েপন্স এক্সপার্ট। পরে যোগ দেয় রানা এজেন্সিতে। এদিকে রায়হান ছিল পাক্কা হ্যাকার। সিআইএ-র কবল থেকে রানা ওকে উদ্ধার করার পর বাঁধা পড়েছে ও বিসিআই-এর মায়াডোরে। কিছু দিন আগে পশ্চিমা বিশ্বের ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে। এরপর রানা এবং ওর দল মিশনে যায় ইজরায়েলে, ধ্বংস করে দেয় আমেরিকান পারমাণবিক মিসাইল।

পিছনে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল নবী।

ডেস্কে রাখা অ্যান্টিক ক্রোনোগ্রাফ চট্ করে দেখল রানা। 'এত জলদি?'

'জী,' মৃদু হাসল রায়হান। হাতে এক তোড়া কাগজ।

রানার পাশের চেয়ারে বসল দুই বন্ধু।

'আমরা কী দিয়ে শুরু করব, মাসুদ ভাই? কিডন্যাপিং, না কোম্পানি?'

'ব্যাকগ্রাউণ্ড দিয়েই শুরু করা যাক,' অ্যাশট্রের ভিতর ছাই ফেলল রানা।

গলা খাঁকারি দিল রায়হান। 'আসিফ হায়দার চৌধুরি, বয়স উনচল্লিশ। অবিবাহিত। ভদ্রলোক এমআইটি থেকে কেমিস্ট্রিতে পি.এইচ.ডি. করেছেন। এরপর প্রিয় এক সতীর্থ বন্ধুকে নিয়ে

গড়ে তুলেছেন আসিফ হায়দার চৌধুরি-নিকোলাস ক্রিস্টোফার ল্যাবোরেটরিজ। ওটা মেটেরিয়াল রিসার্চ কোম্পানি। ব্যবসা শুরু করেন বস্টনের এক ঘুপচি গ্যারাজে। পরবর্তী ছয় বছরে তাঁরা একাশিটা আবিষ্কারের পেটেন্ট করেন। ততদিনে তাঁদের কোম্পানি কোটি কোটি ডলার আয় করেছে, সদর-দপ্তর সরিয়ে নেয়া হয়েছে সুইটযারল্যাণ্ডের জেনেভায়। ...এখন কমকর্তা ও কর্মচারী মিলে দুই শ' পাঁচ জন কাজ করছে। বেশিরভাগ কর্মচারীর বেতন বছরে এক লাখ ডলারের বেশি।'

'তাঁদের সেরা পেটেন্ট একটা অর্গানিক-বেযড সিস্টেম,' বলল নবী। 'কয়লা চালিত প্লাণ্টের ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর ধোঁয়া থেকে শতকরা নব্বুই ভাগ গন্ধক শুষে নেয় ওই ফিল্টার। আবিষ্কার করার পরের এক বছরে দুই বন্ধু হয়ে ওঠেন বিলিয়নেয়ার। সে সময় কেউ ওই আবিষ্কার নিয়ে কথা তোলেনি। কিন্তু দু' বছর যেতে না যেতেই চিৎকার শুরু করল পরিবেশবাদী দলগুলো। বলতে লাগল, স্ক্রাবার থাকুক বা না থাকুক, কয়লা চালিত প্লান্ট অনেক বেশি নোংরা, কাজেই সেগুলো বন্ধ করা উচিত। এরপর কয়েক শ' মামলা হয়েছে আসিফ হায়দার চৌধুরি-নিকোলাস ক্রিস্টোফার ল্যাবোরেটরিজের বিরুদ্ধে। এখনও ঝুলছে অন্তত পনেরোটা মামলা। কিছুদিন পর পর একটা দুটো করে কেস ফাইল হচ্ছেই।'

নবী থেমে যেতেই বলল রানা, 'এমন কি হতে পারে আসিফ হায়দার চৌধুরিকে ইকোটেরোরিস্টরা কিডন্যাপ করেছে?'

'এ নিয়ে ভাবছে সুইস পুলিশ,' বলল রায়হান। 'তবে অমন হওয়ার সম্ভাবনা কম। ধরলাম কিডন্যাপ করল, কিন্তু তা থেকে কী পাবে?' মাথা নাড়ল সে। 'আগের প্রসঙ্গে ফিরি: এরপর বছর তিনেক আগে দুই বন্ধুর ভিতর তৈরি হলো ফাটল। তার আগে পর্যন্ত আপন ভাইয়ের মতই ছিলেন তাঁরা। একসঙ্গে প্রেস

কনফারেন্স করতেন, একসঙ্গে ছুটিতে দেশ-বিদেশ ঘুরতে বেরুতেন। প্রথম বিরোধ তৈরি হয় এক আমেরিকান মডেল-কন্যাকে নিয়ে। আসিফ হায়দার চৌধুরি কখনও এ বিষয়ে কিছুই বলেননি। তবে নানা রিপোর্ট থেকে বুঝেছি, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে একদম বদলে যান নিকোলাস ক্রিস্টোফার। পরিবেশবাদীদের সঙ্গে মিশতে শুরু করেন। নিজ কোম্পানির বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত বাধ্য করেন মিস্টার চৌধুরিকে তাঁর সব শেয়ার কিনে নিতে। ক্রিস্টোফারের শেয়ারের মূল্য ছিল ছয় বিলিয়ন ডলার। তাঁকে নগদ টাকা বুঝিয়ে দিতে হয়। এর ফলে প্রায় ব্যাঙ্করাপ্ট হয়ে যান চৌধুরি।'

'সুন্দরী মডেল-কন্যার প্রেমে পড়ে মাঝখান থেকে ভেঙে গেল দুই বন্ধুর সুন্দর সম্পর্ক,' আস্তে করে মাথা নাড়ল নবী।

'তারপর থেকে কী করছেন তাঁরা?'

'মিস্টার চৌধুরির সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয় ওই মেয়ের, হঠাৎ করেই সে বিয়ে করে বসে এক টেনিস স্টারকে,' বলল নবী। 'বিয়ের পিড়িতে বসেননি চৌধুরি। এদিকে নিকোলাস ক্রিস্টোফার আমেরিকার মেইন-এ বাড়ি করেন। সেই থেকে ওখানেই আছেন। গত ক' বছর হলো পরিবেশবাদীদের পিছনে বিপুল টাকা খরচ করছেন। সন্দেহ করা হয়, উনি পরিবেশবাদী চরমপন্থী কিছু দলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। তবে কিছুদিন আগে কয়েকটা পরিবেশবাদী গ্রুপের বিরুদ্ধে মামলাও করেছেন। তারা নাকি পরিবেশ রক্ষার কোনও কাজ না করেই সবার কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা তুলছে, খুশিমত টাকা খরচ করছে নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে। দুই মাস পর মামলার শুনানি শুরু হবে। মোটকথা, মানুষের চোখের অন্তরালে চলে গেছেন নিকোলাস ক্রিস্টোফার।'

'তার মানে এখন একাই থাকে?' সিগারেট ফুরিয়ে এসেছে,

ওটা অ্যাশট্রের ভিতর ফেলে আগুন নিভিয়ে দিল রানা।

'ঠিক তা নয়,' বলল রায়হান। 'আসলে কোনও আলোচনার ভিতর নিজেকে জড়ান না।' একটা কাগজ থেকে লেখা পড়ে নিল সে, তারপর বলল, 'রিসার্চ করার সময় আমাদের মনে হয়েছে, কোম্পানির দুই মালিকের ভিতর আসল হিরো ছিলেন আসিফ হায়দার চৌধুরি। চমৎকার বক্তা ছিলেন, প্রেস কনফারেন্সে সবসময়ে প্রাধান্য পেতেন। পরনে থাকত একহাজার ডলারের সুট। এদিকে আড়ালে থাকতেন মুখচোরা ক্রিস্টোফার, পরনে থাকত কমদামি জিন্স ও কোঁচকানো টাই। যদিও তাঁর মগজ থেকেই বেরিয়েছে বেশিরভাগ আবিষ্কার। লাইমলাইটে থাকতেন চৌধুরি সাহেব, আর ছায়ার ভিতর আড়ালে থাকতেন ক্রিস্টোফার। আমাদের ধারণা হয়েছে, ভদ্রলোক ওই কোম্পানি থেকে সরে যাওয়ার পর নিজেকে আরও গুটিয়ে নিয়েছেন।'

'ক্রিমিনাল মাস্টার মাইণ্ড মনে হয় না তাকে,' মন্তব্য করল রানা।

'আমাদেরও তা-ই মনে হয়েছে,' বলল নবী। 'উনি সত্যিকারের একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, যার পিছন-পকেটে রয়েছে পেটমোটা মানিব্যাগ।'

'আবার ফেরা যাক কিডন্যাপিঙের বিষয়ে,' বলল রানা। 'এখনও কেউ কোনও মুক্তিপণ দাবি করেনি... কিছু কি আমাদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে?'

'ক্রিস্টোফারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর আরও বেশি মনোযোগী হয়েছেন চৌধুরি, ভাল ভাবেই চলছে কোম্পানি,' বলল নবী।

'ওখানে কী ধরনের কাজ হয়?'

'ওটা প্রাইভেট কোম্পানি, মিস্টার চৌধুরির নির্দেশ মত রিসার্চ করে একদল বিজ্ঞানী,' বলল রায়হান। 'প্রতি বছর কয়েকটা

গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের পেটেন্ট করে। ভালই ব্যবসা হচ্ছে।'

'নতুন কোনও আবিষ্কার কেড়ে নেয়ার জন্য তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে?' বলল রানা, 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এসপিয়োনাজের কথাও মাথায় রাখতে হবে।'

'আমরা এ ধরনের কোনও খবর জানি না, মাসুদ ভাই,' বলল রায়হান। 'গোপনে কোনও রিসার্চ করে থাকতে পারেন।'

'ঠিক আছে, কিডন্যাপিঙের ব্যাপারটা খুলে বলো।'

চেয়ারে সোজা হয়ে বসল রায়হান। 'আসিফ হায়দার চৌধুরি এবং ক্যারেন কুম্বস নামের এক রিসার্চারকে দেখতে পায় সিকিউরিটি গার্ড। তাঁরা মেইন বিল্ডিং থেকে ক্যাম্পাসে বেরিয়ে আসেন। তখন সন্ধে সাতটা। গেটের দিকে যাওয়ার সময় আলাপ করছিলেন। রাত আটটার সময় ডিনার পার্টিতে যাওয়ার কথা চৌধুরি সাহেবের। কুম্বস একা থাকে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। দু'জন আলাদা দুটো গাড়ি নিয়ে রওনা হন। আগে ছিল চৌধুরি সাহেবের মার্সিডিজ, পিছনে কুম্বসের ফোক্সভাগেন। এরপর ফ্যাসিলিটি থেকে আধ মাইল দূরে দু'জনের গাড়ি পাওয়া যায়। চাকার দাগ থেকে পুলিশ ধারণা করছে, ওখানে তৃতীয় কোনও গাড়িও ছিল। চাকার দূরত্ব থেকে বোঝা গেছে, ওটা কোনও ভ্যান। ওই গাড়ি দ্রুত চলছিল, রাস্তা থেকে ঠেলে সরিয়ে দেয় সামনের গাড়িকে। চৌধুরি সাহেবের মার্সিডিজের এয়ারব্যাগ খুলে যায়। তবে ফোক্সভাগেনেরটার ব্যাগ খোলেনি। বোধহয় চৌধুরি সাহেবের গাড়ি দুর্ঘটনার ভিতর পড়েছে দেখে গতি কমিয়ে আনে মেয়েটা। মার্সিডিজের পাশের দরজা তুবড়ে যায়, এ থেকে ধারণা করা হচ্ছে সহজেই তালা খুলতে কোনও অসুবিধে হয়নি। ফোক্সভাগেনে অটোমেটিক লক ছিল না। মেয়েটিকে কিডন্যাপ করতেও ঝামেলা হয়নি।'

'ওটা যে কিডন্যাপিং, কীভাবে জানা গেল?' জানতে চাইল

রানা। 'সাধারণ দুর্ঘটনাও হতে পারে। হয়তো কোনও লোক গাড়ি থামিয়ে তাদেরকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেছে।'

'তা হয়নি। স্থানীয় হাসপাতাল খুঁজেছে পুলিশ। আশপাশের সব বেযমেন্টও।'

'বলে যাও।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রায়হান। 'এখন বড় কথা: কেউ এখনও মুক্তিপণ দাবি করেনি। পুলিশ ভ্যানটা খুঁজেছে, পায়নি। অবশ্য বেশ পরে ওটাকে পাওয়া গেছে এয়ারপোর্টে। পুলিশ ধারণা করছে, চৌধুরি সাহেব এবং ক্যারেন কুম্বসকে বিমানে করে দেশ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'গত রাতে জেনেভা থেকে কোন্ কোন্ চার্টার ফ্লাইট গেছে, খোঁজ নিয়েছ?'

'এখানে আসার আগে নবী ওই কাজই করছিল,' বলল রায়হান। 'পঞ্চাশটার বেশি গেছে। ইকোনমিক সামিট শেষে বড় বড় মাথাওয়ালা লোকগুলো বাড়ি ফিরেছে।'

চুপচাপ অপেক্ষা করছে রানা।

'সুইস পুলিশ এখনও বুঝতে পারছে না এ পরিস্থিতিতে কী ভাববে,' বলল নবী। 'অপেক্ষা করে দেখতে চাইছে। এমনও হতে পারে, একটু দেরিতে মুক্তিপণ দাবি করবে কিডন্যাপাররা।'

'হয়তো ক্যারেন কুম্বসের জন্য মোটেও চাইল না, চাইল শুধু আসিফ হায়দার চৌধুরির জন্য,' মন্তব্য করল রানা।

মাথা নাড়ল রায়হান। বুঝতে পেরেছে মাসুদ ভাই কী বলতে চেয়েছেন। 'তেমন মনে হয় না। কোম্পানির ডেটাবেস ঘেঁটে দেখেছি। ওখানে দু'বছর ধরে আছে ক্যারেন কুম্বস। অর্গানিক কেমিস্ট্রির উপর ডক্টরেট চাইছে। আগেই বলেছি, মেয়েটা একা থাকে। অবিবাহিতা। ওই কোম্পানির কর্মচারীদের বিষয়ে খুবই কম তথ্য দেয়া হয়েছে ডেটাবেসে। কী ভালবাসে, হবি কী—

প্রায় কিছুই বলা হয়নি। ওই মেয়ের ক্রেডেনশিয়াল ছাড়া ব্যক্তিগত কোনও তথ্য নেই। ...আরেকটা কথা, আমার মনে হয় না কেউ কিডন্যাপ করার জন্য প্রাইভেট জেট ব্যবহার করবে।'

'তারপরও খতিয়ে দেখতে হবে,' বলল নবী। 'এটা নিশ্চিত যে আসিফ হায়দার চৌধুরি ছিলেন মূল টার্গেট। ক্যারেন কুম্বস হয়ে ওঠে সাক্ষী, কাজেই তাকেও কিডন্যাপ করতে হয়েছে।'

'ডেভিল্‌স্ ওয়েসিসের ব্যাপারে কিছু জানলে?' বলল রানা।

'ইন্টারনেটে কিছু নেই,' বলল রায়হান। 'ওটা বোধহয় কোনও কোড নেম। যে-কোনও জায়গার কথা বলে থাকতে পারে। আমরা যখন ফোন কল ইন্টারসেপ্ট করলাম, শুনেছি তারা পৌঁছবে ভোর চারটেয়। তার মানে, ওই সময়ে পৌঁছতে পারবে দক্ষিণ আমেরিকার পুব দিকে। আবার উত্তর দিকে গেলে ফিরতে পারবে ইউরোপে।'

'এমন হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম,' বলল রানা। 'যদি ধরি সুইটযারল্যাণ্ড থেকে সোজা দক্ষিণে সরল রেখায় এসেছে, সেক্ষেত্রে মাঝরাতের পর আমাদের মাথার উপর দিয়ে গেছে। কাজেই আমাদের জানতে হবে কোন্‌টা ল্যাণ্ডিং সাইট।'

'নামিবিয়া, বতসোয়ানা, জিম্বাবুইয়ে বা দক্ষিণ আফ্রিকা হতে পারে,' বলল রায়হান।'

'আমার যে মন্দ কপাল, ঠিক গিয়ে পড়ব যিম্বাবুইয়েতে,' বিড়বিড় করে বলল নবী।

ওই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর মন্দ। বছরের পর বছর চরম দুর্নীতি ও ব্যর্থ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা একদম শেষ করে দিয়েছে এক সময়ের ধনী দেশটিকে। এখন ওটা আফ্রিকার অন্যতম দরিদ্র অঞ্চল। অত্যাচারী সরকারের উপর খেপে উঠেছে জনগণ, যে-কোনও দিন বিদ্রোহ করবে। এবং বিপ্লব যদি শুরু হয়, সেই গৃহযুদ্ধ চলবে মাসের পর মাস।

'কিডন্যাপার যদি যিম্বাবুইয়েতে গিয়ে থাকে, ভাল করেই জানে যা খুশি করতে পারবে,' বলল রায়হান, 'যুদ্ধের ময়দানে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকে খুঁজবে কে! তা ছাড়া, মোটা অঙ্কের ঘুষ দিলেই চোখ অন্য দিকে সরিয়ে রাখবে সরকার।'

'যিম্বাবুইয়ের ভিতর ডেভিলস ওয়েসিস খোঁজো, তবে অন্যদিকেও চোখ খোলা রেখো। ওই জায়গা অন্য কোথাও হতে পারে। আমরা আপাতত দক্ষিণ দিকে যাব। আশা করি ট্রপিক অভ ক্যাপ্রিকর্ন পৌঁছবার আগেই কিছু পাবে। এদিকে আসিফ হায়দার চৌধুরি-নিকোলাস ক্রিস্টোফার ল্যাবোরেটরিজের সঙ্গেও যোগাযোগ করব। ডিরেক্টরদের জানা থাকুক, ইচ্ছা করলে তারা আমাদের সহায়তা নিতে পারে।'

'আমরা কিডন্যাপিঙের কেস নিই না, বিশেষ করে সাগরে,' বলল নবী। 'ওটা তো কোস্টগার্ড বা পুলিশের কাজ।'

'কথা ঠিক, কিন্তু আমরা আছি সঠিক জায়গায়। কাজেই সম্ভব হলে বাঙালি বিজ্ঞানীকে উদ্ধার করব।'

রায়হান বলল, 'হয়তো লাগবেই না, আজই কিডন্যাপাররা দাবি জানাবে। আর তারপর ওই কোম্পানি থেকে মুক্তিপণ দিয়ে দেবে। হাসতে হাসতে নিজ বাড়িতে ফিরবেন বিজ্ঞানী।'

'একটা কথা তুমি ভুলে গেছ,' বলল গম্ভীর রানা। 'ওরা যদি মুক্তিপণই চাইবে, তো বন্দিকে সুইটযারল্যাণ্ডেই লুকিয়ে রাখত; এত ঝুঁকি নিয়ে বিমানে করে দেশ থেকে তাকে সরিয়ে নিত না। না, রায়হান, কোনও মুক্তিপণের জন্য নয়, অন্য কোনও পরিকল্পনা আছে ওদের।'

'তা কী হতে পারে?' ভুরু কুঁচকে ফেলল রায়হান। ভাব দেখে মনে হলো মুহূর্তে সব বুঝে ফেলবে।

'আগে ডেভিলস ওয়েসিস পাও, আমরা সবই জানব।' হাসল রানা। 'আর আমিও চিফের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।'

সাত

ভারী হেডফোন চেপে ধরেছে কান দুটোকে, ভিজে সেঁটে গেছে আশপাশের চুল, ঘেমে-নেয়ে অস্বস্তি বোধ করছে কার্টা অস্টিন। হেডফোন যে একটু খুলবে, তা-ও পারবে না, বিকট আওয়াজ তুলে ছুটছে কপ্টার। আজ নিয়ে পুরো দু'দিন এই অত্যাচার সইছে কার্টা।

ভিজে সপসপ করছে পিঠের কাছে। যতবার সরে বসতে চাইছে, প্লাস্টিকের সিটের সঙ্গে আটকা পড়ছে শার্ট। তারচেয়ে খারাপ লাগছে অন্য কারণে। যেই নড়ছে, শার্টের বুকের দিকটা টানটান হয়ে উঠছে। তখন নির্লজ্জ চওড়া হাসি দিচ্ছে ব্র্যাড এন লাজরাস। গাইড লোকটা পাশ থেকে সরলে ভাল হতো! বা ভাল হতো ও নিজে পাইলটের পাশে গিয়ে বসলে। কিন্তু তা হবে না। পাইলট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, রন কুবলিকির ওজন ককপিটে দরকার। নইলে ঠিক ভাবে চলবে না খুদে কপ্টার।

শেষবারের মত সোয়াকোপমুণ্ড ফিরছে ওরা। সেজন্য যথেষ্ট খুশি কার্টা। আবার হতাশও। বিরক্তি চেপে ধরছে ওকে। সব মিলে অস্থির লাগছে মন। এই নিয়ে সাতবার সাগরের গভীরে গেছে, ম্যাপে এঁকে নেয়া প্রায় সব জায়গা খুঁজে দেখেছে। প্রতিবার ফিরেছে রি-ফিউয়েলিঙের জন্য। আবার ফিরে গিয়ে দেখেছে সাগরের নতুন জায়গা। কিন্তু সেখানে সাধারণ পাথরের

ফর্মেশন ছাড়া কিছুই মেলেনি। দড়িতে ঝুলিয়ে সাগরের গভীরে নামিয়ে দিয়েছে মেটাল ডিটেক্টর। কিন্তু গোটা জাহাজ পাওয়া তো দূরের কথা, বড়জোর পেয়েছে জাহাজ থেকে খসে পড়া কোনও নোঙর।

খুদে কপ্টারের ভিতর নড়াচড়া প্রায় অসম্ভব। দু'দিন হলো সারা দেহে টনটনে ব্যথা নিয়ে কাজ করছে কার্টা। নীরবে সইছে আরেকটা অত্যাচার। লাজরাসের গায়ে বোটকা গন্ধ! ওর মনে হচ্ছে ঢুকে পড়েছে সজারুর খাঁচার ভিতর। প্রায় চলে এসেছে ওরা সোয়াকোপমুণ্ডের কাছে। একটু পর পিছনে পড়বে সাগর, শুরু হবে একের পর এক বালির ঢিবি। সানগ্লাসের ভিতর দিয়ে চেয়ে রইল কার্টা, মাথা-ব্যথা শুরু হয়েছে। স্থানীয় জেলেদের উপর খুব ভরসা করেছিল, ভেবেছিল তাদের জ্ঞান অনেক কাজে লাগবে। কিন্তু কই, কিছুই পেল না! এখন ফিরছে বুকে ব্যর্থতা বয়ে নিয়ে।

সামনের সিট থেকে ঘুরে চাইল কুবলিকি, হাতের ইশারা করল। কপ্টারের ইন্টারনাল কমিউনিকেশন নেটে আটকে নিতে বলছে হেডফোনের জ্যাক। কার্টা ওটা আনপ্লাগ করেছিল সবাইকে প্রাইভেসি দিতে।

'পাইলট বলছে কপ্টারের রেঞ্জ নেই, ম্যাপের শেষ স্পটে যেতে পারবে না। ওটার কথা বেশি করে বলেছিল দাদু এবেল। ওই যে, ধাতুর সাপ।'

'দাদু এবেল কী বলেছে?' ঝুঁকে জানতে চাইল লাজরাস।

ভীষণ ভাবে শিউরে উঠল কার্টা। চট্ করে ঢোক গিলল, পণ করেছে, কিছুতে বমি করবে না। উহ্, এত দুর্গন্ধ থাকতে পারে কারও মুখে? পারে, পারে, এই লোকের মুখেই আছে!

গত রাতে স্যাণ্ডউইচ বে-তে গেছে, কাউকে বলেনি কার্টা। তার মূল কারণ, বোধহয় ঠিকই বলেছে গাইড লাজরাস। বুড়ো জলে আসলেই অর্ধউন্মাদ।

কুবলিকি বলে ফেলায় এখন লজ্জার ভিতর পড়তে হচ্ছে। লোকটা মুখ বন্ধ রাখলে ভাল হতো। কাঁধ ঝাঁকাল কার্টা। 'বলার মত কিছুই নয়। লোকটা একদম পাগল। ...সব জায়গা খুঁজতে গিয়ে এরইমধ্যে বেরিয়ে গেছে দু'হাজার ডলার। তা-ও শুধু ফিউয়েলের জন্য। নির্ভরযোগ্য কোনও তথ্য নেই। মনে করি না দাদু এবেলের কথায় পয়সা নষ্ট করা উচিত। সে থাকুক তার বিশাল সাপ নিয়ে।'

'বিশাল... কী বললেন?' হাসি-হাসি মুখে জানতে চাইল পাইলট। দক্ষিণ আফ্রিকান লোক সে, বিদঘুটে উচ্চারণে ইংরেজি বলে।

'প্রকাণ্ড সাপ, অনেকগুলো,' বলল কার্টা। নিজেকে বোকা লাগছে ওর। 'বলেছে একটা সাপ তার উপর হামলা করে।'

'পেটে বেশি মদ পড়েছিল,' মন্তব্য করল পাইলট। 'সবাই জানে দাদু এবেল সবসময় নেশা করে। নিজের চোখে দেখেছি, একবার দুই অস্ট্রেলিয়ানের সঙ্গে বাজি ধরল। মদ গিলতে শুরু করার পর তিন ঘণ্টা পেরুল, তারপর অস্ট্রেলিয়ানরা টেবিলের নীচে ঘুমিয়ে পড়ল। আকারে গণ্ডারের মত ছিল তারা। তখনও গিলে চলেছে দাদু এবেল। নেশা থেকে উঠবার সময় অনেক কথাই বলে। শুধু সাপ কেন, যে-কোনও কিছুই দেখে। আগেও বলেছে, একদিন তাকে তাড়া করে ভয়ঙ্কর এক দৈত্য।'

'বিশাল সাপ,' খিঁকখিঁক করে হাসল লাজরাস। 'আমি না বলেছি ওই বুড়ো বদ্ধ পাগল? ওখানে গিয়ে সময় নষ্ট করেছেন। ব্র্যাড এন লাজরাসের উপর বিশ্বাস রাখুন, সে সঠিক জায়গা চিনিয়ে দেবে। নিজ চোখে দেখবেন সেই জাহাজ। এদিকে এমন সব জায়গা আছে, সেখানে ঠিকই জাহাজ পাবেন। না পেলে আমার নাম পাল্টে কুকুরের নামে রাখবেন।'

'আমি আর এসবের ভিতর নেই,' জানিয়ে দিল কুবলিকি।

'আগামী পরশু দিন বাড়ি ফিরছি। তার আগে হোটেলের সুইমিং পুলে সময় কাটাব।'

'আপনাকে দোষ দিতে পারছি না,' চট্ করে যুবতীর পেলব উরু দেখে নিল লাজরাস। আফসোস করল, ওই হাফপ্যান্ট না থাকলে... 'একাই আমি বোটে করে মিস অস্টিনকে নিয়ে যাব। তাতে কপ্টারের চেয়ে অনেক দূরে যেতে পারব।'

'তার কোনও দরকার পড়বে না,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল কার্টা। খেয়াল করেছে গাইডের লোভী চোখ। ওকে একবার কাছে পেলেই হামলে পড়বে লোকটা।

'আগামীকাল সকালে ঠিক করব কোথায় যাব,' বলল কুবলিকি। 'হয়তো বোট নিয়ে বেরিয়ে পড়া মন্দ হবে না।'

'সেক্ষেত্রে সময়ই শুধু নষ্ট করবেন,' বলল পাইলট।

লোকটা বোধহয় ঠিকই বলেছে, ভাবল কার্টা।

বিশ মিনিট পর ধুলোভরা হেলিপোর্টের উপর স্থির হলো খুদে কপ্টার। রোটরের প্রচণ্ড হাওয়া আকাশে তুলছে কাঁকরের মত গোলাপী বালি। আঁধার হয়ে আসছে চারপাশ। ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এল কপ্টার, দেরি না করে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল পাইলট। কমছে ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ। কমে এল রোটরের গতি। কিন্তু পুরো থেমে যাওয়ার আগেই দরজা খুলে দিয়েছে পাইলট। সঙ্গে সঙ্গে ঘামে ভেজা হাওয়া ছিটকে বেরুল, বদলে ভিতরে ঢুকল উষ্ণ বালি ভরা হাওয়া। তা-ও ঢের ভাল, ভাবল কার্টা।

মাথার উপর এখনও ঘুরছে রোটর, মাথা নিচু করে নেমে পড়ল ও। সিটের পাশ থেকে তুলে নিল ডাফল ব্যাগ, কপ্টারের নাকের সামনে দিয়ে চলে গেল আরেক দিকে। মেটাল ডিটেক্টর সরাতে সঙ্গীকে সাহায্য করবে। বামদিকের স্কিড থেকে কেবল খুলল ও। এক মিনিট পেরুনোর আগেই দু'জন মিলে নামিয়ে ফেলল এক শ' পাউণ্ড ওজনের ইকুইপমেন্ট, নিয়ে রাখল পিকআপ

ট্রাকে। লাজরাস কোনও সাহায্য করল না, সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। দু' ঘণ্টা পর ধূমপানের সুযোগ পেয়েছে।

পাইলটের পাওনা মিটিয়ে দিল রন কুবলিকি। একবার হতাশ হয়ে দেখল, মাত্র দুটো ট্র্যাভেলার্স চেক বাকি থাকল। তখনই ঠিক করল, আর বাজে কাজে চেক ব্যবহার করবে না। হোটেলের ক্যাসিনো ডাকছে তাকে।

কার্টা ও কুবলিকির সঙ্গে করমর্দন করল পাইলট, চলে যাওয়ার আগে বলল, 'আপনারা বোধহয় বুঝেছেন, ব্র্যাড এন লাজরাস আসলে পাকা চোর, কথার কোনও দামও নেই; কিন্তু দাদু এবেল সম্পর্কে ঠিকই বলেছে— বুড়োর মাথা খারাপ। ...নিমজ্জিত জাহাজ খুঁজতে চেয়েছেন, হয়তো মিটল না শখ, কিন্তু বাকি ক'দিন আরাম করে ছুটি কাটান। মিস্টার কুবলিকি ভালই ভেবেছেন। শহর ঘুরে দেখুন, সুইমিংপুলে বিশ্রাম নিন।'

লাজরাস বেশ দূরে, কার্টা বলল, 'একটা কাজ নিয়ে এসেছি, কাজেই সময় নষ্ট করব না।'

মৃদু হাসল পাইলট। 'শ্বেতাঙ্গদের এ জন্যই ভাল লাগে। হাল ছাড়ি না আমরা।'

আরেকবার করমর্দন করল ওরা। ফোর-হুইল পিকআপের পিছনে উঠে বসেছে লাজরাস। তাকে ওয়ালভিস বে-র সস্তা এক বারে নামিয়ে দিল কার্টা, জানিয়ে দিল তাকে আর লাগবে না।

বার কয়েক মাথা নাড়ল লাজরাস, বলল আগামীকাল সকাল নয়টার সময় হাজির হবে।

'লোকটাকে সহ্য করা কঠিন,' রওনা হওয়ার পর বলল কার্টা।

'কেন যে তাকে ভাল লাগে না আপনার,' বলল কুবলিকি। 'হ্যাঁ, কখনও গোসল করে না, মুখেও মিণ্ট রাখা দরকার, কিন্তু আসলে খারাপ লোক নয়। সর্বক্ষণ সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে রেখেছে।'

'কোনও মেয়ে হলে ওর গায়ের দুর্গন্ধ পেতে।'

আফ্রিকার অন্য যে-কোনও শহরের সঙ্গে মিল নেই সোয়াকোপমুণ্ডের। নামিবিয়া ছিল জার্মান কলোনি। ব্যাভেরিয়ার আর্কিটেকচার অনুযায়ী তৈরি শহর। বাড়িগুলো প্রাচীন চেহারার। একটু পর পর লুথেরান চার্চ। রাস্তার পাশে পাম গাছের সারি। মরুভূমি থেকে আসছে কোটি বালিকণা, তারপরও সবকিছুর ভিতর পশ একটা ভাব। ওয়ালভিস বে সুন্দর বন্দর, প্রতিদিন আসছে অভিযাত্রীরা। কেউ যাবে সাগরে, কেউ মরুভূমিতে, আবার কেউ পাহাড়ে।

কুবলিকি জানাল হোটেলে বুফে ডিনার খাওয়াবে। লোভ দেখাল ক্যাসিনোয় বসে দু'জন মজা করে জুয়া খেলবে। কিন্তু মানা করে দিল কার্টা। 'না-হোটেল, না-ক্যাসিনো,' বলল, 'আমি বন্দরের কোনও রেস্টুরেন্টে যাব। ওখানে বাতি-ঘর আছে। ওখান থেকে সূর্যাস্ত দেখব।'

'আপনার যা ইচ্ছা,' বিরক্ত হয়ে নিজ রুমের দিকে পা বাড়াল কুবলিকি।

ঘরে ফিরে শাওয়ার সারল কার্টা, তারপর গা মুছে পরে নিল ফুলেলা সানড্রেস, কাঁধে সোয়েটার। পায়ে চটি স্যাণ্ডেল। পিঠে এলিয়ে রইল লালচে চুল। হালকা মেকআপ নিল। আয়নায় নিজেকে দেখে নিয়ে ভাবল, গত ক'দিন ভদ্রলোকের মত থেকেছে কুবলিকি, কিন্তু ক' ঘণ্টা ক্যাসিনোয় কাটাবার পর ঠিকই জেমস বণ্ডের মত হাত বাড়াবে ওর দিকে। তার আগেই হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়া উচিত। যুবক আবার ওর চেয়ে কয়েক বছরের ছোট!

হোটেল থেকে বেরিয়ে ব্যাহনহফ স্ট্রিটের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে শুরু করল কার্টা। একটু পর পর স্থানীয়দের কুটিরশিল্পের দোকান। টুরিস্টদের জন্য সাজিয়ে রেখেছে কাঠে খোদাই করা

মূর্তি ও অস্ট্রিচ পাখির রঙচঙে ডিম। আটলান্টিক থেকে ভেসে আসছে শীতল হাওয়া, যেন ঝাঁট দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে ধুলোবালি। সমাহিত হয়ে এসেছে শহর। রাস্তার শেষে ডানদিকে পাম বিচ। সরাসরি সামনে মোল। শেষ প্রান্তে অনেক উঁচু বাতি-ঘর। ক' মিনিট হাঁটবার পর পৌঁছে গেল কার্টা। লুটিয়ে পড়া ঢেউয়ের উপর তৈরি করা হয়েছে অপূর্ব সুন্দর রেস্টুরেন্ট। কার্টা ভাবল, দূর-সাগরে চাইলে কেমন উদাস হয়ে ওঠে সবাই। ওর মত করেই ভেবেছে ক'জন টুরিস্ট, টেবিল দখল করে দেখছে সুনীল সাগর।

বার কাউন্টার থেকে জার্মান বিয়ার নিল কার্টা, একটু দূরে চেয়ার দেখে ওখানে বসল। ধীরে ধীরে সাগরের বুকে নেমে আসছে রাত। ওর বুকের ভিতর ঠিক অমনই আঁধার। সবই যেন ফাঁকা লাগছে। ব্যর্থতা মেনে নেয়া কষ্টের। অনেক আশা নিয়ে এসেছিল। শুরু থেকেই জানত, সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তারপরও ভেবেছে, হয়তো সত্যি পাবে এইচএমএস চ্যালেঞ্জারকে।

শতবার নিজেকে জিজ্ঞেস করেছে: জাহাজ পেলে তারপর কী? ওই গুজব সত্য হওয়ার সম্ভাবনা কোটিতে এক ভাগও ছিল না। এরপরও যদি পেয়েই যেত, ওর কোম্পানি মোটা বোনাস দিত। সেটাই কি সব? রন কুবলিকির গা জ্বলা কথা, লাজরাসের নারী-দেহের লোভ বা দাদু এবেলের পাগলামি— পয়সা পেলেই ব্যস্, সব সহ্য করতে হবে?

নিজের উপর রেগে গেছে কার্টা, তিন চুমুকে বিয়ার শেষ করল। আরেকটা বিয়ারের অর্ডার দিল, এবার সঙ্গে থাকল মাছের ডিশ। আগেই ঠিক করেছে, এখানে ডিনার সেরে নেবে।

সাগরে ডুবতে শুরু করেছে সূর্য, সেদিকে চেয়ে রইল কার্টা। খাবার দিয়ে গেল বয়। হাতে কাঁটাচামচ তুলে নিল কার্টা। ভাবছে: ওই ডুবন্ত সূর্যের মতই ওর জীবন, অর্থহীন ভাবে ফুরিয়ে চলেছে।

ওর বড়বোন বিয়ে করেছে ক' বছর আগে। স্বামী আছে, তিনটে ছেলেমেয়ে, নিজের সুন্দর একটা ক্যারিয়ার— আর ও নিজে কী করছে? লণ্ডনে ছোট্ট এক অ্যাপার্টমেণ্টে একা থাকে। জীবনে আসতে চেয়েছে অনেক পুরুষ, কিন্তু তাদের দোষ না থাকলেও নিজেই ফিরিয়ে দিয়েছে। ও যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠে নেমেছে— জকি। ঘোড়া নিয়ে অদক্ষ জকি ছুটছে এক দেশ থেকে আরেক দেশে। কারও দিকে চাওয়ার সময় নেই। কলাম্বিয়া থেকে বিজনেসের উপর ডিগ্রি করেছে। অথচ কোথাও থিতু না হয়ে, ভাল কোনও চাকরি না নিয়ে ছুটে চলেছে তৃতীয় বিশ্বের জেলেদের পিছনে; এর ওর কাছে জানতে চাইছে— আচ্ছা ভাই, আপনি কোন্ জায়গাটায় বেশি জাল খুইয়ে থাকেন!

খাবার প্রায় শেষ করে এনেছে কার্টা, ঠিক করে ফেলল বাড়ি ফিরে জীবন নিয়ে নতুন করে ভাববে। এটা কম নয় যে ছাব্বিশটি বসন্ত এল। এখন পিছন ফিরে চাইলে মনে হয় বহু বছর পার করে এসেছে। বেশিরভাগ বান্ধবী সংসার করছে। বাচ্চাগুলো ওকে আণ্টি বলে ডাকে! কিছু দিন আগেও ভেবেছে, ভাগ্য ও পরিশ্রম ওকে কর্পোরেট মইয়ের অনেক উপরে তুলে দেবে। কিন্তু এখন পরিষ্কার বুঝছে, গত ক' বছর শুধু জুয়াই খেলেছে।

এই যে নামিবিয়ায় আসা, এ-ও ছিল জুয়া খেলা। এ দেশে এসে কী পেল? ...কই, কিছুই না! নিজের উপর রাগ হচ্ছে— কী করে এতগুলো দিন ভুলের ভিতর পড়ে থাকল!

নিঝুম নির্জন সাগর থেকে ভেসে আসছে শীতল হাওয়া, শিউরে উঠল কার্টা। দেরি না করে সোয়েটার পরে নিয়ে বিল মিটিয়ে দিল, সঙ্গে মোটা টিপ্‌স্। গাইড বুকে পড়েছে নামিবিয়ায় ওয়েটাররা বকশিশ আশা করে না।

অন্য এক পথে হোটেলের দিকে পা বাড়াল কার্টা। ফিরবার পথে পুরনো শহরের একাংশ দেখবে। পেরুল দু' একটা

রেস্টুরেন্ট, ওখানে কাস্টমার নেই। রাস্তা ও ফুটপাথ ফাঁকা। আফ্রিকা মহাদেশের মান অনুযায়ী নামিবিয়া ধনী দেশ, কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বের তুলনায় কিছুই নয়। বেশিরভাগ লোক কাজ শেষে বাড়ি ফিরেছে। রাত আটটার আগেই ঘুমিয়ে পড়ে তারা। দু' একটা বাড়িতে বাতি জ্বলতে দেখল কার্টা।

হঠাৎ করেই থেমে গেছে ঠাণ্ডা হাওয়া, সচেতন হয়ে উঠল ও। পিছনে ওটা পায়ের শব্দ না? চট্ করে ঘুরে চাইল। পিছন বাঁকে ছায়ার মধ্যে সরে গেল কে যেন! যদি স্বাভাবিক ভাবে হাঁটত, ভয় পেত না কার্টা। কিন্তু সে গোপনে আসতে চাইছে! একবার চারপাশ দেখে নিল, ধড়ফড় করছে ওর বুক। আগে কখনও শহরের এ অংশে আসেনি।

সব অচেনা, কিন্তু চার বা পাঁচটা রাস্তা পেরুলে বামদিকে থাকবে হোটেল। ওটা ঝলমল করবে ব্যাহনহফ স্ট্রিটে। একবার ওই স্ট্রিটে পৌঁছতে পারলে আর কোনও ভয় নেই। দৌড়াতে শুরু করল কার্টা। কয়েক পা যেতে না যেতেই খুলে গেল ডান পায়ের স্যাণ্ডেল। থামল না, বাম পায়েরটাও ফেলে দিয়ে গতি বাড়াল। পিছন থেকে শোনা গেল ঘোঁৎ জাতীয় শব্দ। শিকার টের পেয়েছে অনুসরণ করা হচ্ছে। এবার মেইল ট্রেনের মত ছুটে এল লোকটা। পরিষ্কার পাওয়া গেল বুট জুতোর আওয়াজ।

প্রাণপণে ছুটতে চাইছে কার্টা, ফুটপাথের উপর থ্যাপ-থ্যাপ আওয়াজে পড়ছে পায়ের নরম পাতা। পৌঁছে গেল সামনের বাঁকে, নতুন করে ছুটবার আগে একবার পিছনে চাইল। একজন নয়, তেড়ে আসছে দু'জন! ওর ধারণা ছিল এরা জেলে, এদের কাছেই নানা কথা জানতে চেয়েছে; কিন্তু পিছনের ওরা শ্বেতাঙ্গ! একজনের হাতে মনে হলো পিস্তল!

বাঁক ঘুরেই ছুটবার গতি বাড়াল কার্টা। দৌড়ে হারাতে পারবে না অনুসরণকারীদেরকে, কিন্তু একবার হোটেলে পৌঁছলে কোনও

চিন্তা নেই। এরা নিশ্চয়ই হোটেলে ঢুকবে না? এখন আফসোস লাগছে স্পোর্টস ব্রা পরেনি বলে। বেসামাল হয়ে উঠছে দুই স্তন। পাশে রাস্তা দেখে সে-পথে চলল। আপাতত ওকে দেখতে পাবে না লোকগুলো। সরু এক গলি পেয়ে সেখানেই ঢুকে পড়ল। এই আঁধারে ওকে দেখবে না কেউ।

গলি শেষে সামনে অন্য রাস্তা। আঁধারে অ্যালিউমিনিয়ামের ক্যান দেখতে পেল না কার্টা। পায়ে লেগে ঠং-ঠনাৎ আওয়াজে ছিটকে সরে গেল ওটা। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের ব্যথায় ওর মনে হলো ওখানেই বসে পড়বে। রেগে গেল, কেন দেখতে পেল না! ঘণ্টির মত আওয়াজ করেছে ওটা। পরের রাস্তায় বেরিয়েই বামে মোড় নিল কার্টা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলেছে। লোকদুটো নিশ্চয়ই আওয়াজ পেয়েছে, এখন ধেয়ে আসবে! সামনে থেকে আসছে একটা গাড়ি। ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে পড়ল কার্টা, পাগলের মত নাড়ছে দু'হাত। গতি কমিয়ে এনেছে গাড়ি। ভিতরে এক দম্পতি, পিছন সিটে তাদের বাচ্চা।

স্বামীর কানের কাছে কী যেন বলল মহিলা।

অপরাধীর মত মুখ অন্যদিকে সরিয়ে নিল লোকটা, তারপর গতি বাড়িয়ে চলে গেল। মনে মনে মহিলাকে অভিশাপ দিল কার্টা। সাহায্য পাবে ভেবে মূল্যবান সময় নষ্ট করেছে। আবারও ছুটতে শুরু করল। শ্বাস নিতে গিয়ে জ্বলছে ফুসফুস, যেন ফেটেই যাবে বুক।

পাশের বাড়ি থেকে ছিটকে উঠল সিমেন্ট ও ইঁট। গর্জে উঠেছে পিস্তল। পিছন ফিরে চাইল না কার্টা, ওর মাথা থেকে মাত্র একফুট দূরের দেয়ালে লেগেছে বুলেট। বসে পড়তে ইচ্ছা হলো, কিন্তু না-থেমেই ছুটল ক্ষিপ্র গ্যাযেলের মত। এঁকেবেঁকে দৌড়াতে শুরু করে আশা করল, ওরা নিশানা ঠিক রাখতে পারবে না।

একটু দূরে সাইনবোর্ড দেখতে পেল: ওয়্যাসেরফল স্ট্রিট। তার মানে, মাত্র অর্ধেক ব্লক পেরুলেই হোটেল। কার্টা জানত না এত দ্রুত ছুটতে পারে, ও যেন ছুটন্ত কোনও রকেট— আধ মিনিট পেরুনোর আগেই ব্যাহনহফ স্ট্রিটে উঠে এল। সামনেই হোটেল, চওড়া লেন ধরে মন্থর গতিতে চলেছে গাড়িগুলো। প্রাক্তন রেলস্টেশন এখন বিলাসবহুল হোটেল। জ্বলজ্বল করছে অসংখ্য বাতি। ছুটন্ত গাড়িগুলোর ভিতর দিয়ে রাস্তা পেরুতে শুরু করল কার্টা, জোরালো হর্ন বাজিয়ে আপত্তি তুলছে ড্রাইভাররা। পাত্তাই দিল না কার্টা, এক দৌড়ে ঢুকে পড়ল হোটেলের এন্ট্র্যান্সে। ওখানে থেমে পিছনে চাইল। রাস্তার ওদিকে থেমেছে লোকদুটো, কড়া চোখে দেখছে ওকে। বামপাশের লোকটা জ্যাকেটের পকেটে রেখেছে পিস্তল। দুই হাত দিয়ে চোঙ তৈরি করল সে, গলা উঁচিয়ে বলল, 'এবার শুধু সাবধান করলাম! নামিবিয়া থেকে বিদায় হও, নইলে পরেরবার গুলি ফস্কাবে না।'

প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কাঁপছে শরীর, পাল্টা চিৎকার করল না, ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল কার্টা। দুই চোখ ফেটে নামল অশ্রু। হাপরের মত হাঁপিয়ে চলেছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর ওর দিকে এগিয়ে এল এক ডোরম্যান। 'আপনার কোনও সাহায্যে আসতে পারি, ম্যাম?'

'না, ধন্যবাদ, আমি ঠিক আছি,' উঠে দাঁড়িয়ে চোখ মুছে নিল কার্টা। ঘুরে চাইল রাস্তার দিকে। লোকদুটো চলে গেছে। টের পেল, কাঁপছে দুই হাঁটু। ঘুরে দাঁড়িয়ে রুমের দিকে চলল কার্টা, ঠিক করে ফেলেছে, কিছুতেই নামিবিয়া ছেড়ে যাবে না।

আট

পাথরের পুরু দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মেয়েটির প্রলম্বিত আর্তচিৎকার। সূর্যের ভয়ঙ্কর খর তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দেয়ালগুলো, কিন্তু আওয়াজ ঠেকাবার সাধ্য নেই। মেয়েটি এখন গুঙিয়ে চলেছে। শুনলে মনে হয় পাশের সেল থেকেই আসছে। প্রথম থেকেই মনোযোগ দিয়ে শুনেছে আসিফ হায়দার চৌধুরি, মেয়েটির ভীষণ যন্ত্রণার সাক্ষী। বারবার মনে মনে বলেছেঃ যদি পারতাম, তোমাকে রক্ষা করতাম!

গত এক ঘণ্টা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়েছে মেয়েটি। ধীরে ধীরে কমে এসেছে চিৎকার। পুরো সময় মাথা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থেকেছে আসিফ, ওর মনে হয়েছে বিস্ফোরিত হবে করোটি। সেলের কাঁচা মেঝের উপর বসেছে এখন, দুই হাতে ঢেকে রেখেছে কান। আর শুনতে চায় না মেয়েটির করুণ গোঙানি।

ভোর হতে না হতেই মেয়েটিকে নিয়ে গেছে তারা। তখনও এত উষ্ণ হয়ে ওঠেনি কারাগারের পরিবেশ। সেলের পুবের দেয়ালে অনেক উপরে কাঁচের জানালা দিয়ে এসেছে লালচে রোদ। তখন মনে হয়েছে, এই বন্দিত্ব বেশিক্ষণের জন্য নয়, এখনও বাঁচবার আশা আছে। যে সেল ব্লকে ওকে আটকে রেখেছে, ওটা পঞ্চাশ বর্গ ফুট আকারের, কমপক্ষে তিরিশ ফুট উঁচু ছাত। এখানে বেশ কয়েকটা সেল আছে। এক পাশে লোহার

শিক দিয়ে তৈরি দরজা। অন্য তিন দিক পাথরের। ছাতও পাথরের। উপরে রয়েছে দোতলা ও তৃতীয় তলা। রটআয়ার্নের প্যাঁচানো সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। বহু বছর ধরেই ব্যবহার করা হয়েছে এই কারাগার। কিন্তু লোহার শিকে মোটেই জং ধরেনি। বর্তমান বিশ্বের সুপার-ম্যাক্স প্রিযনের মতই দুর্ভেদ্য এ কারাগার।

যারা ওকে বন্দি করেছে, তাদের চেহারা দেখেনি আসিফ হায়দার চৌধুরি। ওদের মুখে স্কি মাস্ক ছিল। একটা ভ্যান পাশ থেকে ওর গাড়িকে গুঁতো দিয়ে রাস্তা থেকে নামিয়ে দিয়েছে। এরপর গাড়ি থেকে বের করে ওকে ঘিরে ধরল কমপক্ষে তিনজন লোক। দুজন ধরল দুই হাত, অপরজন একটা রুমাল চেপে ধরল নাক-মুখের উপর। একটু ছটফট করেই জ্ঞান হারাল সে। চেতনা ফিরল বিমানে। দৈহিক আকৃতি দেখে ওই তিনজনের কথা মনে রেখেছে। একজন শ্বেত ভালুকের মত প্রকাণ্ড। হেলেদুলে হাঁটে। পরনে ছিল স্লিভলেস অ্যাথলেটিক টি-শার্ট। দ্বিতীয়জন হালকা-পাতলা, উজ্জ্বল নীল রঙের চোখ। তৃতীয়জনের হাঁটা দেখে বুঝেছে, একটা পায়ে ডিফেক্ট আছে।

তিনদিন হলো ওদেরকে বন্দি করেছে, এর ভিতর একটা কথাও বলেনি লোকগুলো। প্লেন থেকে নামিয়ে ভ্যানে তোলে, জোর করে খুলে নেয় পোশাক। দেয়া হয় জাম্পসুট। তার আগেই কেড়ে নিয়েছে কলম, আঙটি, ঘড়ি— সবই। জুতোর বদলে দেয়া হয়েছে রাবারের ফ্লিপ-ফ্লপ। এখানে আসবার পর থেকে দিনে দু'বার করে খাবার দেয়া হচ্ছে। আসিফের সেলের মেঝেতে একটা গর্ত, ওটাই টয়লেটের সুব্যবস্থা। বাইরে যখন ঝাড়তে থাকে দামাল হাওয়া, ওই গর্ত দিয়ে আসে উষ্ণ বাতাস, সঙ্গে বালি-কণা। খাবার দেয়ার সময় ছাড়া কখনও আসে না প্রহরীরা।

তারপর আজ এল তারা, নিয়ে গেল ক্যারেন ফুম্বসকে। অন্য এক ব্লকে আটকে রেখেছিল বেচারিকে; ওর সঙ্গে কোনও কথাও

হয়নি তার। ভোরে শুনল তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। আসিফ তখন আন্দাজ করেছে, ক্যারেনের চুলের গোছা ধরে টেনে দাঁড় করানো হয়েছে। তারপর ওর সেলের সামনে দিয়ে ছেঁচড়ে নিয়ে গেল। তখন শিকের গরাদে গাল চেপে দেখতে চেয়েছে আসিফ। ওদিকে রয়েছে একটা লোহার দরজা, তাতে পিপহোল।

মড়ার মত ফ্যাকাসে ছিল ক্যারেন, ভেজা চোখে ছিল ভীষণ আতঙ্ক। ওর নাম ধরে ডেকেছে আসিফ, দৌড়ে চলে গেছে শিকের গরাদের পাশে, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সহানুভূতি দেখাবার জন্য। তখন প্রহরীদের ভিতর যে সবচেয়ে বেঁটে, সে শিকের গরাদের উপর ধাঁই করে চালিয়েছে খাটো লাঠি। ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসেছে আসিফ। ওর চোখের সামনে টেনে নিয়ে গেছে ওরা ক্যারেনকে। তারপর ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়ে উঠেছে সেলের আবহাওয়া। আসিফ ধারণা করেছে, ক্যারেনকে নিয়ে যাওয়ার পর চার ঘণ্টা পেরিয়েছে। প্রথমে কোনও আর্তচিৎকার বা আহাজারি ছিল না, তারপর শুরু হলো। সেটা এক বা দু' ঘণ্টা আগের কথা। ভাবতে গিয়ে চমকে গেল আসিফ— দুই ঘণ্টা, ওরা বেচারিকে দুই ঘণ্টা ধরে অত্যাচার করছে! হায় আল্লাহ্!

কিডন্যাপ্‌ড্ হওয়ার এক ঘণ্টা পর পর্যন্ত আসিফ ভেবেছে, এরা টাকার জন্য এ কাজ করেছে, মুক্তিপণ পেলেই ওদেরকে ছেড়ে দেবে। সুইস কর্তৃপক্ষ কখনও কিডন্যাপারদের সঙ্গে রফা করে না, তবে ওই দেশে বিশেষ কয়েকটি কোম্পানির কাজই শুধু কিডন্যাপারদের সঙ্গে আপোষ করা। ইদানীং ইতালিতে একের পর এক নামী লোক কিডন্যাপ্‌ড্ হয়েছেন, এটা মাথায় রেখে বোর্ড অভ ডিরেক্টর্সকে আগেই জানিয়ে রেখেছে আসিফ, ওকে কখনও কিডন্যাপ করা হলে যত টাকাই চাওয়া হোক, মুক্তিপণ দিতে যেন দেরি না হয়।

ওকে চোখ বেঁধে বিমানে তুলেছে। এরপর অন্তত ছয় ঘণ্টা

আকাশে ছিল ওরা। এই ছয় ঘণ্টা নরকে থেকেছে আসিফ। কিছুই বুঝতে পারেনি কী করতে চলেছে এরা। একজনও একটা কথা বলেনি। আসিফের পাশেই ছিল ক্যারেন, ভোরে ফিসফিস করে আলাপ করেছে ওরা। কেউ নিশ্চিত নয় কী ঘটতে চলেছে। ক্যারেন বলেছে, এরা টাকার জন্য কিডন্যাপ করেছে। বাধ্য হয়ে ওকে ধরেছে, নইলে সাক্ষী রয়ে যেত। এ কথাগুলো শুনে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি আসিফ। আসিফ হায়দার চৌধুরি-নিকোলাস ক্রিস্টোফার ল্যাবোরেটরিজের কোনও ডিরেক্টরের সঙ্গে ওকে যোগাযোগ করতে বলেনি কিডন্যাপাররা। এখনও চাওয়া হয়নি মুক্তিপণ। ওর কোম্পানির কেউ জানে না এখনও বেঁচে আছে ক্যারেন এবং ও। কয়েক বছর আগে রুডিমেণ্টারি এগযেকিউটিভ সিকিউরিটি কোর্স করেছে আসিফ, ফলে কিডন্যাপিঙের বিষয়ে যেটুকু বুঝেছে, ওর মনে হয়েছে, এটা সাধারণ কোনও মুক্তিপণের কেস নয়।

আর এখন শুরু করেছে অত্যাচার।

বেচারি ক্যারেন কুম্বস! অতি বিশ্বস্ত, কাজে মন ঢেলে দেয়া এক সুযোগ্য কর্মী; টেস্ট টিউব ও বিকার ছাড়া কী-ই বা বোঝে সে! কয়েক সপ্তাহ আগের সেই আলাপ মনে পড়ল আসিফের। ক্যারেন চেয়েছে, ওর প্ল্যাঙ্কটন থামিয়ে দেবে ভয়ঙ্কর সব অয়েল স্পিল। আসিফ ওকে বলেনি, ওর ওই অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তা-ও ওকে প্রশংসা করে উৎসাহিত করেছে। অন্তত এক শ'বার অন্য কর্মীদের এভাবে সাহস দিয়েছে— মন দিয়ে কাজ করো, একদিন না একদিন কপাল খুলবে। ক্যারেনের ভাগ্য ভাল সাইকিয়াট্রিস্ট লাগেনি, ছোটবেলার ভয়ঙ্কর সব দৃশ্য ভুলতে পেরেছে, নিজের মনে কাজ করেছে ল্যাবোরেটরিতে।

মেয়েটির প্রজেক্টের কথা ভাবতে গিয়ে অন্য প্রজেক্ট মনে

আসছে। জেলে বন্দি হওয়ার পর থেকেই বারবার ওসব নিয়ে ভাবছে সে। এমন কোনও প্রজেক্ট নেই যেটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ওরা কোনও পেটেন্ট করছে না, দারুণ কোনও আবিষ্কারও হয়নি। কাজেই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এসপিয়োনাজ হওয়ার কথা নয়। সত্যি বলতে, নিকোলাস ও সে সালফার স্ক্রাবার আবিষ্কার করবার পর, ওদের ল্যাবোরেটরিতে অতটা বৈপ্লবিক কিছু আবিষ্কার হয়নি, তবে যা হয়েছে, আগের মত তেমন হুড়মুড় করে টাকা না এলেও এখনও যথেষ্ট ভাল টাকা আসছে। নিকোলাস চলে যাওয়ার পরে আসিফ নিজেও নতুন নতুন আবিষ্কারের আগ্রহ হারিয়েছে। তবে এখনও কেমিস্ট্রি রিসার্চের পিছনে প্রচুর পয়সা খরচ করছে ও। আসলে ও এই জগৎ থেকে একেবারে বিদায় নিতে চায় না।

তীক্ষ্ণ একটানা আর্তনাদ শোনা গেল, তারপর হঠাৎ করেই সব থেমে গেল। গোঙানি শুনতে খারাপ লাগছিল, কিন্তু চারপাশ নীরব হয়ে যেতেই শুকিয়ে গেল আসিফের বুক।

মেরেই ফেলল মেয়েটিকে?

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল আসিফ, দৌড়ে গিয়ে গরাদে গাল ঠেকিয়ে দেখতে চাইল ওদিকের সেল ব্লক। দু' মিনিট পেরুল, তারপর বোল্ট টেনে খুলবার খট-খটাং আওয়াজ হলো। ক্যাচকোঁচ শব্দে খুলে গেল লোহার দরজা, ক্যারেনকে দেখতে পেল আসিফ।

মেয়েটির শিথিল দুই হাত কাঁধে তুলে নিয়েছে দুই গার্ড, অন্য হাতে জড়িয়ে ধরেছে কোমর। এদের পর বেরিয়ে এল তৃতীয় গার্ড, হাতে বড় চাবির গোছা। লোকদুটো প্রায় ঝুলিয়ে আনছে ক্যারেনকে, ছেঁচড়ে চলেছে দুই পা। চুলে রক্ত ও ধুলোর কালচে কাদা। হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে দেয়া হয়েছে জাম্পসুটের গলা। বুকের উপর অংশ বেগুনী ও লাল, দগদগ করছে ঘায়ের মত।

আসিফের সেল পেরুতে শুরু করেছে গার্ডরা। এর ভিতর

একবার কোনওমতে মুখ তুলে বসকে দেখল ক্যারেন। হতবাক হয়ে গেছে আসিফ। লাল-বেগুনি-কালো রঙে বদলে গেছে মেয়েটির মুখ। বেচারিকে প্রচণ্ড ভাবে পেটানো হয়েছে। ডান চোখ ফুলে বুজে গেছে। বাম চোখ এখনও খুলছে, তবে ভারী হয়ে উঠেছে পাতা। ফাটা দুই ঠোঁট থেকে গড়িয়ে নামছে রক্ত ও লালা। আসিফের দিকে চাওয়ার সময় সামান্য প্রাণ পেল ক্যারেনের চোখ।

'হায় আল্লাহ্, ক্যারেন!' আর কিছু বলতে পারল না আসিফ হায়দার। ঠেকাতে পারল না অশ্রু, গাল বেয়ে দরদর করে নামল লোনা জল। ক্যারেন যদি অচেনা কেউ হোত, তাও কাঁদত আসিফ। বুক ভেঙে যাচ্ছে, মেয়েটি ওরই কর্মচারী, ওরই উপর ভরসা রেখে রিসার্চের কাজ করছিল, কিন্তু তাকে রক্ষা করতে পারেনি সে।

রক্তের একটা দলা থুহ্ করে মেঝেতে ফেলল ক্যারেন, ফুঁপিয়ে উঠল, 'স্যর... ওরা... আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি... স্যর...'

'কুকুরের বাচ্চারা!' গর্জে উঠল আসিফ। 'কত টাকা চাই তোদের! এই মেয়ে তো কোনও দোষ করেনি!'

লোকগুলো যেন বধির, কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না। ছেঁচড়ে নিয়ে গেল ক্যারেনকে, পাঁচ সেকেণ্ড পর তাদের আর দেখা গেল না। একটু পর ঘটাং করে খোলা হলো দূরের এক সেলের দরজা। বোধহয় ক্যারেনকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলেছে, কারণ পরক্ষণে দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ এল।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল আসিফ, লোকগুলো ওকে নিতে এলে প্রাণপণ লড়বে। যদি গায়ে হাত তোলে, পাল্টা মারবে ও। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল আসিফ। দুই হাত মুঠো পাকিয়ে গেছে। আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে কাঁধ। আয়, কুকুরের বাচ্চারা, এমনি এমনি

ওদের ছেড়ে দেব না।

একটু পর উজ্জ্বল নীল চোখের গার্ড ফিরে এল, হাতে কী যেন। জিনিসটা কী বুঝবার আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেল গার্ডের হাতে। তাক করেই ট্রিগার টিপে দিল। টেযার ওটা, এক পলকের জন্য পঞ্চাশ হাজার ভোল্ট বিদ্যুৎ বয়ে গেল আসিফের দেহে। সঙ্গে সঙ্গে বিকল হলো নার্ভাস সিস্টেম, তীব্র ব্যথা শুরু হয়েই থেমে গেল। আড়ষ্ট হয়ে এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল আসিফ, তারপর ধড়াস্ করে পড়ল মেঝের উপর। বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরতে লাগল চেতনা। ততক্ষণে ওকে বের করে আনা হয়েছে সেল থেকে, টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রধান দরজার কাছে। তখনও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ব্যথা দূর হয়নি, বুঝল এই অবস্থায় মোটেই লড়তে পারবে না।

নয়

চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কার্টা অস্টিন, বেসবল ক্যাপ না থাকলে দামাল হাওয়ায় উড়াল দিত দীর্ঘ, লালচে চুলগুলো। চোখে র‍্যাপঅ্যারাউণ্ড ওকলে সানগ্লাস, দুই ডাঁটি থেকে মাথার পিছনে চলে গেছে রঙিন কর্ড, টানটান হয়ে আছে। মুখের অন্য অংশে পুরু করে মেখেছে এসপিএফ ৩০ মলম। পরনে ওর খাকি হাফপ্যাণ্ট ও বড় পকেটওয়ালা বুশ শার্ট। পায়ে ক্যানভাসের বোট শু। সোনালী রোদে দু-পায়ের ফর্সা গোড়ালিতে চকচক্ করছে

সোনার নূপুর। সাগরে বিশ নট গতি তুলে ছুটছে ওদের ফিশিং বোট।

সাগর বা নদীতে এলেই নিজেকে কিশোরী মনে হয় ওর। মনে পড়েঃ বাবার চার্টার বোট নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। উনি অসুস্থ হওয়ার পর ব্যবসা বুঝে নিল, তখন বাজে কিছু অভিজ্ঞতা হয়। যারা বোট ভাড়া নিত, তাদের কেউ কেউ মাতাল হয়ে আসত, এবং মাছ পাওয়ার বদলে ওকে নিজেদের জালে তোলবার জন্য পাগল হয়ে উঠত। সেসব বাজে পরিস্থিতি বাদ দিলে বাকি সময় ভালই কেটেছে। সাগরের এই নোনা গন্ধে ওর মন শান্ত হয়, অসীম দিগন্তের দিকে ছুটতে ছুটতে গুছিয়ে নিতে পারে নিজের ভাবনাগুলোকে।

এখন সাগরে যে চার্টার বোট নিয়ে চলেছে ওরা, ওটার মালিক এক নামিবিয়ান ক্যাপ্টেন। হাসিখুশি, বয়স্ক মানুষ, কী করে যেন বুঝে ফেলেছেন এই মেয়ে ভালবাসে সাগরকে। যতবার দু'জনের চোখে চোখ পড়েছে, খুশি হয়ে হেসেছেন ভদ্রলোক। হেসেছে কার্টাও, ওর মনে পড়েছে বাবার কথা, তিনিও ঠিক এভাবেই ওর দিকে চেয়ে হাসতেন, মাথাটা এপাশ-ওপাশ দুলিয়ে বলতেনঃ পাগলি।

ট্র্যানসমের নীচে গর্জে চলেছে টুইন কামিন্স ডিজেল ইঞ্জিন, অসম্ভব হয়ে উঠেছে কথা বলা। চেয়ার ছাড়লেন ক্যাপ্টেন, হাতের ইশারায় কার্টাকে কন্ট্রোল বুঝে নিতে বললেন। খুশি হয়ে হেসে ফেলল কার্টা। কমপাসের উপর টোকা দিলেন ভদ্রলোক, দেখিয়ে দিলেন ওরা কোনদিকে চলেছে, তারপর সরে গেলেন হুইল থেকে। তাঁর চেয়ারে এসে বসল কার্টা, আস্তে করে হাত রাখল মসৃণ হুইলের উপর।

কয়েক মিনিট চুপ করে দেখলেন ক্যাপ্টেন। পানি চিরে ছুটে চলেছে ছেচল্লিশ ফুটি বোট। পিছনে ফেলে আসছে সাদা রঙের

সরল রেখার ঢেউ। পুরো সন্তুষ্ট হয়ে সরলেন তিনি, কয়েক ধাপ নেমে চলে এলেন ডেকে। কাছেই একটা ফাইটিং চেয়ারে কুঁজো হয়ে বসে আছে কুবলিকি, এক হাতে টিপছে কপাল। গতকাল ক্যাসিনোয় অনেক বেশি গিলে ফেলেছে। ভাবতেও পারেনি আজ বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে। সকালে দরজায় টোকার আওয়াজে উঠতেই হলো। তারপর কার্টা অস্টিনের কথায় আসতে হলো সাগরে।

যদি গতকাল ওই দুই বদমাস ধাওয়া না করত, জেদ ধরত না কার্টা। ওর মনে হয়েছে সঠিক পথেই চলেছে, এখন এইচএমএস চ্যালেঞ্জারকে খুঁজে পাওয়া শুধু সময়ের ব্যাপার। নইলে ওকে সরিয়ে দিতে চাইত না লোকগুলো। কুবলিকিকে হামলার কথা বলেনি কার্টা, সকালে প্রথমে ফোন করেছে বসের কাছে, খুলে বলেছে কী ঘটেছে। ভদ্রলোক চিন্তিত হয়ে পড়েন ওর জন্য, তবে এ দেশে আরও একটি দিন থাকার অনুমতি দেন । কার্টা চাইলে দাদু এবেলের বলা সাগরের ওই অংশে যেতে পারে, তদন্ত করে দেখতে পারে সত্যি আছে কি না ধাতুর সাপ।

অন্তরের গভীরে জানে কার্টা, মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে। বুদ্ধিমান কেউ এ ধরনের হুমকি শুনলে ফিরে যেত নিজ দেশে। কিন্তু ওর ধাত অমন নয়, কোনও কিছুর শেষ না দেখে ছাড়ে না। কখনও অনাকর্ষণীয় কোনও বই কিনে মাঝপথে বাদ দেয়নি, শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখেছে। যতই জটিল হোক ক্রসওয়ার্ড, প্রতিটি সূত্র খুঁজে বের করেছে। কাজ যতই কঠিন হোক, পিছু-পা হয়নি। ওর এই জেদ আছে বলেই ঠিক করেছে যতই বাধা আসুক, ঠিকই খুঁজে বের করবে জাহাজটাকে।

বোট চার্টার করবার সময় সতর্ক থেকেছে কার্টা, আগে ম্যাপ তৈরি করবার সময় যেসব ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলেছে, তাদেরকে এড়িয়ে গেছে। হোটেল থেকে বেরিয়ে মিশে গেছে বড়

একদল টুরিস্টের সঙ্গে। চলে এসেছে সাগর-তীরে, বাসে উঠে নিশ্চিত হয়েছে কেউ পিছু নেয়নি। সন্দেহজনক কেউ থাকলে বোট নিয়ে সাগরে বেরুত না ও।

এরপর বোট নিয়ে তীর থেকে কয়েক মাইল সাগরে চলে আসবার পর ক্যাপ্টেনকে বলেছে, আসলে কোথায় যেতে চায়। ক্যাপ্টেন বলেছেন কার্টা সাগরের যে অংশে যেতে চাইছে, সেখানে মাছ বা মেরিন লাইফ নেই। তবে পয়সা যখন কার্টা দেবে, ওদিকে যেতে আপত্তি তুলবেন না তিনি।

এসব ছয় ঘণ্টা আগের কথা। এরপর এক এক করে বহু মাইল পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। ধীরে ধীরে শান্ত হয়েছে ওর স্নায়ু। যে লোকদুটো হোটেল পর্যন্ত ধাওয়া করেছে, তারা হয়তো ভেবেছে ভয় পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে ও।

কিছুক্ষণ হলো ফুলে উঠেছে আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণ থেকে বাড়ছে হাওয়ার বেগ। মন্থর গতিতে আসছে একের পর এক বিশাল ঢেউ, যেন দোলনায় তুলে দুলিয়ে চলেছে বোটটাকে। স্টারবোর্ডের তলা দিয়ে পেরুচ্ছে ঢেউগুলো। প্রতিবার ভারসাম্য রেখে এগিয়ে চলেছে বোট। নীচের ডেক থেকে উঠে এলেন ক্যাপ্টেন, একটু পিছনে এসে দাঁড়ালেন। মেয়েটির হাত থেকে নিলেন না হেলম। একটা বেঞ্চ সিটের নীচ থেকে বের করলেন বিনকিউলার, চোখে লাগিয়ে দিগন্তের দিকে চাইলেন। কয়েক মুহূর্ত পর ওটা মেয়েটির হাতে ধরিয়ে দিলেন, হাতের ইশারায় দক্ষিণ-পশ্চিম দেখালেন।

বিনকিউলার অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে চোখে লাগাল কার্টা। ওই যে দূর দিগন্তে দেখা যাচ্ছে জাহাজটা। মালবাহী, একটি মাত্র চিমনি, চলেছে ওয়ালভিস বে-র দিকে। এতই দূরে, বিনকিউলার দিয়েও পরিষ্কার কিছু দেখা গেল না। জাহাজটার খোল কালচে, ডেকের উপর বুম ও ডেরিকের ঘন জঙ্গল।

'আগে কখনও এদিকের সাগরে জাহাজ দেখিনি,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'ওয়ালভিস বে-তে থামে শুধু কোস্টার, নইলে ক্রুজ শিপ। এত গভীর সাগরে আসে না জেলেরা। ওদিকে কেপ ঘুরে চার বা পাঁচ শ' মাইল দূর দিয়ে যায় ট্যাঙ্কারগুলো।'

মহাসাগরে রয়েছে অসংখ্য শিপিং লেন, প্রতিটি ইন্টারস্টেট হাইওয়ের মত চিহ্নিত। এসব লেনে কঠোর ভাবে দিক ও সময় মেনে চলে জাহাজগুলো। সুপারট্যাঙ্কার সাগরে চলতে হলে তাদের খরচ হয় দিনে কমপক্ষে এক লাখ ডলার। প্রতিটি জাহাজ সরাসরি গন্তব্য লক্ষ্য করে চলে। সরলেও বড়জোর এক বা দুই মাইল সরে। প্রতিটি লেনে থাকে প্রচুর জাহাজ, কিন্তু ওখান থেকে বছরে একটা জাহাজও সত্যিকারের নির্জন সাগরে যায় না। কার্টা অস্টিনের চার্টার বোট এখন ঠিক তেমনি একটি ডেড জোনে। কখনও এদিকে আসে না উপকূলীয় ফ্রেইটার, তীরের পাশ ঘেঁষে যাওয়া-আসা তাদের।

'আরও একটা ব্যাপার অস্বাভাবিক,' বলল কার্টা। 'জাহাজের চিমনি দিয়ে কোনও ধোঁয়া উঠছে না। আপনার কি মনে হয়, ক্যাপ্টেন, ওটা পরিত্যক্ত? হতে পারে কোনও বড় ঝড়ে পড়েছিল, বাধ্য হয়ে ওটাকে ত্যাগ করেছে ক্রুরা।'

মই বেয়ে উঠে এসেছে কুবলিকি।

রহস্যময় জাহাজ নিয়ে ভাবছে কার্টা। কী ঘটেছে জাহাজের ক্রুদের? আনমনে চেয়ে রইল জাহাজের দিকে, খেয়াল করেনি পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে কুবলিকি। লোকটা ওর কাঁধে হাত রাখতে চমকে গেল কার্টা।

'সরি,' বলল কুবলিকি। 'আমাদের পিছনে দেখুন। ওদিক থেকে আসছে একটা বোট।'

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল কার্টা। ওর হাত ছিল হুইলের উপর, নড়ে গেল ওটা। ভীষণ ভাবে পোর্টসাইডে দুলে উঠল বোট।

খোলা সাগরে দূরত্ব বোঝা খুবই কঠিন, তবে ওই বোট বড়জোর কয়েক মাইল পিছনে আসছে। চার্টার বোটের চেয়ে ওটার গতি অনেক বেশি। ক্যাপ্টেনের হাতে বিনকিউলার তুলে দিল কার্টা, সহজ ভঙ্গিতে ঠেলে দিল ক্রোম থ্রটলের হ্যাণ্ডেল। দেখতে না দেখতে পূর্ণ গতি পেল বোট।

'কী করছেন?' চেঁচিয়ে উঠল কুবলিকি। গতি বেড়ে যেতেই একটু কুঁজো হয়ে গেছে সে।

মেয়েটির উদ্বেগ টের পেয়েছেন ক্যাপ্টেন, তবে তখনই কিছু বললেন না। বিনকিউলার তুলে দেখছেন পিছনের বোট।

'আপনি চিনতে পেরেছেন ওটা?' জানতে চাইল কার্টা। 'মালিক কে?'

'ঠিকই চিনেছি। মাসে একবার আসে ওয়ালভিস বে-তে। খুব দ্রুতগামী ইয়ট। লম্বায় পঞ্চাশ ফুট মত। ওটার নাম বা মালিকের নাম জানি না।'

'ওখানে চেনা কাউকে দেখছেন?'

'আপার ব্রিজে কয়েকজন, সবাই শ্বেতাঙ্গ।'

'আমি জানতে চাই এখানে কী ঘটছে!' জেদি বাচ্চার মত চেঁচিয়ে উঠল কুবলিকি, করমচার মত লাল হয়ে গেছে মুখ।

তাকে পাত্তা দিল না কার্টা, বুঝে গেছে ওই ইয়টে কারা থাকতে পারে। হুইল ঘুরিয়ে দিক বদলে নিল, সোজা চলল দূরের ওই ফ্রেইটারের দিকে। প্রার্থনা করছে, ওই জাহাজে মানুষ থাকুক, সেক্ষেত্রে সাক্ষীর সামনে কিছুই করবে না পিছনের লোকগুলো। ওরা যদি খোলা সাগরে ছুটতে থাকে, সহজেই ওদের ধরে ফেলবে, এবং মেরেও ফেলতে পারে। সাগরে লাশ ফেলে দেবে, ডুবিয়ে দেবে ফিশিং বোট— কে ঠেকাবে তাদের? থ্রটল শেষ প্রান্তে ঠেলে দিল কার্টা, দুই ইঞ্জিনের কাছ থেকে আরও শক্তি চাইছে। কিন্তু আগেই পূর্ণ গতি তুলেছে ইঞ্জিন, নতুন কিছু দেয়ার

নেই। নীরবে প্রার্থনা করছে কার্টা: ঈশ্বর, যেন পরিত্যক্ত না হয় ওই ফ্রেইটার। নইলে সহজেই হাজির হবে লোকগুলো এবং মেরে ফেলবে ওদেরকে।

খপ্ করে ওর বাহু ধরল কুবলিকি, জ্বলছে দুই চোখ। 'মিস অস্টিন, খুব বাড়াবাড়ি করছ, খুলে বলো কী হয়েছে। কারা ওরা?'

'গতরাতে যারা হোটেল পর্যন্ত ধাওয়া করেছে, তারাই।'

'ধাওয়া করেছে? তোমাকে?'

'একবার তো বললামই,' ধমকের সুরে বলল কার্টা। 'দুই লোক হোটেল পর্যন্ত এসেছে। তাদের একজনের হাতে পিস্তল ছিল। আমাকে হুমকি দিয়েছে যেন এই দেশ ছেড়ে চলে যাই।'

ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছেন ক্যাপ্টেন। বোঝা গেল না কী ভাবছেন।

রন কুবলিকির সাধারণ রাগ এখন ভয়ঙ্কর ক্রোধে পরিণত হয়েছে। 'তুমি আমাকে একবারও বলোনি! তুমি পাগল নাকি, মিস অস্টিন? সশস্ত্র লোকের ধাওয়া খেয়েছ, এরপরও আমাদের নিয়ে এসেছ সাগরে মরতে! হায় ঈশ্বর! বোকা মেয়েলোক!'

'খবরদার, মুখ খারাপ করবে না!' ধমক মারল কার্টা। তারপর বলল, 'আমি ভেবেছি ওরা পিছু নেবে না। মস্ত ভুল হয়েছে। এখন যদি ফ্রেইটারের কাছে যেতে পারি, লোকগুলো আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।'

কুবলিকির মুখ থেকে ছিটকাল থুতু। 'জাহাজটা যদি ওখানে না থাকত?'

'ভেবে কী হবে? ওটা ওখানে আছে।'

ক্যাপ্টেনের দিকে চাইল কুবলিকি। 'আপনার সঙ্গে কোনও অস্ত্র আছে?'

আস্তে করে মাথা দোলালেন নামিবিয়ান ক্যাপ্টেন। 'হাঙর এলে ব্যবহার করি।'

'ঈশ্বরের শপথ, ওটা নিয়ে আসুন। যে-কোনও সময়ে লাগবে।'

একটু আগে ঢেউয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে বোট, কিন্তু এখন বদলে গেছে গতিপথ। সরাসরি সামনে পড়ছে একের পর এক ঢেউ। বিপুল পানি চিরে ছুটছে বোটের বো। লাফ দিয়ে ঢেউয়ের উপর উঠছে, আবার ধড়াস্ করে নামছে। চারপাশে ছিটকাচ্ছে সাদা ফেনা। রুক্ষ সাগরে লাফ দিতে দিতে চলেছে বোট। ঝাঁকি সামলে নিতে দুই হাঁটু একটু ভাঁজ করে দাঁড়িয়েছে কার্টা। নীচ থেকে ঘুরে এলেন ক্যাপ্টেন, নীরবে ওর হাতে তুলে দিলেন পুরনো বারো বোরের বন্দুক ও কয়েকটি শেল। কী করে যেন বুঝে গেছেন, কুবলিকিকে দিয়ে কিছু হবে না। কার্টা সরে যেতেই হেলম ধরলেন ক্যাপ্টেন। মৃদু কিছু পরিবর্তন আনলেন, এবার পূর্ণ গতিতে ছুটবে বোট। এরই ভিতর কমপক্ষে এক মাইল এগিয়ে এসেছে বিলাসবহুল ইয়ট। মনে হলো না ফ্রেইটার একটু কাছেও এসেছে।

বিনকিউলার দিয়ে বিশাল কার্গো শিপ দেখল কার্টা, দমে গেল ওর মন। জাহাজ অতি পুরনো, ঠিক ভাবে রিপেয়ার করা হয়নি কোনদিন। খোলে কয়েক রকমের রং। কোথাও কোথাও স্টিলের প্লেট লাগানো। ডেকে কেউ নেই। ব্রিজও খালি। বো থেকে সরছে সাদা ফেনা, দেখলে মনে হয় জাহাজ চলছে, কিন্তু তা হতে পারে না, চিমনি থেকে কোনও ধোঁয়া উঠছে না।

'আপনার কোনও রেডিও আছে?' ক্যাপ্টেনের কাছে জানতে চাইল কার্টা।

'কেবিনে,' বললেন ভদ্রলোক। 'তবে ওয়ালভিস বে পর্যন্ত ওটার রেঞ্জ নেই।'

ফ্রেইটারের বো-র দিকে আঙুল তুলল কার্টা। 'আমি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই। বোর্ডিং ল্যাডার নামিয়ে দিলে

উঠতে পারব।'

কাঁধের উপর দিয়ে ইয়ট দেখলেন ক্যাপ্টেন। 'প্রায় একই সময়ে পৌঁছুব আমরা।'

সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে গেল না কার্টা, দু'দিকের রেলিং ধরে পিছলে নামল ডেকে। এক দৌড়ে পৌঁছে গেল কেবিনে। নিচু সিলিঙের ঘরে এক দেয়ালে ঝুলছে পুরনো ট্র্যান্সিভার। ওটা চালু করল কার্টা, নব ঘুরিয়ে ষোলো নম্বর চ্যানেলে নিল। ওটাই ইন্টারন্যাশনাল ডিসট্রেস ব্যাণ্ড।

'ওয়ালভিস বে-র দিকে যাওয়া ফ্রেইটার, মেডে, মেডে, মেডে, এটা ফিশিং ভেসেল হিল্ডা। আমাদের দিকে ছুটে আসছে জলদস্যুরা। দয়া করে জবাব দিন।'

কেবিন ভরে উঠল স্ট্যাটিকের শব্দে।

রেডিওর ডায়াল অ্যাডজাস্ট করল কার্টা, নব টিপে চালু করল মাইক্রোফোন। 'এটা ফিশিং বোট হিল্ডা, ওয়ালভিস বে-র দিকে যাওয়া অচেনা ফ্রেইটার, দয়া করে সাড়া দিন। আমাদের সাহায্য দরকার... দয়া করে সাড়া দিন।'

আবারও স্ট্যাটিক শুরু হলো। তার ভিতর দিয়ে ভেসে এল ভুতুড়ে এক কণ্ঠ। বোটের ঝাঁকির ভিতর দক্ষ সার্জেনের আঙুলের মত নড়ছে কার্টার আঙুল, সামান্য ঘোরাল ডায়াল, তারপর স্পিকার থেকে ভেসে এল জোরালো কণ্ঠ।

'গতকাল সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, নামিবিয়া ছাড়লে আজ মরতে হতো না তোমাকে।'

নানা আওয়াজের ভিতর ওই কণ্ঠ চিনল কার্টা। গতরাতে ওকে হুমকি দিয়েছে এই লোক। ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চাইল ওর দেহের রক্ত।

মাইক্রোফোন চালু করল কার্টা। অনুনয়ের সুরে বলল, 'আমাদের পিছু ছাড়ুন, আমরা তীরে ফিরব। ঈশ্বরের শপথ, প্রথম

বিমানে চেপে এ দেশ ছাড়ব!'

'তোমাদের সে সুযোগ আর নেই।'

ট্র্যানসমের উপর দিয়ে চাইল কার্টা। অনেক কাছে চলে এসেছে ইয়ট। এখন বড়জোর কয়েক শ' গজ দূরে। ব্রিজে দু'জন লোককে দেখল, হাতে রাইফেল। ওদিকে কমপক্ষে এক মাইল দূরে ফ্রেইটার।

না, ওরা কোনও ভাবেই অত দূর পৌঁছুতে পারবে না।

'মাসুদ ভাই, কী মনে হয়?' কমিউনিকেশন্স স্টেশন থেকে জানতে চাইল রায়হান রশিদ।

সিট থেকে ঝুঁকে এসেছে মাসুদ রানা, আর্ম রেস্টে রেখেছে বাম কনুই, ডান হাতে হাতড়ে নিল খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাস্তুলের ক্যামেরা থেকে আসা যায়রো-স্ট্যাবিলাইযড্ ভিডিও সব নিখুঁত ভাবে দেখিয়ে চলেছে মস্ত স্ক্রিনে। দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস লক্ষ্য করে আসছে দুটো জলযান। বিশ নট গতি তুলেছে ফিশিং বোট। মোটর ইয়ট আসছে কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ নট গতিতে।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে রেইডারে ওই দুই জলযান দেখেছে ওরা। কোনও গুরুত্ব দেয়া হয়নি। ফিশিং গ্রাউণ্ড হিসাবে নামিবিয়ার উপকূল বিখ্যাত, এদিক দিয়ে যেতেই পারে জেলে-নৌকা বা ট্রলার। আগে খেয়াল দেয়া হয়নি, কিন্তু এখন ফিশিং বোট হিল্ডা আসছে ঠিক মার্ভেল লক্ষ্য করে। রানা ছিল নিজ কেবিনে, এক ঘণ্টা ব্যায়াম শেষে শাওয়ার নেবে, এমন সময় যোগাযোগ করল সোহেল।

'জানি না কী ভাবা উচিত,' একটু পর বলল রানা। 'মিলিয়ন ডলারের ইয়ট নিয়ে পুরনো ফিশিং বোট ধাওয়া করছে একদল জলদস্যু? তাও উপকূল থেকে দেড় শ' মাইল দূরে? অস্বাভাবিক নয়? ওয়েপন্স, ইয়টের উপর জুম করো। দেখতে চাই ওই ইয়টে

কারা।'

খোরশেদ নবী ডিউটিতে নেই, ওয়েপন্স স্টেশনে যে অফিসার সে জয়স্টিক ও ট্র্যাকবল নেড়ে স্ক্রিনে ইমেজ আনল। দৃশ্যটা এতই দূরে যে কমপিউটারের সাহায্য পেয়েও ছবি ফুটাতে গিয়ে হিমশিম খেল যায়রোস্কোপ। তবে মোটামুটি সব দেখা গেল। দারুণ চকচকে সুন্দর এক সাদা ইয়ট, ব্রিজের ঢালু কাঁচের ভিতর দিয়ে চোখে পড়ল চারজন লোক। দু'জনের সঙ্গে অ্যাসল্ট রাইফেল। চেয়ে রইল রানা, হঠাৎ সশস্ত্র দুই জনের একজন কাঁধে তুলে নিল অস্ত্র, এক পশলা গুলি করল।

মাসুদ ভাই এবার কী চাইবে, বুঝে নিয়েছে ওয়েপন্স অফিসার, ঘুরে গেল ক্যামেরা, দেখা গেল পালিয়ে আসছে ফিশিং বোট হিল্ডা। মনে হলো না গুলি লেগেছে, অপারেশন্স সেন্টার থেকে পরিষ্কার দেখা গেল লালচে চুলের এক মেয়েকে। চ্যাপ্টা ট্র্যানসমের উপর ঝুঁকে বসেছে সে, হাতে শটগান।

'ওয়েপন্স,' নির্দেশ দিল রানা, 'স্পুল করো গ্যাটলিং গান, কিন্তু সামনের প্লেট সরিয়ে দেবে না। স্টারবোর্ডের থার্টি ক্যালিবারের মেশিনগান তাক করো ইয়টের উপর। দরকার পড়তে পারে।'

'চারজন লোক, সঙ্গে অটোমেটিক রাইফেল, প্রতিপক্ষ শটগান হাতে এক মেয়ে,' বলল সোহেল। 'বেটি স্রেফ মরবে। আমাদের বোধহয় নাক গলাতেই হবে।'

'আমিও একই কথা ভাবছি,' বলল রানা। কমিউনিকেশন্স স্পেশালিস্টের দিকে চাইল। 'রায়হান, ওই মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করো।'

তিন কিবোর্ডের একটার বাটন টিপল রায়হান। 'এখন আপনি কথা বলতে পারেন।'

লিপ মাইকে বলে উঠল রানা, 'হিল্ডা, হিল্ডা, আমরা মোটর

শিপ মার্ভেল।' স্ক্রিনে মেয়েটিকে দেখতে পেল। চট্ করে কেবিনের দিকে ঘুরে চেয়েছে।

ট্র্যানসমের উপর ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি, তারপর এক দৌড়ে গিয়ে ঢুকল কেবিনের ভিতর। কয়েক সেকেণ্ড পর কথা বলতে লাগল। হাঁপানির আওয়াজে ভরে উঠল অপারেশন্স সেন্টার। 'মার্ভেল, ওহ্, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ভেবেছি আপনাদের জাহাজ পরিত্যক্ত!'

'খুব ভুল বলেননি,' মন্তব্য করল সানজিদা স্বর্ণা। ডিউটিতে নেই, তবে ওকে ডাকিয়ে এনেছে রানা। ক'দিন আগে ইন্টেলিজেন্সের উপর একটা ট্রেনিং নিয়েছে মেয়েটি, সিনিয়রদের বলে রেখেছে, ওর জ্ঞান কোথাও প্রয়োগ করতে পারলে খুশি হবে।

'আমাদের খুলে বলুন আপনাদের কী ধরনের ইমার্জেন্সি,' বলল রানা। যেন ভুলেই গেছে ক্যামেরা দিয়ে সবই দেখছে। 'আপনি বলেছেন জলদস্যুর দল হামলা করেছে।'

'হ্যাঁ, জলদস্যু। আমার নাম কার্টা অস্টিন। একটা ভাড়া করা বোট নিয়ে সাগরে এসেছি, তারপর হঠাৎ আমাদের উপর গুলি শুরু করেছে তারা।'

'কথাটা মিথ্যা,' নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল স্বর্ণা। 'ইয়টের ওই লোক আগেই বলেছে, সাবধান করেছে ওই মেয়েকে।'

'অসত্য বলছে,' স্বর্ণার কথায় সায় দিল রানা। 'ওর দিকে গুলি করেছে, কিন্তু মিথ্যা বলছে। ইন্টারেস্টিং। তোমার কী মনে হয়, স্বর্ণা?'

'কিছু লুকোছাপা আছে।'

'মার্ভেল,' উদ্বেগ প্রকাশ পেল মেয়েটির কণ্ঠে। 'আপনারা শুনছেন? মার্ভেল? মার্ভেল?'

মাইকে সাড়া দিল রানা। 'হ্যাঁ, আছি। শুনছি আমরা।' চট্

করে দেখে নিল স্ক্রিন। আন্দাজ করল এক মিনিট পর সাগরের কোন্ বিন্দুতে থাকবে দুই জলযান। ওর জানা হয়ে গেল ওই একই সময়ে ওরা নিজেরা কোথায় পৌঁছুবে। ট্যাকটিকাল পরিস্থিতি ভাল লাগল না। নিজেকে ওর অন্ধ মনে হচ্ছে। কার্টার অস্টিনের নাম বহুবার শুনেছে, সে দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে বড় ড্রাগ ডিলার। তাকে মেরে ফেলতে চাইছে তার প্রতিপক্ষ। এমনও হতে পারে, ওই বোটে কার্টা অস্টিন ও অন্য যারা রয়েছে, তাদের প্রাপ্য ভয়ঙ্কর কষ্টকর মৃত্যু। আবার এমনও হতে পারে, মেয়েটি আসলে নিরপরাধ।

'তা হলে মিথ্যা বলছে কেন?' নিজেকে জিজ্ঞেস করল রানা।

মার্ভেলের গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। কয়েক সেকেণ্ড ভাবল রানা, তারপর সিদ্ধান্তে এল।

'গগল, পোর্টসাইডে বাঁক নিতে শুরু করো, হিল্ডা আর আমাদের মাঝের দূরত্ব কমিয়ে আনো। গতি তোলো বিশ নটে। ইঞ্জিনিয়ার আফতাব, চালু করো ধোঁয়ার বয়লার।' ফাঁকা সাগরে কখনও পলিউশন তৈরি করে না মার্ভেল, তবে আশপাশে কোনও জাহাজ থাকলে তখন চিমনি দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করে। কারও বুঝবার উপায় থাকে না এই জাহাজ অত্যাধুনিক, ব্যবহার করা হয় না সাধারণ ডিজেল ইঞ্জিন।

'কয়েক মিনিট আগে জেনারেটার স্টার্ট দিয়েছি,' অপারেশন্স সেন্টারের পিছন থেকে বলে উঠল আফতাব। 'জাহাজ চোখে পড়বার আগেই চালু করা উচিত ছিল, ভুলে গেছি।'

'বড় বিপদ হওয়ার কথা নয়, হয়তো খেয়ালই করেনি কেউ,' বলল সোহেল।

নতুন করে মাইক অ্যাক্টিভেট করল রানা। 'মিস অস্টিন, মার্ভেলের ক্যাপ্টেন বলছি।'

'বলুন।'

এই মেয়ে কি সবদিক ভেবে দেখছে? ইংরেজ মেয়ে জুডি স্টিভেনসনের কথা মনে পড়ল রানার। জাপান সাগরে ওর সঙ্গে দেখা হয় এক নিমজ্জিত জাহাজে। খুব ঠাণ্ডা ছিল ওর মগজ। এই মেয়ে বোধহয় একই পথের পথিক। 'আমরা জাহাজ ঘোরাতে শুরু করেছি, আপনাদের দিকেই আসছি। হিল্ডার ক্যাপ্টেনকে বলুন, উনি যেন আমাদের পোর্টসাইডে থাকেন। তবে এখনই কিছু করতে মানা করবেন। আমাদের স্টারবোর্ডে রাখতে চাই ইয়ট। আপনি বুঝতে পেরেছেন?'

'একেবারে শেষ সময়ে বাঁক নিয়ে আপনাদের পোর্টসাইড ধরে চলব আমরা।'

'ঠিক ধরেছেন। তবে বড় বেশি কাছে আসবেন না। যে গতিতে আসছে ইয়ট, ওটা শেষ সময়ে বাঁক নিতে পারবে না। আপনারা আমাদের বো-র ঢেউ থেকে দূরে থাকবেন। এরপর বোর্ডিং স্টেয়ার নামিয়ে দেয়া হবে। তবে, না বলা পর্যন্ত ওটার দিকে আসবেন না। বুঝতে পেরেছেন?'

'আপনি সিগনাল না দেয়া পর্যন্ত ওদিকে যাব না,' জবাবে বলল কার্টা।

'আপনাদের কোনও বিপদ হবে না।' খড়খড় করা রেডিওর ভিতর প্রকাশ পেল রানার আত্মবিশ্বাস। 'এই প্রথম জলদস্যুদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে, তা নয়।'

স্ক্রিনে চাইল রানা। নতুন উৎসাহ নিয়ে ফিশিং বোট হিল্ডার উপর গুলি শুরু করেছে এক আততায়ী। তবে এত বেশি নড়ছে ইয়ট, লক্ষ্যভেদ অসম্ভব। রেঞ্জ এখনও অনেক বেশি। বোটের অনেক দূর দিয়ে গেল গুলি। রানার মনে হলো ও ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে। কার্টা অস্টিন ও তার সঙ্গীদের সাহায্য করা উচিত।

'রায়হান, কয়েকজন ক্রু নিয়ে ডেকে চলে যাও, নামিয়ে দাও বোর্ডিং স্টেয়ার। ওয়েপন্স, বো-র পয়েন্ট থার্টি ক্যালিবারের

মেশিনগান তৈরি রাখো।'

'তৈরি। টার্গেটের উপর স্থির করেছি।'

লাফাতে লাফাতে আসছে পেটমোটা পোয়াতি হিল্ডা। প্রকাণ্ড মার্ভেল থেকে বড়জোর তিন শ' গজ দূরে। আরও এক শ' গজ পিছনে ইয়ট। রানার ইচ্ছে ছিল না মেশিনগান ব্যবহার করবে, কিন্তু পরিষ্কার বুঝল, এ ছাড়া কোনও উপায়ও নেই। দুই বোটের মাঝে মার্ভেল হাজির হওয়ার আগেই ফিশিং বোট হিল্ডাকে রেঞ্জে পেয়ে যাবে আততায়ীরা। ওয়েপন্স অফিসারকে ইয়ট লক্ষ্য করে সংক্ষিপ্ত এক পশলা গুলি পাঠাতে বলবে, এমন সময় সিদ্ধান্ত পাল্টাল রানা। হিল্ডার স্টার্নে এসে দাঁড়িয়েছে কার্টা অস্টিন, ট্র্যানসমের উপর দিয়ে দেখা গেল মেয়েটির মাথা ও কাঁধ। পরক্ষণে গর্জে উঠল শটগান। এক সেকেণ্ড পর খালি হলো দ্বিতীয় নল।

ইয়টে গুলি লাগা ছিল অসম্ভব, তবে পাল্টা গুলি আসছে বুঝতে পেরে চমকে গেছে লোকগুলো। গতি কমিয়ে একটু পিছিয়ে গেল ইয়ট। চালক বোধহয় ভাবতে শুরু করেছে এবার কী করবে। মেয়েটির কারণে বাড়তি যে সময় মিলল, এর ফলে রানার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সহজ হলো।

পিছিয়ে পড়েছে ইয়ট। তবে তা বিশ সেকেণ্ডের জন্য, তারপর নতুন করে তীব্র গতি তুলল ইয়ট, একটানা বিশ্রী আওয়াজ শুরু করেছে অটোমেটিক রাইফেল। হিল্ডার স্টার্নে গিয়ে লাগছে অজস্র বুলেট। ছিটকে উঠছে কাঠের কুঁচি। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল কেবিনের কাঁচের দরজা। ট্র্যানসমের আড়ালে রয়েছে কার্টা, কিছুই হলো না ওর। অবশ্য, ব্রিজে একদম খোলা জায়গায় পড়ে গেলেন ক্যাপ্টেন ও সাথের অন্য লোকটা।

গতি কমালেন না ফিশিং বোটের ক্যাপ্টেন, দুলে উঠল তাঁর জলযান, এঁকেবেঁকে চলেছে ফ্রেইটার লক্ষ্য করে। হামলাকারীদের

তাক নষ্ট করতে চাইছে। এমন সময় গর্জে উঠল মেয়েটির বন্দুক। একই সঙ্গে দুই নল খালি করেছে। গুলি এতই দূর দিয়ে গেল, কয়েক শ' ফুট দূরে সাগরের বুকে ছিটকে উঠল গেইযার।

নতুন উদ্যমে ইয়ট থেকে এল গুলি, এবার বাধ্য হয়ে বসে পড়ল কার্টা। ও রয়েছে বোটের পিছনে রুক্ষ তক্তার ডেকে, দেখতে পেল না সামনে থেকে আসছে বিশাল ফ্রেইটার। অবশ্য টের পেল বদলে গেছে বোটের আচরণ। উথাল-পাতাল ঢেউ আসছে বড় জাহাজের খোল থেকে। বন্দুক ছুঁড়তে গিয়ে কাঁধে ব্যথা পেয়েছে কার্টা, তিক্ত মনে ভাবল, এখন আর কিছুই করবার নেই ওর। যা করবার করতে হবে হিল্ডার ক্যাপ্টেন এবং মার্ভেলের ক্যাপ্টেনকে। ট্র্যানসমের সঙ্গে সেঁটে শুয়ে রইল ও, ভয়ের চোটে হাঁপিয়ে উঠেছে। গতকাল ঠিক এমনই ভয় পেয়েছিল, কিন্তু পরে ভীষণ জেদ চেপে গেল মাথায়। নইলে হয়তো আজ এই বিপদে পড়তে হতো না।

মার্ভেলে অপারেশন্স সেন্টারে স্ক্রিনের দিকে চেয়ে রয়েছে রানা ও সোহেল। অনেক কাছে চলে এসেছে খুদে দুই জলযান। ফিশিং বোটের স্টারবোর্ডের দিকে ছুটে আসছে ইয়ট। এখনও নব্বুই গজ দূরে। একটু পর রেঞ্জে সবাইকে পাবে আততায়ীরা। মার্ভেল থেকে মাত্র তিরিশ গজ দূরে হিল্ডা। এতই কাছে, মাস্তুলের ক্যামেরাকে ট্র্যাক করতে হচ্ছে না। বো-র পয়েন্ট থ্রিটু ক্যালিবার গানের ক্যামেরা চালু করল ওয়েপন্স অফিসার।

ইয়ট থেকে আরও এক পশলা গুলি লাগল ফিশিং বোটে। যদি বিলাসবহুল ইয়ট আরও দূরে থাকত, নিজের পরিকল্পনা বাদ দিত রানা, ওয়েপন্স অফিসারকে বলত মেশিনগান বা গ্যাটলিং গান দিয়ে ঝাঁঝরা করে দিক শত্রুযানকে। এখনও স্টিলের প্লেটের ওপাশ থেকে ইয়টকে ট্র্যাক করছে গ্যাটলিং গান।

'এবার,' বিড়বিড় করে বলল রানা।

মাইক্রোফোন চালু করেনি, কিন্তু মনে হলো ওর কথা শুনতে পেয়েছেন হিল্ডার ক্যাপ্টেন, মার্ভেলের খাড়া প্রাউ থেকে পনেরো গজ দূরে ডানে বাঁক নিতে শুরু করল বোট। মার্ভেলের খোল থেকে বড় ঢেউ গেল ওটার দিকে, দুলতে দুলতে সরে চলেছে হিল্ডা, মনে হলো জোরালো ঢেউ পেয়ে রওনা হয়েছে কোনও সার্ফার।

ইয়টের হেলম্‌স্‌ম্যান বন-বন করে হুইল ঘোরাল, ভাব দেখে মনে হলো পিছু নেবে মোটা বোটের। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বুঝল অনেক বেশি গতি তুলে ছুটছে। বাধ্য হয়ে ফ্রেইটারের স্টারবোর্ডে চলে এল সে। ইয়টের দ্রুত গতি কাজে লাগিয়ে পিছনে ফেলবে জাহাজ, তারপর স্টার্ন পেরিয়ে আবারও ধাওয়া করবে ফিশিং বোটকে।

'গগল,' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'তৈরি থাকো। আমি যে মুহূর্তে স্টারবোর্ডের বো থ্রাস্টারগুলো পুরো চালু করতে বলব, একইসঙ্গে পুরো ডানদিকে ঘুরিয়ে দেবে রাডার। গতি তোলো চল্লিশ নটে।' ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল বদলে নিল রানা। দুই সেকেণ্ডের জন্য দেখা গেল দুলতে দুলতে চলেছে হিল্ডা। রানার মনের ভিতর খেলা করছে কয়েক ধরনের চিন্তা। ভাল করেই জানে ওর হাতে নির্ভর করছে মানুষের প্রাণ, একই সঙ্গে গোপন রাখতে হবে জাহাজের রহস্য। প্রায় ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছে ইয়ট। আরেক দিকে সরে গেছে ফিশিং বোট। এখন যদি ও দেরি করে, আবারও বিপদে পড়বে ওটা।

'গগল।'

কিবোর্ডে কয়েকটা টোকা দিল আর্মস্ ডিলার, পরক্ষণে একটু নাড়ল জয়স্টিক। এগারো হাজার টনি অন্য কোনও জাহাজ যা পারে না, ঠিক সেটাই করল মার্ভেল। আথওয়ার্টশিপ থ্রাস্টারগুলো দ্রুত কাজ শুরু করতেই দেখতে না দেখতে অবিশ্বাস্যভাবে পানির

ভিতর তীরের মত সরে গেল বো। নিজের ভয়ঙ্কর বেগ যেন কিছুই নয়, এখনও গতি তুলছে ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিনগুলো।

মাত্র এক সেকেণ্ড আগে মার্ভেলের বো পেরুতে শুরু করেছে ইয়ট, পরক্ষণে দেখা গেল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বাঁক নিতে শুরু করেছে জাহাজ। এইমাত্র সামনে ছিল খোলা সাগর, তা এখন আটকে দিতে চলেছে ভুতুড়ে জাহাজ। পঁয়ত্রিশ নট গতি তুলে সরাসরি জাহাজের পেটের দিকে চলেছে ইয়ট। দুই জলযানের সম্মিলিত গতিবেগ সত্তর নটের বেশি। যেভাবে নিজ শিশু আগলে রাখে তিমি মা, ঠিক সেভাবে ফিশিং বোটকে আড়াল দিয়েছে মার্ভেল। রানা চট্ করে স্ক্রিনে দেখে নিল ওই বোট থেকে একটু এগিয়ে ঘুরছে মার্ভেল। দুই জলযানের ঢেউগুলো পাল্টাপাল্টি ধাক্কা খেয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে পানি। একটু দূরে নাচতে নাচতে চলেছে জার্মান মহিলা।

পাগল হয়ে উঠেছে ইয়টের চালক। যেন দ্রুতগামী ট্রেন চলে আসবার আগেই রেললাইন পেরুতে হবে। জাহাজের বিশাল উঁচু বো ঘুরছে। নিজের পোর্টসাইডে বাঁক নিতে চাইল ইয়ট-চালক। তার ধারণা ছিল, খুব ধীরে চলছে জাহাজটা। কিন্তু তারপর দেখল ফ্যানটেইলের নীচে বলকে উঠছে বিপুল পানি। সে যদি স্বাভাবিক মানুষ হতো, ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে প্রার্থনা শুরু করত: খোলের সঙ্গে বাড়ি খাওয়ার পরও যেন বাঁচি।

গতিবেগ ও অবস্থান বুঝতে কঠিন অঙ্ক কষতে হয় না, এখনও ঘুরছে প্রকাণ্ড মার্ভেল, তবে ওটার চেয়ে অনেক বেশি ছোট একটা বৃত্ত তৈরি করতে চাইছে ইয়টের চালক।

একেবারে শেষ সময়ে লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল এক গানম্যান, পিছিয়ে নিতে চাইল থ্রটল। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে, হাতে কোনও সময়ও নেই তাদের।

মার্ভেলের বো থেকে এক শ' ফুট দূরে গিয়ে খরখরে খোলে নাক গুঁজল ইয়টের চকচকে প্রাউ। জাহাজের পুরু ধাতব দেহের কাছে ফাইবারগ্লাস ও অ্যালিউমিনিয়াম কিছুই নয়। মনে হলো একটা বিয়ারের ক্যানের উপর নেমে এসেছে দুরমুজ। মাউন্ট থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল দুই ইঞ্জিন, ছিন্নভিন্ন করে দিল খোল। পাঁজরের মত আড়াগুলো পুরো ইয়ট ধরে রেখেছিল, সেগুলো মড়মড় করে ভাঙল। বোটের উপরের অংশে কাঁচ ও প্লাস্টিকের তৈরি সবকিছু বিস্ফোরিত হলো। দুই সেকেণ্ড আগে চারজন লোক নিশ্চিত ছিল মিশন শেষ করতে পারবে, কিন্তু পরক্ষণে মারা পড়ল বেঘোরে। দুই জলযানের ভয়ঙ্কর সংঘর্ষে ছাতু হলো লোকগুলোর হাড়-মাংস।

একটা ফিউয়েল ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হলো, নোংরা কমলা রঙের আগুনের একটা গোলক আকাশে উঠল, এক পলক মার্ভেলের রেলিংটা চেটে নিয়ে হারিয়ে গেল চিরতরে। মনে হলো যেন একটা গোল্ড ফিশ এসে গুঁতো দিয়েছে হাঙরকে, তখনও ঘুরছে জাহাজ, বড় কোনও ঝাঁকিও খেল না। নীচে পানির ভিতর ছড়িয়ে পড়েছে জ্বলন্ত ডিজেলের পাতলা পর্দা। অবশিষ্ট ইয়টের ভিতর থেকে উঠছে তেলতেলে ধোঁয়া, কিন্তু পাঁচ সেকেণ্ড পর মাঝারি একটা ঢেউ এসে সবই তলিয়ে দিল।

'এবার থামো, গগল,' বলল রানা। এক মুহূর্ত পর টের পেল ডিযএংগেজ করা হয়েছে পাম্প জেটগুলো।

'মাছি মারার মত, কী বলিস?' বলল সোহেল।

'দেখা যাক মাছি থেকে যাদের রক্ষা করলাম, তারা আবার হুলওয়ালা বোলতা কি না।' মাইক্রোফোনের সুইচ টিপল রানা। 'মার্ভেল থেকে বলছি... হিল্ডা, শুনছেন?'

'হিল্ডা থেকে বলছি, মার্ভেল,' মেয়েটির স্বস্তির হাসি শুনতে পেল ওরা। 'জানি না কীভাবে কাজটা করলেন, তবে আমরা

তিনজন কৃতজ্ঞ রইলাম আপনাদের কাছে।'

'আপনারা লেট লাঞ্চে আমাদের সঙ্গে বসলে খুশি হব,' বলল রানা। 'যা ঘটল সেটা নিয়েও একটু আলাপ করতে চাই।'

'প্লিয, এক মিনিট অপেক্ষা করুন, মার্ভেল।'

রানার জানতে হবে, কেন কী ঘটল। মেয়েটি জাহাজে উঠবার আগে বাড়তি সময় নেবে, তা দেবে না ও, নইলে হয়তো মিথ্যা কাহিনি সাজাবে কার্টা অস্টিন। 'আপনারা যদি দাওয়াত এড়িয়ে যেতে চান, বাধ্য হয়েই ওয়ালভিস বে-র মেরিটাইম কর্তৃপক্ষের কাছে আনুষ্ঠানিক ভাবে রিপোর্ট করতে বাধ্য হব।'

এ ধরনের চিন্তা নেই রানার মনে, তবে সেটা জানে না কার্টা অস্টিন।

'আ... ঠিক আছে, খুশি মনে আপনার দাওয়াত গ্রহণ করছি আমরা।'

'খুব ভাল। আমাদের বোর্ডিং ল্যাডার নামিয়ে দেয়া হয়েছে পোর্ট সাইডে। আমার এক ক্রু আপনাদের নিয়ে আসবে ব্রিজে।' সোহেলের দিকে চাইল রানা। 'দেখা যাক কোন্ ঝামেলার ভিতর পড়লাম।'

দশ

অচেতনতা যেন উষ্ণ কোনও আরামদায়ক চাদর, তবে ওই রেশমি চাদর সরিয়ে জেদ নিয়ে জেগে উঠতে চাইছে আসিফ

হায়দার চৌধুরি। অবশ লাগছে সারা দেহ। কাটতে শুরু করেছে টেযারের শক। আঙুল, গোড়ালি ও বুকে যেখানে লেগেছে ইলেকট্রোড, সেসব জায়গায় মনে হচ্ছে অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে ত্বক।

'ওর ঘুম ভাঙছে,' একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল। যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এসেছে। কিন্তু কেন যেন আসিফের মনে হলো ওই লোককে ভাল করেই চেনে সে। আসলে ওর মগজ চলছে না, মনে হচ্ছে অনেক দূরের আকাশে উঠে কোথায় যেন ভেসে চলেছে।

কিছুটা চেতনা ফিরল ওর, টের পেল বেকায়দা ভাবে রয়েছে দেহ। নড়ে উঠল আসিফ, কিন্তু তাতে কোনও সুবিধা হলো না। দুই কবজি আটকে দেয়া হয়েছে হ্যাণ্ডকাফে, একেবারে মাংসে গেঁথে গেছে বেড়ি। এক ইঞ্চির বেশি নড়ল না হাত। তাতে খুব ব্যথা লাগছে না। হাত-পায়ে তেমন সাড়া নেই। কিন্তু বোঝা গেল এরা দুই গোড়ালিও বেঁধেছে।

অনিশ্চয়তা নিয়ে চোখ মেলল আসিফ। পরক্ষণে বুজে ফেলল পাতা। আগে কখনও এত উজ্জ্বল আলোকিত ঘর দেখেনি। ওর মনে হয়েছে দাঁড়িয়ে আছে জ্বলন্ত সূর্যের সামনে। কয়েক মুহূর্ত চোখ মুদে থাকল আসিফ, তারপর আবারও খুলল পাতা, ঝলমলে আলোয় কুঁচকে গেল ভুরু। চারপাশ বুঝতে কয়েক সেকেণ্ড লাগল। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ঘরটা পনেরো ফুটের মত। ওকে যে কয়েদখানায় রাখা হয়, ওটার মতই চারদিকে পাথরের দেয়াল। বুঝতে দেরি হলো না কারাগার থেকে বের করা হয়নি ওকে। এক দেয়ালে বড় একটা পিকচার উইণ্ডো, লোহার গরাদ দিয়ে আটকানো। অল্প কিছুদিন আগে বসানো হয়েছে কাঁচ। ওপাশের দৃশ্য দেখে মন দমে গেল আসিফের। এত বিরান অনুর্বর জমি আগে দেখেনি কোনদিন। একের পর এক বালির ঢিবি, সব

পুড়ছে লেলিহান সূর্যের নীচে।

ঘরে উপস্থিত সবার উপর দিয়ে ঘুরে এল আসিফের চোখ।

আটজন নারী-পুরুষ, বসেছে কাঠের টেবিলের ওপাশে। এরা গার্ডদের মত মুখোশ পরেনি। অবশ্য কাউকে চিনল না আসিফ। আন্দাজ করল প্রহরীদের ভিতর রয়েছে বিশালদেহী ও উজ্জ্বল নীল চোখের গার্ড। টেবিলের ওপাশে প্রত্যেকে শ্বেতাঙ্গ, বেশির ভাগের বয়স বড়জোর তিরিশ। অনেক দিন সুইটযারল্যাণ্ডে থেকেছে আসিফ, সহজেই চিনল ইউরোপিয়ান কাট পোশাক। এ দলে সবচেয়ে বেশি যার বয়স, তার সামনে একটা ল্যাপটপ কমপিউটার। মহিলা পঞ্চাশ মত, মাথা ভরা সোনালী চুলের ভিতর জায়গায় জায়গায় দেখা দিয়েছে রুপালি রং। কম-পিউটারের সঙ্গে যুক্ত একটা ওয়েব ক্যামেরা, ওটা ফোকাস করেছে আসিফের মুখের উপর।

'আসিফ হায়দার চৌধুরি,' কমপিউটারের স্পিকারে ভেসে এল ইলেকট্রনিক্যালি ফিল্টার্ড কণ্ঠ। 'এই বিশেষ কোর্ট তোমার অনুপস্থিতিতেই তোমার বিচারের কাজ সমাপ্ত করেছে, এবং এই বিশ্বের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর সব অপরাধ সংগঠিত করায় দোষী হিসাবে প্রমাণিত হওয়ায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছ তুমি।' কথাগুলো শুনে মাথা দোলাল ক'জন। 'তোমার কোম্পানি যেসব পণ্যের পেটেন্ট করেছে, যেমন সালফার স্ক্রাবার, এসবের কারণে বিভিন্ন দেশের সরকার এবং ব্যক্তি এখনও অন্যায় ভাবে ব্যবহার করছে ফসিল ফিউয়েল। তুমি নিজ প্রোডাক্ট বিক্রির হীন উদ্দেশে প্রচারণা চালিয়েছঃ জ্বালানী হিসাবে কয়লা ব্যবহারে পরিবেশের উপর বড় কোনও প্রভাব পড়ে না। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছেঃ জ্বালানী হিসাবে কয়লা ব্যবহৃত হলে তা পরিবেশের উপর ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এই কারণে এই আদালত সমস্ত তথ্য-প্রমাণ পর্যালোচনার শেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছেঃ যেসব পাওয়ার প্লান্টে তোমার ডিভাইস

ব্যবহৃত হয়, সেখানে সামান্য গন্ধকের দূষণ সত্যিই কিছুটা হ্রাস পায়। কিন্তু সেজন্য তোমার অপরাধের গুরুত্ব একটুও হ্রাস পেতে পারে না। তোমার কারণে এখনও বিলিয়ন বিলিয়ন টন ক্ষতিকর কেমিক্যাল ও গ্যাস ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বের পরিবেশে।

'তুমি তোমার প্রোডাক্ট বিক্রি করে, আমরা যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দর সুস্থ একটি সবুজ পৃথিবী রেখে যেতে চাই, তাদের প্রতি চরম অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করেছ। পরিবেশবাদীদের সংগঠনগুলোকে এভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তোমরা— তুমি বা তোমার মত অনেকে, বা এনার্জি কোম্পানিগুলো মুখে মুখে বলছ, তোমরা তৈরি করতে চাও একটি সবুজ বিশ্ব; কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছেঃ তোমরা ছড়িয়ে চলেছ বিষ। পৃথিবীর জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত যত ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছে, তার ভিতর সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং। কিন্তু আজও তোমার মত মানুষ তা মেনে নিতে পারছে না। তোমরা ভাবছ সামান্য কম ক্ষতিকর টেকনোলজি ব্যবহার করলেই উৎরে যাবে বিপদ। তোমরা কোটি কোটি মানুষকে ভুল বুঝিয়ে প্রচার করে চলেছঃ আর কোনও বিপদ হবে না। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছেঃ প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত হচ্ছে বিশ্বের পরিবেশ।

'একই কাজ করছে হাইব্রিড গাড়ির কোম্পানিগুলো। এটা ঠিক, এসব গাড়ি অনেক কম গ্যাসোলিন খরচ করে। কিন্তু এসব আবিষ্কার করবার আগে কত হাজার কোটি টন দূষণ ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর পরিবেশে? কতজন কিনতে পারে এসব মহামূল্যবান গাড়ি? কাজেই লক্ষ লক্ষ মানুষ কিনছে সাধারণ গাড়ি। এই যে ক্ষতি, তা হচ্ছে কয়েকজন বিজ্ঞানীর কারণে। তাদের হাতে জিম্মি হয়েছে গোটা মানবজাতি। বিবেক বলতে কিছুই নেই তাদের। পরিবেশকে রক্ষা করতে কোনও ভূমিকা তো রাখছেই না, বরং উল্টো পকেট ভরবার জন্য ব্যবহার করছে উন্নত

টেকনোলজি। তুমি এবং তাদের বিশাল এক ভুল ধারণা: কোনও ভাবে টেকনোলজি রক্ষা করবে এই গ্রহকে। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে: তোমাদের টেকনোলজি আজ ধ্বংস করতে চলেছে পৃথিবী।'

কথাগুলো মন দিয়ে শুনেছে আসিফ হায়দার চৌধুরি, এখন বুঝতে চাইছে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কী বলল ওই কণ্ঠ। কয়েক মুহূর্ত পর মুখ খুলল সে, কিন্তু অবশ হয়ে যাওয়া কণ্ঠনালী শুকিয়ে মরুভূমি, গলা দিয়ে ব্যাঙের মত 'ক্রোক্' শব্দ বেরুল। গলা পরিষ্কার করে আবার বলতে চাইল। 'কারা... আপনারা কারা?'

'আমরা সেই দল যারা তোমার নোংরা মনের গলি-ঘুঁচি বুঝতে পেরেছি। আমরা জানি তোমাদের ষড়যন্ত্র কী। তোমরা টাকার জন্য পারো না এমন কিছুই নেই।'

'ষড়যন্ত্র?' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল আসিফ হায়দার। গুছিয়ে নিতে চাইছে কথাগুলো। পরবর্তী ক' মিনিট ওর জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওর কথার উপর নির্ভর করবে পায়ে হেঁটে এখান থেকে বেরুতে পারবে, না বেচারি ক্যারেনের মত ভয়ঙ্কর ভাবে আহত অবস্থায়। 'আমার টেকনোলজি বারবার প্রমাণ করেছে ওটাই বর্তমানের সেরা পদ্ধতি। কপাল ভাল যে ওটার কারণে অনেক কমে এসেছে গন্ধকের বিষক্রিয়া। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বিপ্লবের সময় যে পরিবেশ বিপর্যয় হয়েছে, তার চেয়ে এখন অনেক কম দূষণ ছড়িয়ে পড়ছে।'

'তোমার আবার টেকনোলজি...' কমপিউটারের ইলেকট্রনিক ফিল্টারের ভিতর দিয়ে আসছে ওই টিটকারির কণ্ঠ, তাতে স্পষ্ট তাচ্ছিল্য। 'কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মোনোক্সাইড, পার্টিকুলেট অ্যাশ, মারকারি বা অন্য ভারী ধাতু আগে কখনও এত বেশি ছড়িয়ে পড়েনি পৃথিবীর আবহাওয়ায়। আগে কখনও এত উঠে আসেনি সাগরের পানি। পাওয়ার কোম্পানিগুলো বলে চলেছে

তোমার স্ক্রাবারগুলোর কারণে কমে গেছে দূষণ। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে, সালফার বিপুল পরিমাণ বিষের সামান্য একটু অংশ। আসল কথা, পৃথিবীর মানুষকে ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে চারপাশ থেকে কতবড় হুমকির মুখে পড়ছে পরিবেশ।'

'তাই সবাইকে পরিস্থিতি বোঝাতে আমাকে কিডন্যাপ করেছেন, পিটিয়ে গুরুতর আহত করেছেন এক নিরীহ মেয়েকে?' মুখ ফস্কে কথাটা বলে ফেলেছে আসিফ। তবে নিজ কথা ঘুরিয়ে নিতে চাইল না। কমপক্ষে এক শ'বার এ নিয়ে আলোচনা করেছে পরিবেশবাদীদের সঙ্গে। হ্যাঁ, তার আবিষ্কারের কারণে সত্যিই পরিবেশে কমেছে গন্ধকের মাত্রা, এবং সে কারণেই অনেক উদ্যোক্তা উৎসাহী হয়েছে, নব উদ্যমে চালু করা হয়েছে নতুন সব পাওয়ার প্লান্ট। এর ফলে পরিবেশে যোগ হয়েছে প্রচুর বিষাক্ত দ্রব্য। এ এক ভয়ঙ্কর জটিল দুষ্টচক্র। এই নিয়ে পরিবেশবাদীদের সঙ্গে অনেক আলাপও হয়েছে। সে কারণেই ওর আত্মবিশ্বাসী মন বলছে, এই বিপদ থেকে বেরুতে পারবে।

'সেই মেয়েলোক তোমার হয়ে কাজ করে। সে নির্দোষ নয়।'

'কোন্ যুক্তিতে এ কথা বলছেন আপনি? আপনারা তো তার নামও জানতে চাননি। জানার প্রয়োজন বোধ করেননি সে কী কাজ করে।'

'সে কী কাজ করে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটাই যথেষ্ট যে সে তোমার হয়ে কাজ করে। সে যে দোষী তা পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত। তোমরা দু'জন একই পথের পথিক, একই অপরাধে দুষ্ট।'

বড় করে শ্বাস ফেলল আসিফ, এই লোকগুলোকে যে করে হোক বোঝাতে হবে, ও আসলে এদের শত্রু নয়। তা যদি না পারে, প্রাণ নিয়ে বেরুতে পারবে না। পাঁচ সেকেণ্ড ভাবল সে, তারপর বলল, 'শুনুন, আপনারা পৃথিবীর বিপুল জ্বালানীর চাহিদার

কারণে আমাকে দায়ী করতে পারেন না। আপনারা চাইছেন পরিবেশ সুন্দর থাকুক, সেক্ষেত্রে মানুষকে বোঝাতে শুরু করুন, তারা যেন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করে। কখনও একটির বেশি সন্তান যেন ভুলেও গ্রহণ না করে। কিছুদিনের ভিতর ইউনাইটেড স্টেটস-এর চেয়ে অনেক বেশি দূষণকারী দেশ হয়ে উঠবে চিন। তাদের জনসংখ্যার এক দশমিক দুই বিলিয়ন মানুষের কারণে ঢের বেশি বিপর্যয় ঘটছে পরিবেশে। একই অবস্থা ভারতে। তাদের জনসংখ্যা পুরো এক বিলিয়ন। মূলত অতিরিক্ত জনসংখ্যা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যা। ইউরোপ বা আমেরিকা যতই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুক, বেশি দিন নেই, প্রতিটি দেশ ফিরবে ঘোড়াটানা গাড়ির যুগে। আবার নতুন করে লাঙলের চাষ দিতে হবে মাঠে। আমরা চাইলেই এশিয়ার দূষণ ঠেকাতে পারব না। আমি স্বীকার করি গোটা পৃথিবীর এটা মস্ত সমস্যা, এবং সেজন্যে এই সমস্যা মোকাবিলা করতে আমাদেরকে একযোগে কাজ করতে হবে।'

টেবিলের ওপাশে কঠোর মুখ করে বসে আছে মানুষগুলো। মনে হলো না আসিফ হায়দার চৌধুরির বক্তৃতা তাদের মন ছুঁয়েছে। নীরব হয়ে গেছে কমপিউটার, থমথমে পরিবেশ ঘরে। মন শক্ত করছে আসিফ, মেরুদণ্ড বেয়ে নামছে হিমশীতল বরফ স্রোত। দশ সেকেণ্ড পর নিজেকে আর সামলাতে পারল না সে, স্বাভাবিকের চেয়ে একটু জোরে বলে উঠল, 'প্লিয, আপনারা আমার কথা শুনুন। আমাদেরকে মেরে ফেলেই বা কী পাবেন? আপনারা বলুন আসলে কী চান... টাকা? আমি আপনাদের সংগঠনের জন্য যত টাকা লাগে, সবই দেব। আমাদেরকে ছেড়ে দিন।'

'বড় দেরি করে ফেলেছ, পয়সা দিয়ে পার পাবে না এখন,' কমপিউটারের কণ্ঠ বলে উঠল, এবার ইলেকট্রনিক ফিল্টার বন্ধ

করে দেয়া হলো। নিজ কণ্ঠে বলল মানুষটা, 'তোমার বিচার শেষ, চৌধুরি, এবং তুমি দোষী প্রমাণিত হয়েছ।'

ওই কণ্ঠ ভাল করেই চেনে আসিফ হায়দার চৌধুরি, কিন্তু গত দুই বছর শোনেনি। অন্তরের গভীরে টের পেল, এ লোক ছাড়বে না, তাকে বাঁচতে দেবে না কিছুতেই!

এগারো

স্নানের সুযোগ হয়নি মাসুদ রানার, কেবিনে ফিরে চট্ করে পাল্টে নিয়েছে ব্যায়ামের পোশাক, তারপর ছুটে এসেছে মার্ভেলের নকল ব্রিজে। যে-কোনও সময়ে কার্টা অস্টিন ও তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে হাজির হবে নিশাত সুলতানা।

কিছুক্ষণ পর শুনতে পেল বাইরের দিকের সিঁড়ির ধাপে পায়ের আওয়াজ শুরু হয়েছে। বরাবরের মতই পুরোপুরি নোংরা এই ব্রিজ। আধুনিক সমস্ত হাই-টেক যন্ত্র থেকে মুক্ত। সব অস্ত্র রেখে এসেছে ওরা। আবার হেলমসম্যানের অভিনয় করছে জলিল খান। পরনে ময়লা শার্ট-প্যান্ট, মাথায় ছেঁড়া ক্যাপ। পুরনো হুইলের সামনে দাঁড়িয়েছে। এইমাত্র নকল টেলিগ্রাফের হ্যাণ্ডেল ধরে টান দিল, ভাব দেখে মনে হলো ইঞ্জিন রুমকে জানিয়ে দিল এবার জাহাজ থামাতে হবে। পাশের টেবিলের উপর অতি পুরনো একটি দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার মানচিত্র।

'এটা এনে ভাল করেছ,' চায়ের খয়েরি দাগ পড়া মানচিত্রে

টোকা দিল রানা।

'ভাবলাম আপনার পছন্দ হবে।' খুশি হয়ে উঠল জলিল।

রানার জানা নেই দেখতে কেমন হবে কার্টা অস্টিন, তবে মেয়েটি ঘরে ঢুকতেই ধক্ করে উঠল ওর হৃৎপিণ্ড। লালচে চুলগুলো এলিয়ে পড়েছে কাঁধের উপর, সেখান থেকে নেমে গেছে কোমর ছাড়িয়ে। হাওয়া ও রোদে ব্রোঞ্জের মত রং ধরেছে মেয়েটির সুন্দর মুখ, না-চেনা কোনও বন্য ফুলের মতই। সাগর-নীল দুই চোখে কীসের এক অমোঘ রহস্য। টসটস করছে লোভনীয় দুই ঠোঁট। খাড়া কিন্তু মানানসই নাক। ওই বুক-কোমর ও নিতম্বের ঢেউ যে-কাউকে পাগল-কবি করতে পারে। সব মিলে তাকে পুরাণের কোনও গ্রিক দেবী মনে হলো রানার।

কার্টা অস্টিনের পিছন নিয়ে ভিতরে ঢুকল দুই লোক। একজন বয়স্ক, কুচকুচে কালো চেহারা, বোধহয় নামিবিয়ান ফিশিং বোটের ক্যাপ্টেন। অন্য লোকটি শ্বেতাঙ্গ, দেখতে ভাল নয়, অতিরিক্ত বেরিয়ে আছে কণ্ঠা, বারবার ঢোক গিলে চলেছে। তিক্ত চেহারা নিয়ে চারপাশ দেখছে সে। এই লোকের সঙ্গে কোনও ভাবেই মানায় না সুন্দরী কার্টা অস্টিনকে। বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে মনে হলো কর্তৃত্ব করছে ওই মেয়েই। এবং সেজন্য ওর উপর ভীষণ রেগে আছে লোকটা।

এক পা সামনে বাড়ল রানা, বাড়িয়ে দিল হাত। 'মাসুদ রানা, মার্ভেলের ক্যাপ্টেন। ওয়েলকাম।'

'কার্টা অস্টিন,' শক্ত করেই ধরেছে রানার হাত, মেয়েটির চোখে কোনও ভয় বা দুশ্চিন্তার ছাপ নেই। 'এঁরা রন কুবলিকি ও বোটের ক্যাপ্টেন বেঞ্জামিন ইশাকা।'

'ভাল আছেন নিশ্চয়ই?' আড়ষ্ট খাস ব্রিটিশ সুরে বলল রন কুবলিকি।

'বোধহয় আপনাদের কোনও চিকিৎসা লাগবে না?' জানতে

চাইল রানা।

'না, তা লাগবে না,' বলল কার্টা। 'আমরা সুস্থ আছি। সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

'গুড। নিশ্চিন্ত হলাম।' মৃদু হাসল রানা। 'আপনাদেরকে আমার অগোছালো কেবিনে নিয়ে যেতাম, কিন্তু ওখানে অতিথি বসাতে চাই না। বরং চলুন গ্যালিতে গিয়ে বসি। বাবুর্চি দেখুক কী দিতে পারে।' নিশাতের দিকে চাইল রানা, বিশালদেহী আর্মি ক্যাপ্টেন বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

সত্যি বলতে, ক্যাপ্টেনের কেবিন রাখা হয়েছে শুধু ইন্সপেক্টর ও বন্দরের অফিশিয়ালদের ভাগিয়ে দেয়ার জন্য। বিপর্যস্ত এলাকা বলা যায় ওদিকটা। একবার ওই কেবিনে ঢুকলে সবাই চট্ করে বুঝে ফেলবে গোটা জাহাজের পরিবেশ আরও কত খারাপ। ছাল উঠে গেছে কম দামি কার্পেটের। বিশেষ কিছু কেমিকেলে চুবিয়ে নেয়া হয়েছে ওটাকে। ফলে সর্বক্ষণ ঘরের ভিতর ভাসছে সস্তা সিগারেটের কটু গন্ধ। চেইন স্মোকারও বেশিক্ষণ থাকতে চাইবে না ওখানে। দেয়ালে ঝুলছে প্রায়-অশ্লীল পুরনো পোস্টার। ওদিকে চাইলে বিরক্ত হয়ে উঠবে যে কেউ। ওই কেবিন মোটেই কারও ইন্টারভিউ নেয়ার উপযুক্ত জায়গা নয়। নকল গ্যালি ও পাশের মেস হল যে ফাইভ স্টার হোটেলের মত এমনও নয়, তবে কিছুটা অন্তত পরিষ্কার।

এদেরকে নিয়ে ভিতরের এক সিঁড়ি বেয়ে কয়েক তলা নেমে এল রানা। মেঝের লিনোলিয়ামের চল্টা উঠে গেছে। একটা রেলিং ধরবার আগেই সাবধান করল রানা, ওটা প্রায় খুলে এসেছে। মেস হলে ঢুকতেই পাশের সুইচ টিপল রানা, কয়েক মুহূর্ত টিপটিপ করল কিছু ফ্লুরেসেন্ট টিউব লাইট। সেগুলোর ভিতর গোটা তিনেক সত্যিসত্যিই জ্বলে উঠল। দপদপ করছে তিনটি, তার দুটো ঝিঁঝি পোকার মত আওয়াজ ছাড়ছে। বেশির

ভাগ কাস্টম্‌স্ ইন্সপেক্টর মনে মনে বলে, এখানে বসবার চেয়ে ব্রিজের মেঝেতে বসে ম্যানিফেস্ট পড়া অনেক আনন্দের। বড়সড় মেস হলঘরে রয়েছে কয়েক আকারের মোট চারটে টেবিল। ষোলোটা চেয়ারের ভিতর দুটো একই রকম, অন্যগুলো নানা সময়ে কেনা হয়েছে। দেয়ালে কালচে সবুজ রং, সঙ্গে মেশানো হয়েছে লাল, ফলে এখানে বেশিক্ষণ থাকলে মনে হয়: বেঁচে থেকে কী লাভ?

দুই ডেক নীচে রয়েছে মার্ভেলের সত্যিকারের মেস হল, ওটা অভিজাত, যে-কোনও ফাইভ স্টার রেস্টুরেন্টকে হার মানাতে পারে।

নিজের পছন্দের টেবিলে এদেরকে বসতে বলল রানা। মুখোমুখি চেয়ারে বসল নিজে। ওর পিছনে এক পাশের দেয়ালে ঝুলছে একটি ছবি, তার আড়ালে গোপন পিনহোল ক্যামেরা। অপারেশন্স সেন্টারে সোহেল ও স্বর্ণা মনোযোগ দিয়েছে, খেয়াল করে শুনবে এবং দেখবে ইন্টারভিউ। যদি তাদের মনে কোনও প্রশ্ন থাকে, বাবুর্চি মোস্তাফা আবুলের মাধ্যমে তা পাঠিয়ে দেবে রানার কাছে।

টেবিলের উপর দু'হাত রাখল রানা, কয়েক মুহূর্ত অতিথিদের দেখে নিয়ে ওর চোখ স্থির হলো কার্টা অস্টিনের চোখে। মেয়েটি নিষ্পলক চাইল ওর দিকে। ঠোঁটে আবছা হাসি। সাগরে গুলি চলবার পর ওর মনে ভয় বা রাগ থাকবার কথা, ভাবল রানা। কিন্তু এখন মজা লাগছে তার। কেন? খেপে বোম হয়ে আছে রন কুবলিকি, ভয় পেয়েছে সে, মরণের ঝুঁকি নিতে কারই বা ভাল লাগে? গভীর চিন্তার ভিতর ডুবে আছেন নামিবিয়ান ক্যাপ্টেন, বোধহয় মনে মনে প্রার্থনা করছেন রানা যেন কর্তৃপক্ষকে কিছু না জানায়।

'তারপর, মিস কার্টা? আমাকে খুলে বলুন ওরা কারা ছিল,

এবং কেনই বা আপনাদেরকে মেরে ফেলতে চাইল?' একটু সামনে ঝুঁকে এল মেয়েটি, ঝলমল করছে মুখ, কী যেন বলতে চলেছে, কিন্তু তার আগেই রানা আবারও বলল, 'ভুলবেন না রেডিওতে আমরা কী শুনেছি। গতকাল আপনাকে সাবধান করা হয়েছে।'

আবারও চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসল কার্টা, নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে।

'ফর গডস্ সেইক, সব জানিয়ে দিন,' দশ সেকেণ্ড পর বলল কুবলিকি। 'এখন কিছু লুকিয়ে কী লাভ!'

লোকটার দিকে বিষাক্ত চাহনি দিল কার্টা। তবে বুঝে গেছে নিজে যদি না বলে, সবই জানিয়ে দেবে রন কুবলিকি। বড় করে শ্বাস ফেলল কার্টা, তারপর বলল, 'ঊনবিংশ শতাব্দির একটা জাহাজ খুঁজছি আমরা। ওটা সোয়া শ' বছর আগে এদিকের সাগরে ডুবে যায়।'

'এবং আপনার মনে হয়েছে ওই জাহাজে আছে বিপুল ধন-সম্পদ,' মন্তব্য করল রানা। ঠাট্টার একটা ভাব রয়েছে ওর কণ্ঠে।

গলা খাঁকারি দিল কার্টা। 'আমি এতই নিশ্চিত ছিলাম যে সবাইকে বিপদে ফেলতেও দ্বিধা করিনি। খেয়াল করিনি কেউ আমাদেরকে মেরেও ফেলতে চাইতে পারে। ওহ্, ভাল কথা, ওই ইয়টটার কী হলো? ওটাকে তো আশপাশে কোথাও দেখতে পেলাম না?'

'দুঃখজনক একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে,' বলল রানা, 'এই জাহাজের পেটে জোর একটা গুঁতো মেরে নিজেই তলিয়ে গেছে সাগরে।' মেয়েটির দিক থেকে কুবলিকির দিকে চাইল রানা। এদেরকে ট্রেজার হাণ্টার মনে হচ্ছে না ওর। তবে যে-কোনও মানুষ ওই ভয়ঙ্কর জ্বরে পড়তে পারে, এবং বেশির ভাগ সময় ওই রোগেই মৃত্যুবরণ করে। 'আপনাদের দু'জনের পরিচয় হলো

কীভাবে?'

'হারিয়ে যাওয়া ট্রেজার নিয়ে আলাপ করে এমন এক ইন্টারনেট চ্যাট রুমে আমাদের পরিচয়,' বলল কার্টা। 'গত এক বছর ধরে আমরা আলাপ করেছি, তারপর স্থির করলাম এবারের ছুটিতে এখানে আসব।'

'খুলে বলুন, এরপর গতকাল রাতে কী ঘটল?'

'একা হোটেল থেকে বেরিয়ে ডিনার করতে যাই, ফিরবার সময় পিছু নিল লোকদুটো। দৌড়াতে শুরু করলাম। এক পর্যায়ে আমার দিকে গুলি ছুঁড়ল একজন। ছুটতে ছুটতে হোটেলে পৌঁছলাম, ওখানে বেশ ভিড় ছিল, কাজেই রাস্তার ওদিকে রয়ে গেল ওরা। একজন গলা চড়িয়ে সতর্ক করল, নামিবিয়া ছেড়ে চলে না গেলে মেরে ফেলবে।'

'এরপর তাদের দু'জনকে দেখলেন ইয়টে।'

'হ্যাঁ। তাদের হাতে মেশিনগান ছিল।'

'আর কারা জানে আপনারা নামিবিয়ায় এসেছেন?'

'ঠিক বুঝলাম না আপনার কথা। বন্ধু-বান্ধবী, আত্মীয়-স্বজন, অফিসের সহকারী— এসব?'

'ঠিক তা জানতে চাইনি। জানতে চাইছি, আপনারা এখানে কী করছিলেন। আপনাদের প্রোজেক্ট নিয়ে কারও সঙ্গে আলাপ করেছেন?'

'আমরা একদল জেলের সাক্ষাৎকার নিয়েছি,' বলল কুবলিকি।

কথাটা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বলল কার্টা, 'আমরা জানতে চেয়েছি এসব জেলেদের জাল কোথায় বেশি হারিয়েছে। এদিকের সাগরতল আসলে মরুভূমির বাড়তি অংশ। কাজেই মনে হয়েছে উঁচু কিছুর সঙ্গে জাল আটকে গেলেই বুঝতে হবে, ওটা ওখানে এসেছে মানুষের কারণে। সুতরাং, সহজেই পাব পুরনো জাহাজ।'

'বাস্তবে তা না-ও হতে পারে,' মন্তব্য করল রানা।

'এখন তা স্পষ্ট বুঝছি।' হতাশা নিয়ে বলল কার্টা। 'কপ্টারে করে একের পর এক সাইটে গেছি, সঙ্গে ছিল মেটাল ডিটেক্টর, কিন্তু কিছুই পাইনি।'

'এতে অবাক হওয়ার কোনও কারণ নেই,' বলল রানা। 'কয়েক মিলিয়ন বছরে বেরিয়ে আসে বেডরক, সাগরের বুকে উঁচু হয়ে থাকে, তখন সহজেই জাল হারাতে হয়।' মাথা দোলাল কার্টা। 'তার মানে বহু জেলের সঙ্গে কথা বলেছেন। এ ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথা হয়নি?'

'আর বলেছি ব্র্যাড এন লাজরাস নামের এক বেলাজ লোককে।' নীচের ঠোঁট বেঁকে গেল মেয়েটির। 'সে ছিল আমাদের গাইড। কখনও পাত্তা দিইনি। মনে হয়েছে বাজে লোক। এ ছাড়া রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকান কপ্টার পাইলট, ওয়ারিলি আইবল। অন্য কেউ জানত না, জেলেদের কাছে আমরা জানতে চেয়েছি তারা জাল কোথায় হারায়। তবে লাজরাস ও আইবলকে আমরা বলিনি কোথায় পেতে পারি ওই জাহাজ।'

'আপনি দাদু এবেলের কথা ভুলে গেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলেই জানতে পারেন বিশাল সব ধাতব সাপ দেখেছে সে,' তিক্ত মনে বলল কুবলিকি। বিব্রত করতে চাইছে মেয়েটিকে।

ভুরু উঁচু করল রানা। 'বিশাল ধাতব সাপ?'

'ওসব কিছু নয়,' বলল কার্টা। 'ওটা একটা গল্প। শুনেছি পাগল এক জেলের কাছ থেকে।'

দরজায় কে যেন ঠুকঠুক করে টোকা দিল। পরক্ষণে দরজা খুলে গেল, ভিতরে ঢুকল বাবুর্চি মোস্তাফা আবুল। হাতে প্লাস্টিকের ট্রে। হাসি চাপতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল রানা। অসহায় চেহারা করে ঘরে ঢুকেছে চিফ স্টুয়ার্ড। প্রাণপণ অভিনয় করবার চেষ্টা করছে। এবং ভালও হচ্ছে।

কঠোর নিয়ম মেনে চলে সে, দিনে দুই বার নিজ বুটজুতো পালিশ করে। কখনও শার্টে ভাঁজ পড়লে দেরি না করে নতুন শার্ট পরে নেয়। বাংলাদেশ নেভি থেকে রিটায়ার করে পুরোপুরি মানিয়ে নিয়েছে সে মার্ভেল জাহাজে, অন্য কোথাও স্বস্তি নেই তার। এখন এমন এক চেহারা করেছে, মনে হলো পাক্কা মুসলিম, হাঁটতে গিয়ে হাজির হয়েছে শুয়োরের খোঁয়াড়ের ভিতর।

প্রায় জোর করে ধরে আনা অতিথিদের বোকা বানাতে খুলে ফেলতে হয়েছে তাকে কোট। শার্টের আস্তিন গুটিয়ে নিয়েছে। গলার বোতাম খোলা। 'গ্রিন টি, স্যর,' কুবলিকির দিকে চেয়ে বলল মোস্তাফা আবুল। 'ডিম সাম, পট স্টিকার্স ও লো মিন নুডল— সঙ্গে মুরগি।' অ্যাপ্রনের ভাঁজ থেকে একটা কাগজ নিয়ে রানার হাতে দিল। 'মিস্টার আহমেদ এটা আপনাকে দিতে বলেছেন।'

ট্রে নামিয়ে রাখল সে, সবার সামনে পেতে দিল প্লেট, পাশে ন্যাপকিন ও আরেক দিকে রুপালি কাঁটা-চামচ। একটা চামচ বা ন্যাপকিনও এক সেটের জিনিস নয়। তবে ন্যাপকিন বা চামচ পরিষ্কার।

এই ফাঁকে সোহেলের দেয়া কাগজ খুলে চোখ বোলাল রানা।

'একের পর এক মিথ্যা বলছে মেয়েটা।'

চট্ করে একবার গোপন ক্যামেরার দিকে দেখে নিল রানা। মৃদু গলায় বলল, 'তা তো বটেই।'

'কী যেন বললেন?' চায়ে চুমুক দিল কার্টা অস্টিন।

'হুম? হ্যাঁ। আমার ফার্স্ট অফিসার জানিয়ে দিল এখানে যত দেরি করব, পরের বন্দরে পৌঁছুতে ততই দেরি হবে। আসুন, খেয়ে নেয়া যাক।'

নিঃশব্দে খেয়ে নিল ওরা।

'অসুবিধে না হলে বলবেন আপনাদের পরের বন্দর কোন্‌টা?'

'ধন্যবাদ, আবুল, আর কিছু লাগবে না।' একবার মাথা দুলিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল বাবুর্চি। এবার বলল রানা, 'আমাদের পরের বন্দর কেপ টাউন। ব্রাজিল থেকে কাঠ নিয়ে এসেছি, যাবে জাপানে। তবে কেপ টাউন থেকে তুলতে হবে কয়েকটা কন্টেইনার, ওগুলো যাবে মুম্বাইয়ে।'

'এটা সত্যিই একটা পুরনো ফ্রেইটার, তা-ই না?' আনমনে বলল কার্টা অস্টিন। পরের কথায় মনে হলো নিজেকে বিশ্বাস করাতে চাইছে, 'জানতাম না এমন মালবোঝাই জাহাজ এখনও আছে।'

'খুব বেশি নেই। কন্টেইনারে ভরে মাল পাঠানো শুরু হওয়ার পর থেকে এখন আর এসব জাহাজ তৈরি করা হয় না। কন্টেইনার শিপ অনেক বেশি সুবিধাজনক। আমরা পাই পাউরুটির গুঁড়ো।' হাত দিয়ে ময়লা ডাইনিং রুম দেখাল রানা। 'ক্রমেই কমে আসছে ক্লায়েন্টের সংখ্যা, এত টাকাও নেই যে জাহাজ মেরামত করব। চোখের সামনে দেখছি শেষ হয়ে যাচ্ছে খুবই ভাল একটা জাহাজ।'

'তারপরও, সুন্দর রোমান্টিক একটা জীবন কাটিয়েছে ও,' বলল কার্টা।

ব্রোঞ্জ মূর্তির মত অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটির কণ্ঠে ওই হাহাকার কীসের? একটু চমকেই গেল রানা। নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হলো।

নানা মিশনে এই জাহাজ নিয়ে ঘুরছে ওরা বন্দর থেকে অন্য বন্দরে, ভান করছে পান্তা আনতে নুন ফুরিয়ে যায়। কথাটা যে খুব অবাস্তব, তা-ও নয়। আসলে গোটা বাংলাদেশের বাস্তবতাই এখন এমন। যা রোজগার, সব ফুরিয়ে যায় প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে। ওদের সঙ্গে কোথায় যেন বড় মিল ওই মেয়েটির, উদাস হয়ে উঠতে চাইল রানার অন্তর। আস্তে করে চায়ের কাপে চুমুক দিল,

কাপটা পিরিচে নামিয়ে মৃদু স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, একসময় ওর রোমান্টিক জীবন ছিল। আমাদের ভালবাসাও পেয়েছে অনেক।'

মিষ্টি হাসি ফিরল কার্টা অস্টিনের ঠোঁটে, কিন্তু চোখে একরাশ ক্লান্তি ও ব্যর্থতা। মনে হলো রানার মন পড়ছে। যেন মানুষটার জীবনের সমস্ত কষ্টের সঙ্গে ওর নিজ ব্যর্থতা মিলিয়ে নিতে চাইছে।

বাস্তবে ফিরতে চাইল রানা। 'ক্যাপ্টেন ইশাকা, আপনি ধাতব সাপ সম্পর্কে কী জেনেছেন?'

'কিছুই না, ক্যাপ্টেন,' বলল নামিবিয়ান বোট ক্যাপ্টেন। 'দাদু এবেলের মাথা খারাপ। মদের বোতল পেলেই অতিরিক্ত গিলে বেহেড মাতাল হয়ে যায়। তখন তার কথার কোনও আগামাথা কিচ্ছু থাকে না।'

কার্টা অস্টিনের উপর মনোযোগ ফেরাল রানা। 'আপনি কোন্ জাহাজ খুঁজছেন?' মেয়েটি দ্বিধার ভিতর পড়েছে, এ বিষয়ে কিছু বলতে চাইছে না; কাজেই প্রশ্নটা ফিরিয়ে নিল রানা। 'থাক্, না বললেও চলবে। ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে রত্নরাজি তোলবার সাধ্য নেই আমাদের।' মৃদু হাসল রানা। 'মারতেও পারব না ধাতুর সাপ। আজ তা হলে আপনি দাদু এবেলের ওই সাপের এলাকার দিকেই চলেছিলেন?'

কার্টা বুঝতে চাইল লোকটা ওকে পাগল ভাবছে কি না। একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল দুই গাল। 'ওটাই ছিল আমাদের পাওয়া শেষ সূত্র। ভাবলাম এত দূর এলাম, তো দেখেই যাই। এখন ভাবতে গিয়ে লজ্জাই লাগছে।'

'লজ্জা কেন?' একটু ঝুঁকল রানা।

মেস হলের দরজায় টোকা দিল নিশাত সুলতানা, ভিতরে এক পা রেখে বলল, 'ওটার ভিতর বেআইনী কিছুই নেই, ক্যাপ্টেন।'

'ধন্যবাদ, সেকেণ্ড মেট।' ড্রাগ বা অস্ত্রের জন্য ফিশিং বোট

হিল্ডাকে সার্চ করতে বলেছিল রানা। নামিবিয়ান ক্যাপ্টেনের দিকে চাইল। 'ক্যাপ্টেন ইশাকা, যারা আপনাদের উপর হামলা করল, তাদের ব্যাপারে কিছু জানাতে পারেন?'

'ওয়ালভিস বে-তে ওই ইয়ট দেখেছি। গত এক বছর ধরে মাসে একবার করে এসেছে। মনে হয় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেই। আফ্রিকায় ওরা ছাড়া কেউ অত দামি ইয়ট পাবে কোথায়!'

'ইয়টের ক্রুদের সঙ্গে কখনও কথা হয়নি, বা চেনেন না তাদের কাউকে?'

'না, স্যর। ওরা আসত, ফিউয়েল নিয়ে আবারও চলে যেত।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল রানা, মনের ভিতর গুছিয়ে নিতে চাইল সব তথ্য। কিন্তু কিছুই যেন একটার সঙ্গে অন্যটা মিলছে না। এটা বোঝা যাচ্ছে মূল কাহিনি থেকে অনেক সরে এসেছে কার্টা অস্টিন। ওই পাযলের টুকরো মেলাতে চাইলে আরও অনেক প্রশ্ন তুলতে হবে। সেক্ষেত্রে হয়তো জড়িয়েও পড়তে হবে অন্য কিছুর সাথে। কিন্তু এই মুহূর্তে তা সম্ভব নয়। নিজেকে বলল রানা, এখন আমাদের টপ প্রায়োরিটি বিজ্ঞানী আসিফ হায়দার চৌধুরিকে উদ্ধার করা। তারপরও মনের ভিতর কেমন যেন কাঁটার মত বিঁধছে।

হঠাৎ বলে উঠল রন কুবলিকি, 'ক্যাপ্টেন রানা, আপনি যা জানতে চেয়েছেন তার সবই বলেছি আমরা। এখন আপনার জাহাজ থেকে নেমে যেতে চাই। বন্দরে পৌঁছুতে অনেক সময় লাগবে আমাদের।'

'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করে বলল রানা। নতুন করে মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে চাইল। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, মিস্টার কুবলিকি। অবশ্য বোঝা গেল না কেন আপনাদের উপর হামলা হলো। এমন হতেই পারে এদিকে সত্যি রয়েছে ট্রেজার ভরা ডোবা জাহাজ। তারা হয়তো সোনাদানা তুলছে। সরকারের অনুমতি না নিয়ে এ

ধরনের অপারেশন চালালে সবার উপরই হামলা করতে পারে।' পালা করে কার্টা ও কুবলিকির দিকে চাইল রানা। 'তাই যদি হয়, আপনাদের বলব যত দ্রুত সম্ভব এ দেশ ছেড়ে চলে যান। এ ধরনের লোক ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক হয়।'

মাথা দোলাল রন কুবলিকি, কিন্তু মনে হলো না কথাটা মেয়েটি মেনে নেবে। এ বিষয়ে দ্বিতীয়বার কিছু বলল না রানা।

'মিস সুলতানা, আপনি অতিথিদের ফিরিয়ে নিয়ে যান তাঁদের বোটে, যদি ফিউয়েল দরকার হয়, সেটা দেবেন।'

'জী, ক্যাপ্টেন।'

প্রায় একইসঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠল সবাই। টেবিলের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল রানা। ক্যাপ্টেন ইশাকা ও রন কুবলিকির সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল। মেয়েটির হাত ধরতেই সামান্য ঝুঁকে এল সে। নিচু স্বরে বলল, 'আমি একটু আলাদা ভাবে আপনার সঙ্গে দুয়েকটা কথা বলতে চাই, ক্যাপ্টেন।'

'নিশ্চয়ই,' নিশাতের দিকে চাইল রানা। 'এঁদের নিয়ে যান বোটে। একটু পর মিস অস্টিনকে নিজে পৌঁছে দেব আমি।'

অন্যরা চলে যেতেই আবারও যে যার চেয়ারে বসল ওরা। রানা টের পেল, দক্ষ রত্নবণিক যেভাবে আকাটা হীরা যাচাই করে, ঠিক সেভাবে ওকে দেখছে মেয়েটি। কয়েক মুহূর্ত এভাবে পেরিয়ে গেল, তারপর কিছু একটা সিদ্ধান্তে এল কার্টা। টেবিলের উপর কনুই নামিয়ে রাখল।

'আমার মনে হয়েছে, আপনি একজন প্রতারক।'

হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে গেল রানা। কয়েক মুহূর্ত মেয়েটির চোখে চোখ রেখে বলল, 'এক্সকিউজ মি, ম্যাম?'

'কেন তা বলতে পারি না, তবে আপনি আমাদের সঙ্গে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। এই জাহাজটা ভুয়া। ক্রুরাও সবাই ভান করছে। আপনারা যা নন, তাই দেখাচ্ছেন।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল রানা। সাগরে ওর গোয়েন্দা এজেন্সি নতুন ফ্রন্ট খুলবার পর থেকে বহু বন্দর ঘুরেছে ওরা মার্ভেল জাহাজ নিয়ে, কখনও কেউ খুঁজে পায়নি কোনও ত্রুটি। হার্বার অফিশিয়াল, যত রকমের ইন্সপেক্টর, এমন কী পানামা ক্যানেলের পাইলটও কখনও কোনও অস্বাভাবিকতা দেখেনি। তা জাহাজেরই হোক বা ক্রুদের ভিতরই থাক।

এ মেয়ে জানে না মার্ভেল আসলে কী ধরনের জাহাজ, ভাবল রানা। ওরা বন্দরে ইন্সপেকশনের সময় যত কৌশল ব্যবহার করে, এখানে খোলা সাগরে তা করা হয়নি, কিন্তু অপ্রশিক্ষিত চোখে কোনও মানুষ মাত্র পনেরো মিনিট ডাইনিং রুমে বসে থেকে সব বুঝে ফেলবে, তা হতে পারে না। মন্থর হয়ে এল রানার হৃৎপিণ্ডের গতি।

'ধরে নিচ্ছি এসব কথা আমাকে অপমান করার জন্য নয়,' বলল রানা। 'আসলে কী বলতে চান, একটু খুলে বলুন তো?'

'যেমন একটা ব্যাপার, আপনার হেলমসম্যানের গলায় একটা সোনার চেইন ও লকেট দেখলাম। ওই কোম্পানির লকেট ছিল আমার বাবার। দাম কমপক্ষে এক হাজার ডলার। আপনারা যদি এতই গরীব, তো ওই জিনিস কোথা থেকে পেল ওই লোক?'

'সন্দেহ নেই ওটা নকল।'

'তা হলে মাত্র পাঁচ দিনেই নোনা হাওয়ায় রং জ্বলে যাওয়ার কথা। আমি জানি, কারণ কিশোরী বয়সে নকল একটা কিনে দিয়েছিলেন আমার বাবা। তিনি মার্চেন্ট মেরিনে কাজ করতেন। ওটা গলায় পরে বাবার বোট নিয়ে বেরুতাম।'

আচ্ছা, এই মেয়ে একেবারে জাহাজ দেখেনি তা নয়, ভাবল রানা। 'হয়তো নকল নয়, আসলই, কোনও চোরের কাছ থেকে কিনেছে। ওর কাছে জানতে চাইতে পারেন। আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'হতে পারে চোরের কাছ থেকেই কিনেছে,' বলল কার্টা। 'কিন্তু আপনার স্টুয়ার্ডের ব্যাপারে কী বলবেন? গত কয়েক বছর হলো লণ্ডনে, দেখলেই চিনি ইংলিশ বুটজুতো। ওটার দাম কমপক্ষে দুই শ' পাউণ্ড। ওটাকে কী বলবেন আপনি, ওই লোকও চোরের কাছ থেকে কিনেছে?'

'আসলে খুব বড়লোক পরিবার থেকে এসেছে ও, পাগলাটে মানুষ বলে আঠারো বছর বয়সে সাগরে ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে। দেশের বাড়িতে ওদের জমিদারী। গত বছর মোমবাসায় ওর সঙ্গে পরিচয়। বলল জাহাজে স্টুয়ার্ডের কাজ করতে চায়। তাকে বেতনও দিতে হবে না। এরপর তাকে ফেরাতে পারি?'

'আ...আ...চ্ছা?' সুর করে বলল কার্টা।

'বিশ্বাস না হলে ওর কাছ থেকেই জেনে নিন। ডাকব?'

'বাদ দিন। আপনি একের পর এক আলটপকা যুক্তি তৈরি করবেন। কিন্তু এবার বলুন, আমি যখন প্রথম আপনার জাহাজ দেখলাম, চিমনি দিয়ে কোনও ধোঁয়া বেরুচ্ছিল না।'

ওটা ইঞ্জিনিয়ার আফতাবের নিন্দনীয় কাজ, ভাবল রানা। আগেই ধোঁয়ার জেনারেটার চালু রাখা উচিত ছিল। পরে মনে হয়েছে বড় কোনও ভুল করেনি ওরা। এখন জবাব দিতে গিয়ে মুশকিলের ভিতর পড়তে হচ্ছে।

'আমি প্রথমে ভেবেছি এই জাহাজ পরিত্যক্ত, তারপর দেখলাম বো থেকে উঠছে সাদা ফেনা, সামনে বাড়ছে জাহাজ। এর কয়েক মিনিট পর দেখলাম চিমনি দিয়ে উঠতে শুরু করেছে ধোঁয়া। বলা যায় ভকভক করে বেরুতে লাগল। আপনারা আমাদের দিকে বিশ নট গতি তুলে আসতে লাগলেন। তারপর আমরা পৌঁছে গেলাম আপনাদের জাহাজে, ব্রিজে এসে কী দেখলাম? ...হ্যাঁ, টেলিগ্রাফ লক্ষ্য করে বুঝলাম ওটা অল স্টপে রাখা। এসব যদি বাদই দিই, তারপরও তো কথা থাকে—

আপনার জাহাজ যে আকারের, তেমন বড় কোনও জাহাজ অত দ্রুত ঘুরে যেতে পারে না। ধরে নিতে পারি, আপনাদের রয়েছে ইসোপড ডিরেকশনাল থ্রাস্টার। কিন্তু তাই বা কী করে হয়? এই জাহাজ সাগরে নামার অনেক পর এসেছে ওই টেকনোলজি। ...এবার একটু খুলে বলুন সব, ক্যাপ্টেন রানা।'

'এসবে আপনার কী-ই বা যায় আসে?' আত্মরক্ষা করতে চাইল রানা।

'আজ একদল লোক আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে, কাজেই আমি জানতে চাই তারা কারা। আমার মনে হয়েছে আপনি একবার যখন ওদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, ইচ্ছে করলেই আমাকে আরেকটু সাহায্য করতে পারেন।'

'আপনি আসলে ভুল ভাবছেন, কার্টা। আমি আসলেই জং ধরা একটা বালতির ক্যাপ্টেন, বেশি দিন নেই এই জাহাজ ভাঙতে ব্রেকার্সদের হাতে তুলে দেয়া হবে। আপনাকে সাহায্য করবার কোনও উপায় নেই আমার।'

'তা হলে আমি যা দেখেছি তা অস্বীকার করছেন না?'

'জানি না আপনি কী দেখেছেন, তবে মার্ভেলের কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। আমরা জাহাজের ক্রুরা বড় সাধারণ।'

উঠে দাঁড়াল কার্টা অস্টিন, ধীর পায়ে চলে গেল খুদে ক্যামেরার কাছে, আস্তে করে সরিয়ে নিল সামনের ছবিটা। একটু মুখ থুবড়ে বেরিয়ে এল ক্যামেরা, পিছনে তার। 'কোনও বৈশিষ্ট্য নেই?'

একটু কালচে হয়ে গেল রানার মুখ।

'প্রথম যখন মোস্তাফা আবুল এসে আপনার হাতে কাগজ দিল, আপনি পড়েই বললেন *তা তো বটেই*, ঠিক তখনই বুঝলাম কেউ আমাদের উপর চোখ রেখেছে।' রানা কিছু বলবার আগেই আবারও বলল কার্টা, 'সেজন্যই বলছি, আসুন, আমরা একটা চুক্তি

করি, ক্যাপ্টেন রানা। অসত্য বন্ধ করুন, আমিও মিথ্যা থামিয়ে দেব।' আবার রানার মুখোমুখি বসল সে। 'ইন্টারনেটের চ্যাট রুমের মাধ্যমে কুবলিকির সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি আমার। আমরা ডিবিয়ার্সের সিকিউরিটি ডিভিশনে কাজ করি। আমাদের কাজ নিমজ্জিত জাহাজের ভিতর বিলিয়ন ডলারের হীরা থাকলে তা খুঁজে বের করা। হীরা সম্পর্কে কিছু জানেন আপনি?'

'শুধু শুনেছি প্রায় পাওয়াই যায় না, খুবই দামি, তা ছাড়া কোনও মেয়েকে পটাতে হলে ওটার তুলনা নেই।'

মৃদু হেসে ফেলল কার্টা। 'প্রথম দুটো ঠিক। পরেরটা ঠিক নয়।'

'তাই? বেশির ভাগ পুরুষ তো মেয়েদের খুশি করতে একের পর এক হীরা কেনে। নিশ্চয়ই আপনিও অনেক পেয়েছেন? মিথ্যা বলব না, আপনি সত্যিই অদ্ভুত সুন্দর।'

'আমাকে পটাতে চাইছেন?' হেসে ফেলল কার্টা। 'না, কারও দেয়া হীরা নেয়ার সময় হয়নি আমার। আর যা বললেন: হীরা সত্যিই দুর্মূল্য, কিন্তু মোটেও দুর্লভ নয়। বলতে পারেন সাধারণ পাথরের মত অত বেশি পাওয়া যায় না। অনেকে ভাবে হীরা পাওয়াই যায় না, এ একদম ঠিক কথা নয়। কৃত্রিম ভাবে দাম বাড়িয়ে রাখা হয় হীরার, এর মূল কারণ পৃথিবীর পঁচানব্বুই ভাগ হীরার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে একটি মাত্র কোম্পানি। তারাই বেশির ভাগ খনির মালিক, তারাই ইচ্ছামত দাম বাড়ায় বা কমায়। যখনই নতুন কোনও হীরা-ক্ষেত্র আবিষ্কার হয়, এরা গিয়ে অনেক বেশি দামে সব কিনে নেয়। ফলে প্রতিযোগিতার সুযোগ থাকে না। এদের কাছে ওপেককে শিশু মনে হতে পারে। এই কোম্পানির কয়েকজন এগযেকিউটিভ আছে যারা ইউনাইটেড স্টেটসে পা রাখলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের অ্যান্টিট্রাস্ট ভায়োলেশন্সের কারণে গ্রেফতার করা হবে।

'এই মানুষগুলো তাদের সিন্দুক থেকে এক মুঠো এক মুঠো করে বাজারে বিক্রি করে হীরা, নিজেদের খুশি মত দাম হাঁকায়। চাহিদার সঙ্গে তুলনা করে সর্বক্ষণ বাড়িয়ে রাখা হয় দাম। প্রয়োজনীয় হীরার মজুদ কমে এলে বাড়ানো হয় উৎপাদন। আবার একটু বেশি হয়ে গেলে সমস্ত পাথর চলে যায় লণ্ডনের ভল্টে। ...এবার চিন্তা করুন, হঠাৎ যদি বাজার-দামে বিলিয়ন ডলারের হীরা জোগান দেয়া হয়, কী হতে পারে?'

'দাম অনেক পড়ে যাবে।'

'তার মানেই আমাদের মনোপোলি শেষ, পুরো বাজার ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবে। কোটি কোটি মহিলা বুঝবে খামোকা তারা আসলে কিছু সাধারণ পাথর আঙুল বা গলায় পরে। এর ফলে পুরো পৃথিবীর অর্থনীতি মস্ত ঝাঁকির ভিতর পড়বে। তার মানেই হুমড়ি খেয়ে পড়বে সোনার দাম বা দেশগুলোর মুদ্রা।'

পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা। গত কয়েক বছর আগে ওই পরিস্থিতির দিকে ঝুঁকে পড়ে বিশ্ব অর্থনীতি, বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে সোনার বাজার।

'এখন যদি সত্যিই ট্রেজার ভরা কোনও নিমজ্জিত জাহাজ থাকে, মাত্র দুটো পথে পরিস্থিতি সামলে নিতে পারে আমাদের কোম্পানি। প্রথম কাজ, অপেক্ষা করা। কেউ যদি সত্যিই হীরার বড় চালান পেয়ে যায়, তার কাছ থেকে যত দামেই হোক কিনে নিতে পারে। এবং সেটা আমাদের কোম্পানি কখনও চায় না, কাজেই দ্বিতীয় পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়।'

'আপনারা নিজেরাই নিমজ্জিত রত্নরাজি খুঁজে বের করেন।'

খাড়া নাকের ডগায় তর্জনী রাখল কার্টা। 'ঠিকই ধরেছেন। এই প্রথম আমি সূত্র সংগ্রহ করে বুঝতে পারি কোথায় থাকতে পারে হীরার বড় একটা চালান। কাজেই আমাকেই দেয়া হয় দায়িত্ব। সঙ্গে দেয়া হলো প্রায়-অবিশ্বাসী রন কুবলিকিকে। সে

আমার কোনও কাজেই আসেনি। যে দায়িত্ব পেয়েছি তা আমার পাওয়া সবচেয়ে বড় অ্যাসাইনমেন্ট। এর ফলে আমার ক্যারিয়ার বড় একটা মোড় নিতে পারে। সত্যি যদি পাথরগুলো পাই, আমাকে বোধহয় কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট করে দেয়া হবে।'

'কোত্থেকে এল এত হীরা?' জানতে চাইল রানা। খুব একটা আগ্রহী নয়, কিন্তু মেয়েটির মুখের কথাগুলো শুনতে ভাল লাগছে।

'এই গল্পের শুরুতে রয়েছে অদ্ভুত একটা কাহিনি,' বলল কার্টা। 'এসব হীরা তোলা হয় কিম্বারলি খনি থেকে। সে সময় মজুর হিসাবে ওখানে নিয়োগ দেয়া হতো হারেরো উপজাতির কিছু লোককে। তাদের রাজা জানতেন আগে হোক বা পরে দখলদার জার্মানদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে দেশ, তা-তে অনেক টাকার প্রয়োজন। তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তাঁদের হাতে প্রচুর হীরা থাকতে হবে। আর ওই হীরা দিয়েই কিনে নেবেন ইংরেজদের দেয়া নিরাপত্তা। এরপর দশ বছরের বেশি ধরে কিম্বারলির খনিতে কাজ করল তাঁর বিশ্বস্ত অনুচররা, নিজেদের দেশে সরিয়ে আনতে লাগল প্রচুর হীরা। রিসার্চ করার সময় জানতে পেরেছি, ওই মজুররা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি ফুরিয়ে যাওয়ার দুই বা তিন মাস আগে নিজ হাত বা পা কেটে মাংসের ভিতর রেখে দিত হীরা। শুকিয়ে যেত ঘা। দেশ থেকে আসার সময় পুরনো ক্ষতচিহ্ন নিয়েই আসত তারা। খনি এলাকায় কাজ শুরু করার পর যখন ভাল হীরা পেত, পুরনো ক্ষতচিহ্ন নতুন করে খুলে তার ভিতর লুকিয়ে রাখত হীরা। এক বছর পর যখন চুক্তি শেষ হতো, প্রহরীরা তাদের ভাল করে পরীক্ষা করে দেখত। প্রায়ই দেখা যেত ছুরি দিয়ে নতুন ক্ষতচিহ্ন কেটে হীরার আছে কি না দেখা হতো। গলার ভিতরও ঝুলিয়ে রাখা হতো হীরা। কিন্তু কখনও বহু পুরনো ক্ষতচিহ্ন খুলে দেখা হতো না।'

'মানুষগুলো সাহসী ও চালাক ছিল,' মন্তব্য করল রানা।

'আমার রিসার্চে দেখেছি এই লোকগুলো সবচেয়ে ভাল এবং বড় হীরা সরিয়ে নিত। কিন্তু এভাবে পাওয়া হীরার সম্ভার এক দিন ডাকাতি হয়ে গেল।'

'ডাকাতি?'

'পাঁচ ইংরেজ ওই কাজটা করল। তাদের একজন ছিল এক তরুণ, তার বাবা ছিল হারেরো ল্যাণ্ডের মিশনারি। ওই লোকের জার্নাল পড়ে এক এক করে কাহিনির টুকরোগুলো একত্র করেছি। ডাকাতি হয়ে যাওয়ার পর ওই লোক ছেলেকে খুঁজতে বেরুল। সে জার্নালে লিখেছে কী ভয়ঙ্কর ভাবে শাস্তি দেবে ছেলেকে।

'সে বর্ণনায় গেলাম না, বিরক্ত হয়ে উঠবেন। ওই কিশোর বয়সী ছেলেটা ভিড়ে গেল জিম উফোর্ড নামের এক অভিযাত্রীর সঙ্গে। তাদের সঙ্গে ছিল আরও তিনজন লোক। পরিকল্পনা মত তারা কেপ টাউনে বাষ্পচালিত এইচএমএস চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে যোগাযোগ করল, জানিয়ে দিল তারা সে সময়ের জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় জাহাজের জন্য অপেক্ষা করবে। এই অভিযাত্রীরা ঠিক করল ঘোড়ার পিঠে কালাহারি ও নামিব মরুভূমি পেরিয়ে পৌঁছবে জাহাজের কাছে।'

'আন্দাজ করছি এরপর আর কখনও এইচএমএস চ্যালেঞ্জার ফিরে আসেনি।'

'বার্তা পাওয়ার পর কেপ টাউন ত্যাগ করে, এবং ধারণা করা হয় সাগরে হারিয়ে গেছে।'

'আপনি ভাবছেন রাজা সলোমনের খনির মত গল্প নয় ওটা। কেন ভাবলেন এদিকের সাগরে থাকবে জাহাজটা?'

'যেখান থেকে হীরা ডাকাতি হয়েছে, সেখান থেকে মানচিত্রে সোজা একটা রেখা পশ্চিমে টেনেছি আমি। সবচেয়ে কঠিন মরুভূমি পেরুতে হয়েছে লোকগুলোকে। কাজেই ধরে নিতে পারি সরাসরি চলেছে। তারা ওয়ালভিস বে থেকে উত্তর দিকে সত্তর

মাইল দূরে হাজির হয়।'

মেয়েটির যুক্তির ভিতর আরও খুঁত পেল রানা। 'কে বলবে কেপ টাউন থেকে রওনা হয়েই ডুবে যায়নি চ্যালেঞ্জার? হয়তো এক সপ্তাহ পর ডুবেছে। আরেকটা ব্যাপার, ওই অভিযাত্রীরা যদি গন্তব্যে পৌঁছুতেই না পারে? হয়তো এখনও মরুভূমির ভিতর পড়ে আছে হীরাসহ তাদের দেহাবশিষ্ট।'

'প্রথম যখন রিসার্চ শেষ করলাম, এই একই কথা বলেছেন আমার বস্। তখন তাঁকে বলি: আমি যদি এসব বের করতে পারি, অন্য কেউ-ও পারবে। এমনও হতে পারে উপকূল থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে পানির নীচে পড়ে আছে দশ বিলিয়ন ডলারের হীরা। ওসব পেতে হলে লাগবে মাত্র একটা স্কুবা ট্যাঙ্ক ও ফ্ল্যাশলাইট।'

'উনি কী বললেন?'

'"তোমাকে এক সপ্তাহ দিলাম, সঙ্গে রন কুবলিকিকে। যাই ঘটুক, যত প্রমাণ জোগাড় করেছ, সব নষ্ট করে ফেলবে।"'

'কয়েক শ' বর্গ মাইল এলাকার জন্য দিল এত কম সময়,' মন্তব্য করল রানা। 'আপনার সঙ্গে লাগবে জাহাজ। সাইড-স্ক্যান সোনার থাকতে হবে, সঙ্গে মেটাল ডিটেক্টর। তার মানেই এই নয় যে আপনি আবিষ্কার করবেন হীরাগুলো।'

কাঁধ ঝাঁকাল কার্টা। 'আমার কথা খুব গুরুত্ব দেননি বস্। আমাকে দিয়েছেন এক সপ্তা, সামান্য টাকা আর ঘাড়ে সিন্দবাদের জিনের মত ভারী কুবলিকিকে। বাধ্য হয়ে স্থানীয় জেলেদের কাছ থেকে তথ্য জোগাড় করতে শুরু করেছি।'

'সাধারণ কৌতূহল, জানতে ইচ্ছে হচ্ছে আপনার বসের কাছে প্রস্তাব দিলেন কেন। আপনি নিজেই তো জাহাজটা খুঁজতে পারতেন। হয়তো তা হলে পেয়ে যেতেন অত হীরা।'

ঠোঁট বাঁকিয়ে ফেলল কার্টা অস্টিন, মনে হলো ওকে ভয়ঙ্কর

অপমান করা হয়েছে। একটু বেশিই বলে ফেলেছে, টের পেল রানা।

'ক্যাপ্টেন, এ ধরনের চিন্তা একবারের জন্যেও আমার মনে আসেনি। ওই হীরাগুলো তোলা হয় ডিবিয়ার্সের খনি থেকে। ওগুলোর মালিক ওই কোম্পানি। ওই হীরা আমি নেব কেন? সেটা তো চুরি। অন্যের ভল্টে ঢুকে পকেটে হীরা পুরতে থাকার মত হয়ে যেত ব্যাপারটা।'

'কথাটা বলেছি সেজন্য দুঃখিত,' মেয়েটির সততা দেখে খুশি হয়েছে রানা। 'ওই কাজ করা সত্যিই খুব অন্যায় হতো।'

'আন্তরিক ভাবে দুঃখ প্রকাশ করলেন বলে ধন্যবাদ,' বলল কার্টা। একটু ঝুঁকে বসল। 'এবার বলুন, আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন? আমি আপনাকে বড় কোনও আশা দিতে পারব না, কিন্তু আপনি চ্যালেঞ্জার খুঁজবার কাজে সময় দিলে সেজন্য আমার কোম্পানি নিশ্চয়ই উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা দিলেই আপনি পৌঁছে যাবেন দাদু এবেলের সেই জায়গায়।'

চুপ করে কী যেন ভাবছে রানা। তখনই কিছু বলল না। চেয়ে আছে সিলিঙের দিকে। ভাবছে এরপর কী করবে। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, হাঁটতে শুরু করল দরজার দিকে। না ফিরেই বলল, 'কিছুক্ষণের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।' এবার খাস বাংলায় মাইক্রোফোনে বলল, 'সোহেল, আমার কেবিনে চলে আয়।' ক্যাপ্টেনের নকল কেবিনের কথা বলেছে রানা। মেস হল ও অপারেশন্স সেন্টারের মাঝে রয়েছে ওই কেবিন।

কয়েক বার বাঁক ঘুরে নোংরা কেবিনের বাইরে সোহেলকে দেখতে পেল রানা। বিসিআই অ্যাডমিনিস্ট্রেটার হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে একটা বালকহেডে, ঠোঁটে ঝুলছে সিগারেট। কী যেন ভাবছে। রানা কাছে পৌঁছে যেতেই সোজা হয়ে দাঁড়াল সোহেল। দরজা পেরিয়ে কেবিনে ঢুকে পড়ল ওরা। নাক কুঁচকে গেল

সিগারেটের বাসি ধোঁয়ার গন্ধে।

'তোর কী মনে হয়?' সরাসরি জানতে চাইল রানা।

'এসবের ভিতর জড়িয়ে না পড়াই বোধহয় ভাল। সোজা কেপ টাউনে গিয়ে তুলে নেব আমাদের ইকুইপমেন্ট। আসিফ হায়দার চৌধুরি বুড়ো হয়ে মরে যাওয়ার আগেই তাকে উদ্ধার করতে হবে।'

'সেটা তো বুঝলাম। কিন্তু মেয়েটার কথা থেকে কী বুঝলি?'

'সব মিলে মনে হয়েছে গাঁজাখুরি কাহিনি।'

'আমিও তাই ভাবতাম, কিন্তু নিজ চোখে দেখেছি ওদের উপর হামলা হয়েছে।'

'তুই কোনও বড় ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছিস?'

'কোনও বড় কারণ ছাড়া মিলিয়ন ডলারের ইয়ট নিয়ে কারও উপর কেউ হামলে পড়ে না। আমার ধারণা কিছু লুকাতে চাইছে তারা। কার্টা অস্টিন বলেছে, ওরা জাহাজ খুঁজতে এসেছে কেউ জানে না। আমার মনে হচ্ছে ওই লোকগুলো ওই ডুবে যাওয়া জাহাজ পাহারা দিচ্ছে না, অন্য কিছু লুকাতে চাইছে।'

'তুই কি দাদু এবেলের ধাতব সাপের কথা ভাবছিস?'

'বড় কোনও ঘটনা ঘটছে এখানে, দোস্ত।' সরাসরি বন্ধুর চোখে চাইল রানা।

পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে রইল দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল সোহেল, 'এসব ব্যাপারে তোর ভুল হয় না। এবার কী করতে চাস?'

'মার্ভেলকে আর এখানে আটকে রাখতে চাই না। আমি চলে গেলেই সোজা কেপ টাউনে যাবি। ইকুইপমেন্টগুলো তুলে নিয়ে ফিরতি পথ ধরবি। তার আগে ক্যাপ্টেন আলম সিরাজকে বলবি কপ্টার নিয়ে যেন চলে যায় সাপের এলাকায়।'

ভদ্রলোক এয়ার ফোর্স থেকে অবসর নিয়ে যোগ দিয়েছেন

মার্ভেল জাহাজে। তাঁর দায়িত্বে রয়েছে এমডি-৫২০এন কপ্টার। জিনিসটা রাখা হয় পিছনের গোপন এক হোল্ডে। 'কার্টা অস্টিনের কাছ থেকে কোঅর্ডিনেট্স নিয়ে তোকে জানিয়ে দেব কোথায় যেতে হবে।'

'এদিকে তুই যাবি ওয়ালভিস বে-তে?'

'নিজ কানে দাদু এবেলের কথা শুনতে চাই। তা ছাড়া, মেয়েটির চপার জকির সঙ্গে আলাপ করব। উপরের একটা ডেভিট থেকে একটা বোট নেব, বোট গ্যারাজের খবর পাবে না কার্টা।' মার্ভেলের বাইরের অন্য সব কিছুর মতই অতি পুরনো চেহারা দুই লাইফ বোটের। কিন্তু বাস্তবে ওগুলো জাহাজের মতই হাই-টেক। যদি রেঞ্জ থাকত, ওগুলোর একটা নিয়ে অনায়াসে হারিকেন সিযনে আটলান্টিক পাড়ি দিতে পারত রানা।

'এক বা দুই দিন লাগবে আমার,' বলল রানা। 'তারপর মার্ভেল নামিবিয়া ফিরলেই যোগাযোগ করব।'

'বেশ,' রাজি হয়ে গেল সোহেল।

'গত এক ঘণ্টা ছিলাম যিম আর মেস হলে, নতুন কোনও খবর আছে?'

'হ্যাঁ, আমাদের জন্য উপযোগী একটা বিমান ভাড়া করেছে ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসান। এটিভি অপেক্ষা করছে কেপ টাউনের ডানকান ডকে। এদিকে রায়হান ও স্বর্ণা ডেভিল্স্ ওয়েসিস নিয়ে কাজ করছে।'

স্বর্ণা কমপিউটার নিয়ে কাজ করতে গিয়ে জেনেছে, ডেভিল্স্ ওয়েসিস নামের এক কারাগারে থাকতে পারে আসিফ হায়দার চৌধুরি। ওই জায়গা নামিবিয়ায়। কাজেই জার্মান নামের উপর বেশি মনোযোগ দিয়েছে। প্রথম বেশ কিছু ডেটাও মিলেছে, তারপর প্রায় ফুরিয়ে গেছে তথ্য। মনে হয়েছে খামোকা কষ্ট করছে ও।

বিংশ শতাব্দিতে এসে ফ্রেঞ্চদেরকে নকল করল ইমপেরিয়াল জার্মান সরকার। ফ্রেঞ্চরা গর্বিত ছিল গায়ানা কারাগারের কারণে, নাম দেয়া হয়েছিল ডেভিলস ওয়েসিস। ওই দ্বীপে রাখা হতো সবচেয়ে খারাপ কয়েদি। জার্মান সরকার ওই কারাগারের মত করেই মরুভূমির ভিতর গড়ে তুলল ম্যাক্সিমাম-সিকিউরিটি প্রিযন। ওই এলাকার এক শ' মাইলের ভিতর কোনও লোকালয় ছিল না। স্থানীয় পাথর দিয়ে তৈরি কারাগার। চারপাশে শুধু মাইলের পর মাইল বালির ঢিবি। কোথাও পালাবার উপায় নেই। উপকূলে পৌঁছবার অনেক আগেই মরতে হবে। স্যানফ্রান্সিসকোর কুখ্যাত আলকাট্রাযের মতই জার্মানদের ওই কারাগার ছিল দুর্ভেদ্য। কখনও শোনা যায়নি মুক্তি পেয়েছে কোনও বন্দি। এরপর যুদ্ধে জড়িয়ে গেল জার্মানি, অর্থনীতি দুর্বল হয়ে যাওয়ায় উনিশ শ' ষোলো সালে বন্ধ করে দেয়া হলো বহু দূরের ওই কারাগার।

একসময় ওখানে ছিল একটা রেল লাইন, কিন্তু পরে সরিয়ে নেয়া হলো। একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওই কারাগার। পৌঁছুতে হলে যেতে হবে বিমান, কপ্টার বা অল টেরেইন ভেহিকেল নিয়ে। যে পথেই যাওয়া হোক, ভীষণ ঝুঁকি নিতে হবে। ওখানে অল্প কয়েকজন কিডন্যাপার আসিফ হায়দার চৌধুরিকে আটকে রেখে থাকতে পারে, তবে তারা অনেক আগেই টের পাবে কপ্টার বা ট্রাকের আওয়াজ। রানা ওর দলবল নিয়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছবার আগেই তাদের হামলা আসতে পারে।

দীর্ঘ ডেটাবেস ঘেঁটেছে স্বর্ণা, জোগাড় করেছে কমার্শিয়াল স্যাটালাইট ইমেজ। এসব কাজ শেষে ওরা জুনিয়াররা ওদের প্রিয় সোহেল ভাইকে ছেঁকে ধরেছে। আলোচনা করতে বসেছে সবাই। মোটামুটি ভাবে দাঁড় করানো হয়েছে একটা খসড়া পরিকল্পনা।

'কিডন্যাপারদের কাছ থেকে কিছু জানা গেল, বা ভদ্রলোকের কোম্পানি থেকে, সোহেল?'

'না, কিছুই না। তবে ওই কোম্পানির সঙ্গে কিছু এইচআরটি-র আলাপ চলছে।' সাধারণত এ কাজ করে মিলিটারি বা পুলিশ, কিন্তু নতুন কিছু কোম্পানি কিডন্যাপিং কেস ডিল করছে। রানা এজেন্সি এমনিতে এসব কাজ নেয় না, কিন্তু সোহেল আসিফ হায়দার চৌধুরী-নিকোলাস ক্রিস্টোফার ল্যাবোরেটরির সঙ্গে যোগাযোগ করে জানিয়েছে ওরা হোস্টেজ রেসকিউয়ার টিম।

'বস্ জানেন?'

'বলেছি। মোটেই অখুশি মনে হলো না। বললেন, ভদ্রলোক বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের জন্য অনেক করেছেন।'

'খবরের কাগজে পড়েছি। ...এবার একটা কাজ কর, কার্টা অস্টিনকে ফিশিং বোট পর্যন্ত পৌঁছে দে। ওর সঙ্গের লোকটাকে ও বলুক, জাহাজেই থাকবে। আরেকটা কাজ, ক্রুদের বলবি পোর্টসাইডের লাইফবোট নামিয়ে দিতে। আমি শাওয়ারে গেলাম। গুছিয়েও নিতে হবে ব্যাগ।'

'আমার কিছুই বলার নেই,' হলওয়ে ধরে রওনা হয়ে গেল সোহেল। 'উল্টো বাতাসেও তোর যে বদবু পাচ্ছি... বাপরে!'

গম্ভীর চেহারায় সোজা কেবিনে ফিরল রানা, দরজা বন্ধ করেই জুতো খুলে ফেলল, তারপর পোশাক ছেড়ে ঢুকে পড়ল বাথরুমে। চালু করল শীতল ঝর্না প্রবাহ, চুপচাপ ভিজতে লাগল। ভাবছে কীভাবে সাহায্য করবে মেয়েটিকে। ওর ধারণা, এদিকের সাগরে কোনও রত্নতরী নেই। ধাতব সাপ তো একেবারেই অবাস্তব ব্যাপার। কিন্তু এটা উড়িয়ে দিতে পারছে না, সত্যিই কার্টা অস্টিন খুন হতে চলেছিল লোকগুলোর হাতে। বিষয়টা জানতে হবে। লোকগুলো কারা ছিল? কী লুকাতে চেয়েছে?

শাওয়ার শেষে বেরিয়ে এসে লেদার ব্যাগে কিছু টয়েলেট্রিজ রাখল রানা, ওয়ারড্রোব থেকে নিল কয়েকটি পোশাক, একটা গায়ে চাপিয়ে নিয়ে পরে নিল শক্ত সোলের বুট। এবার চলে এল

ছোট্ট অফিস রুমে, ডেস্কে বসে ডায়াল করল অ্যান্টিক সেফের তালা। অভ্যস্ত হাতে দশ সেকেণ্ড লাগল শেষ পিন পড়তে। হ্যাণ্ডেল ধরে টান দিতেই খুলে গেল ভারী দরজা। এক শ' ডলারের বেশ কয়েকটা বাণ্ডিলের পাশে বিশ পাউণ্ডের তোড়া। এক পাশে ওর প্রিয় অস্ত্রগুলো। সবগুলো একসঙ্গে ব্যবহার করলে ছোটখাটো একটা যুদ্ধ শুরু করা যাবে। একসঙ্গে রাখা তিনটে মেশিন পিস্তল, দুটো অ্যাসল্ট রাইফেল, একটা কমব্যাট শটগান, রেমিংটন ৭০০ স্নাইপার রাইফেল, এক দিকের ড্রয়ারে স্মোক, ফ্র্যাগমেণ্টারি ও ফ্লাশব্যাং গ্রেনেড। পাশে শুইয়ে রাখা এক ডজন পিস্তল। রানা এক সেকেণ্ড ভাবল কী ধরনের পরিস্থিতির মুখে পড়তে পারে, পরের সেকেণ্ডে তুলে নিল মাইক্রো উজি সাবমেশিনগান ও গ্লক ১৯। ইদানীং নাম করেছে এফএন ফাইভ-সেভেনএন পিস্তল, ওটাই নিত, কিন্তু একই অ্যামিনিউশন দিয়ে দুই ধরনের অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ রাখল। গ্লক ও উজি দুটোই নাইন এমএম রাউণ্ড ব্যবহার করে।

স্প্রিং ঠিক রাখবার জন্য এক পাশে খুলে রাখা হয়েছে গুলি ছাড়া চারটে ম্যাগাযিন, ওগুলোর ভিতর বুলেট ভরল রানা, ব্যাগের কাপড়ের নীচে রেখে দিল অস্ত্র, ম্যাগাযিন ও এক বাক্স বুলেট। একবার নিজেকে দেখে নিল আয়নায়। হালকা ডাক ট্রাউজার্স ও বুক খোলা শার্টে কোনও পাগল প্রেমিক মনে হচ্ছে ওকে। নিজেকে বলল, আমি কার্টা অস্টিনের কাছে কোনভাবে ঋণী নই। একই রকম, ঋণগ্রস্ত নই আসিফ হায়দার চৌধুরির কাছেও। কিন্তু কোনও কাজ হাতে নিলে তা শেষ করাই উচিত।

ডেস্কের উপর থেকে ব্যাগ তুলে নিল রানা, কেবিন থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল ডেক লক্ষ করে। শিরার ভিতর টের পেল, দৌড়াতে শুরু করেছে অ্যাড্রেনালিন।

বারো

পরিত্যক্ত কারাগারে আবারও নতুন করে লোক বাস শুরু হতেই হাজির হয়েছে হাজারে হাজারে স্যাণ্ড ফ্লি। খোলা মরুভূমি থেকে গরম দেহের ঘ্রাণ পেয়েছে ওরা। কারাগারে এসে শুরু করেছে নিয়ত জ্বালাতন। কোনও মানুষ এত অত্যাচার করতে পারে না। খুদে পোকাগুলো দিনে ষাটটি ডিম পাড়ে, এখন কারাগার জুড়ে ঘুরছে তাদের বিশাল বাহিনী। আগেই কেমিক্যাল স্প্রে নিয়ে তৈরি ছিল প্রহরীরা, শত্রুদলকে দূরে সরিয়ে রেখেছে তারা। কিন্তু বন্দিদের ভাগ্য অতটা ভাল নয় ।

পাথুরে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে মেঝেতে শুয়ে আছে আসিফ হায়দার চৌধুরি, প্রাণপণে এখানে-ওখানে চুলকে চলেছে। নিজেকে পাগল-পাগল লাগছে তার। পোকাগুলোর কামড় খেয়ে দেহে এক ইঞ্চি জায়গা নেই যেখানে জ্বালা করছে না। কিন্তু এটাও ঠিক, এসব কষ্ট ওকে রক্ষা করছে অনেক ভয়ঙ্কর এক ভয় থেকে। মনের গভীরে ডুব দিতে পারছে না। এখন পর্যন্ত যা দেখেছে বা শুনেছে তাতেই জীবনের মায়া ছেড়ে দিয়েছে।

ডান কানের লতিতে একটা পোকা কামড় দিতেই কাকে যেন অভিশাপ দিল বিজ্ঞানী। দুই আঙুলে চট্ করে ধরে ফেলল পোকাটাকে, দুই বুড়ো আঙুলের নখের মাঝে রেখে পিষে দিল। নিজেও জানে না কখন থেকে যেন পোকাগুলোর শক্ত দেহ ভাঙতে

পারলেই সন্তুষ্ট হয়ে হুম্ বলছে। মস্ত এক যুদ্ধে হেরে গেছে আসিফ, এখন সামান্য কোনও লড়াইয়ে জিতলে তাতেই সন্তুষ্ট হতে হবে।

আকাশে বোধহয় চাঁদ নেই। সেল ব্লকের ভিতর ঘুটঘুটে অন্ধকার। চোখ খুললে মনে হয় এক দোয়াত আঁধার তুলে নিয়ে কলমের কালি হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে। কোথাও এক ফোঁটা বাতাস নেই। থমথম করছে চারপাশ, অথচ বাইরে মরুভূমিতে হু-হু হাওয়া চলবার কথা। বদ্ধ ঘরে থাকতে গিয়ে ভোঁতা হয়ে গেছে মগজ। ও যেন হয়ে উঠছে অসহায় কোনও বোবা প্রাণী। মরুভূমির বালি এসে ওর ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিকল করে দিয়েছে। এখন আর কোনও গন্ধ পাচ্ছে না। কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে জিভ, খাবারে কোনও স্বাদ নেই। গতকাল থেকে ওর মনে হচ্ছে ওকে আসলে ধুলো ছাড়া কিছুই খেতে দিচ্ছে না। এখনও কানে শুনছে, কোনও কিছু স্পর্শ করে বুঝতে পারছে জিনিসটা কী। সারাশরীরে টনটনে ব্যথা। দিনের পর দিন পাথরের মেঝেতে শুয়ে এমন হয়েছে। তার উপর রয়েছে পোকার কামড়।

'ক্যারেন?' নিচু স্বরে ডাকল আসিফ। সেলে ফিরবার পর থেকেই কয়েক মিনিট পর পর মেয়েটির সাড়া পেতে চাইছে। একবারও জবাব দেয়নি মেয়েটা। আসিফের মন বলছে ক্যারেন বোধহয় মরেই গেছে। আসলে ওর নাম ধরে ডাকছে শুধু নিজেকে স্থির রাখতে, নইলে হয়তো সত্যিই ভয়ে চিৎকার শুরু করবে।

হঠাৎ নীরবতার ভিতর মনে হলো সামান্য সাড়া দিল মেয়েটি। ওই আওয়াজ যেন সদ্য প্রসবজাত বিড়ালের বাচ্চার কান্না। দেয়ালের পাশে খসখস আওয়াজ হলো। পাথরের ওপাশে পোশাক নাড়ল কে যেন।

'ক্যারেন?' আগের চেয়ে একটু জোরে ডাকল আসিফ।

'ক্যারেন, আমার কথা শুনছ?'

দূরে গোঙানি শুনতে পেল ও।

'ক্যারেন, আমি আসিফ।' আমি ছাড়া কে থাকবে, মনে মনে বলল বিজ্ঞানী। 'তুমি কি কথা বলতে পারো?'

'ডক্টর চৌধুরি?'

ভাঙা কণ্ঠ, দুর্বল স্বর, তারপরও আসিফের মনে হলো পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি কণ্ঠ শুনেছে। 'হায় আল্লা, তুমি ভাল আছ, ক্যারেন? আমি ভেবেছি তোমাকে মেরে ফেলেছে ওরা।'

'প্রায় মেরেই ফেলেছে, স্যর,' থেমে গেল কণ্ঠ। তারপর শুরু হলো কাশি। কয়েক সেকেণ্ড পর এল গোঙানির আওয়াজ। 'কী হয়েছিল, স্যর? আমার মুখ ফুলে গেছে। শরীরও। মনে হয় পাঁজরের কয়েকটা হাড় ভেঙে গেছে।'

'তোমার মনে নেই কী হয়েছে? তোমাকে পেটানো হয়েছে। তুমি বলেছিলে ওরা কেউ তোমাকে একটাও প্রশ্ন করেনি।'

'ওরা আপনাকেও মেরেছে, স্যর? আপনি ঠিক আছেন তো?'

আরও ছোট হয়ে গেল আসিফের মন। লোকগুলো কী ভয়ঙ্কর ভাবেই না পিটিয়েছে বেচারিকে, তারপরও সে ওর খোঁজ নিচ্ছে। বেশির ভাগ মানুষ অন্যের বিষয়ে সামান্য খোঁজ নিয়েই নিজের গল্পের ঝাঁপি খুলে বসে, তারপর আর থামতে পারে না। সেখানে এই মেয়ে ওর সুস্থতা কামনা করছে! আসিফ মনে মনে বলল, খুব ভাল হতো ওকে এসবের সঙ্গে না জড়িয়ে পারলে। 'না, ক্যারেন,' নিচু স্বরে বলল সে। 'ওরা আমাকে মার-ধর করেনি।'

'সেজন্য ভাল লাগছে।'

'আমি বুঝতে পেরেছি কে আমাদের কিডন্যাপ করেছে। সে কী চায় তাও বোধহয় জানি এখন। প্রতিশোধ নিতে চায় সে।'

'সে কে, স্যর?' আশা নিয়ে জানতে চাইল ক্যারেন। বোধহয় ভাবছে এবার উদ্ধার পাবে।

'আমার প্রাক্তন ক্লাসফ্রেণ্ড ও বিজনেস পার্টনার।'

'ডক্টর ক্রিস্টোফার?'

'হ্যাঁ, নিকোলাস ক্রিস্টোফার।'

'কিন্তু কেন? কেন এ কাজ করলেন তিনি?'

'কারণ মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে ওর, ক্যারেন। তেতো মনের এক লোক হয়ে গেছে। পৃথিবীকে ভিন্ন চোখে দেখছে।'

'আপনার কথা আমি বুঝলাম না, স্যর।'

'কাউকে বোঝাতে পারব না, কিন্তু এটাই বাস্তব, ক্রিস্টোফার মানসিক ভাবে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।' চুপ হয়ে গেল আসিফ। ভাবতে শুরু করেছে এ পর্যন্ত কী করেছে ওর বন্ধু। কিন্তু কীসের জন্যে এসব করছে সে? প্রতিশোধ? প্রতিশোধ নেবে সে ইউনাইটেড স্টেটসের এক সুন্দরী মেয়ের উপর? বিশ্বের পরিবেশ নষ্ট করছে বলে ওই দেশকে শিক্ষা দেবে?

না।

ভাল করেই বন্ধুকে চেনে আসিফ, আসলে এসব করবে সে নিজের খেয়াল মেটাতে।

ওকে কিডন্যাপ করেছে বোঝাতেঃ আসলে তুমি কিছুই নও, আমিই ছিলাম সমস্ত সাফল্যের মূল চালিকা শক্তি।

ব্যবসা শুরু করবার সময় থেকেই ওরা ছিল দুই যমজ ভাইয়ের মত। আসিফের কাজই ছিল সবাইকে মুগ্ধ করা, ভাল কথায় নিজেদের ব্যবসা গুছিয়ে তোলা, ব্যখ্যা দেওয়া। কিন্তু এর ফলে মিডিয়া ধরে নিল আসিফই কোম্পানির মূল নায়ক। মিডিয়ার কাছে উপেক্ষিত হলো নিকোলাস ক্রিস্টোফার, স্টেজ মাতিয়ে তুলল আসিফ, আর সে থাকল উইংসের আড়ালে, আঁধারে। আসিফ কখনও ভাবেনি ওর প্রিয় বন্ধু এবং ভাই এভাবে খেপে উঠবে। এমআইটিতে নিকোলাস সবসময়ই ছিল মুখচোরা ছাত্র। আসিফ ধরেই নিয়েছিল, ও এমনই। তারপর আমেরিকান মডেল

মেয়েটা যখন ওদের দু'জনের ভিতর নানান বিবাদ তৈরি করল, তখনও আসিফ বলেছে, 'তুই ওকে বিয়ে কর্, আমি কিছুই মনে করব না।'

একটা কথাও বলেনি ক্রিস্টোফার, শুধু তিক্ত হেসেছে। কখন যে সে খেপে উন্মাদ হয়ে উঠেছে, বিন্দুমাত্র টের পায়নি আসিফ। তারপর ওই মেয়ে এক টেনিস তারকাকে বিয়ে করে বসল। কিন্তু ততক্ষণে ক্রিস্টোফার ঠিক করে ফেলেছে, আসিফ কখনও তার বন্ধু ছিল না। তখন থেকেই নিজেকে পুরো গুটিয়ে নিয়েছে সে, ঠিক করেছে আসিফ হায়দার চৌধুরিকে চরম শাস্তি দিতে হবে।

সম্পূর্ণ বদলে গেল নিকোলাস ক্রিস্টোফার, জেদাজেদি করে কোম্পানির সব শেয়ার বিক্রি করল আসিফের কাছে। মিশতে লাগল উচ্ছৃঙ্খল একদল পরিবেশবাদীর সঙ্গে। সাবেক বন্ধুর ক্ষতি করতে লেগে গেল বিপুল সম্পদ নিয়ে। তা-ও যখন পারল না, পুরোপুরি যোগ দিল পরিবেশবাদী টেরোরিস্টদের সংগঠনে। নিজ বাড়িতে বন্দি জীবন কাটাতে লাগল।

মনে মনে আফসোস করল আসিফ, সত্যি যদি চুপ করে বাড়িতে বসে থাকত! তা করেনি নিকোলাস, ক্রমেই আরও রেগে উঠেছে। আর এখন তো ভয়ঙ্কর কোনও পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছে। আর থামবে না সে, অনেক গভীরে ডুবে গেছে। বিশ্বের পরিবেশ সুন্দর করবার যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল, তা-ও বোধহয় বদলে গেছে।

'এখান থেকে যে করে হোক বেরিয়ে যেতে হবে, ক্যারেন।'

'ওরা আমাদের নিয়ে কি করতে চায়, স্যর?'

'নিকোলাসকে থামাতে হবে। পুরো পাগল হয়ে গেছে। একদল উন্মাদ পরিবেশবাদীকে জড় করেছে, বাস্তবে এরা সন্ত্রাসী, মানবতার ম-ও বোঝে না কেউ।' দুই হাতের ভিতর মুখ গুঁজে দিল আসিফ হায়দার চৌধুরি।

নিজের দায় ও দোষ কাঁধ পেতে নিয়েছে। ওর অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল রেগে উঠছে নিকোলাস। তখনই যদি লাইমলাইটে আনা যেত ওকে, কখনও এভাবে বিগড়ে যেত না। আসিফ খেয়ালই করেনি নিকোলাসের ভঙ্গুর ব্যক্তিত্ব খানখান হয়ে গেছে। একটু মনোযোগ দেয়ার অভাবে দানব হয়ে উঠেছে সে। নিজের উপর রেগে গিয়ে কখন যেন কাঁদতে শুরু করেছে আসিফ। নিজ কষ্টের জন্য ভাবছে না, মাথা ভারী হয়ে উঠছে ভবিষ্যতের বিপদের কথা ভাবতে গিয়ে। 'আমি দুঃখিত... আমি দুঃখিত,' বিড়বিড় করে বলে চলেছে। কার কাছে ক্ষমা চাইছে তা নিজেও জানে না। নিকোলাস ক্রিস্টোফারের কাছে? নাকি যাদের ক্ষতি হতে পারে, তাদের কাছে?

আঁধারে ভেসে এল দুর্বল কণ্ঠ: 'ডক্টর চৌধুরি? ...ডক্টর চৌধুরি, প্লিয, বলতে পারেন ডক্টর ক্রিস্টোফার কেন এমন করছেন?'

বেচারির গলা থেকে ঝরছে ভীষণ কষ্ট, কিন্তু কোনও জবাব দিতে পারল না আসিফ হায়দার চৌধুরি। হু-হু করে কাঁদছে, ছিঁড়ে পড়ছে ওর অন্তর। পরের বিশ মিনিট একটানা ফুঁপিয়ে গেল। তারপর শুকিয়ে গেল অশ্রুনালী।

আরও একটু পর নিজেকে সামলে নিতে চাইল, ভাঙা স্বরে বলল, 'আমি দুঃখিত, ক্যারেন। আসলে...' কোনও শব্দ এল না ওর মাথায়। কিছুক্ষণ পর বলল, 'আমার দোষেই বদলে গেল নিকোলাস। সবার সামনে আমি ছিলাম উজ্জ্বল তারকার মত। লাইমলাইট থেকে অনেক দূরে ছিল নিকোলাস। হিংসা করতে করতে এমন হয়ে গেল... আমার কথা বিশ্বাস করবে, ক্যারেন? এই আমারই জন্য বদলে গেল ও! হায় আল্লা, নিকোলাস পাগল হয়ে গেছে, কারণ আমি ছিলাম ওর চেয়ে জনপ্রিয়।'

কোনও জবাব দিল না ক্যারেন কুম্বস।

'ক্যারেন?' ডাক দিল আসিফ। কোনও সাড়া নেই। 'ক্যারেন? ...ক্যারেন! ...ক্যারেন!'

বদ্ধ পাথুরে ঘরে গুমরে মরছে আসিফের কণ্ঠ। মিলিয়ে গেল প্রতিধ্বনি। আবারও নেমে এল নীরবতা। অন্তরের ভিতর আসিফ অনুভব করল, নিকোলাস ক্রিস্টোফার একটা জীবন কেড়ে নিয়েছে।

তেরো

'ডেকের নীচে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারেন,' কার্টা অস্টিন হাই তুলতেই বলল রানা।

'না, ঠিক আছি।' আবারও হাই তুলল মেয়েটি। 'তবে আরেকটু কফি নেব।'

হাঁটুর কাছে রাখা রুপালি থার্মোস মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। লাইফবোটের ড্যাশবোর্ডের উপর পড়ে রইল ওর চোখ। চমৎকার ভাবে চলছে ইঞ্জিন। চার ভাগের তিন ভাগ ফিউয়েল এখনও রয়ে গেছে ট্যাঙ্কে। আর মাত্র এক ঘণ্টা পর ওয়ালভিস বে-তে পৌঁছবে ওরা।

মার্ভেল থেকে রওনা হওয়ার এক ঘণ্টা পর যোগাযোগ করেছে সোহেল। কপ্টার নিয়ে দাদু এবেলের সাপের এলাকার উপর দিয়ে ঘুরে গেছেন ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ। ওখানে নীল সাগর ছাড়া কিছুই ছিল না। তখন একবার ভেবেছে রানা, কার্টাকে পৌঁছে

দেবে ওর হোটেলে, তারপর বিমান ধরে চলে যাবে কেপ টাউনে, ওখান থেকে উঠবে মার্ভেলে। বিমানে করে চলে যাওয়া যৌক্তিক হলেও মেয়েটিকে কষ্ট দিতে চায়নি রানা।

কার্টা অস্টিনের সঙ্গে নিজের মনের বেশ মিল পেয়েছে। ওরা দু'জন কোনও কাজ আধাআধি রেখে থেমে যেতে শেখেনি। যত বড় চ্যালেঞ্জই আসুক, মোকাবিলা করতেই হবে। এদিকের সাগরে রহস্যজনক কিছু ঘটছে। কাজেই এর শেষ না দেখে থামবে না ওরা।

থার্মোসের কাপে কালো কফি ঢালল কার্টা, একটু একটু দুলছে ওর দেহ। সাগরের উপর দিয়ে ছন্দ তুলে এগিয়ে চলেছে লাইফবোট। কিন্তু এক ফোঁটা কফি পড়ছে না হাত থেকে। এখনও ওর পরনে হাফ প্যান্ট। রানা ওকে স্টোরেজ বিন থেকে একটা কমলা উইণ্ডব্রেকার দিয়েছে। নিজেও একটা বেঁধেছে কোমরে।

এই লাইফবোটে চল্লিশজনের এক সপ্তাহ চলবার মত খাবার রাখা থাকে। পানির জন্য রয়েছে খুদে ডিস্যালিনেটর। একটু লবণাক্ত থাকে পানি, তবে খারাপ লাগে না খেতে। কেবিনের বেঞ্চসিটগুলো দেখলে মনে হয় ফাটা, আসলে ওটা কিড লেদার দিয়ে তৈরি। বোটের চেহারা এমনই করা হয়েছে, যে-কেউ দ্বিতীয়বার এটার দিকে ঘুরে চাইবে না। সিলিঙে একটা প্যানেল থেকে নামিয়ে নেয়া যায় তিরিশ ইঞ্চির প্লাজমা টিভি। সঙ্গে রয়েছে বিশাল ডিভিডি লাইব্রেরি ও সাউণ্ড সিস্টেম।

বোটের প্রতিটি ভাঁজ ও কোনা ব্যবহার করে বাড়ানো হয়েছে যাত্রীদের আরাম-আয়েশ। কেউ সাগরে চললে খুশি হয়ে উঠবে এই বোট পেয়ে। এটা আসলে সাধারণ কোনও বোট নয়, বলা চলে লাকযারি মোটর ইয়ট। নিরাপত্তার জন্য বিশেষ যত্ন নেয়া হয়েছে। হ্যাচগুলো সিল করে দিলে পুরো এক গড়ান দিয়ে

আবারও ভেসে উঠবে বোট। প্রতিটি সিটের জন্য রয়েছে থ্রি-পয়েন্ট হার্নেস। যাত্রীদের ছিটকে পড়তে হবে না। লাইফবোটে আরও কিছু কৌশল ও যন্ত্রপাতি যোগ করেছে রানা। কার্টা অস্টিনকে ওসব দেখানোর ইচ্ছা ওর নেই।

দুই ভাবে এই বোট চালানো যায়। নীচে কেবিনের ভিতর বো-র কাছে রয়েছে এক সেট ডায়াল ও লিভার। ওগুলো ব্যবহার না করলে বোটের স্টার্নে রয়েছে সামান্য উঁচু একটা প্ল্যাটফর্ম, ওখান থেকেও বোট নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এখন ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা ও কার্টা। চুপ করে আছে ওরা। একটু আগে সাগরের বুকে ডুবে গেছে ঝলমলে সূর্য। কালো আকাশে দেখা দিয়েছে লক্ষ-কোটি নক্ষত্র। রানা ও মেয়েটির সামনে ছোট উইণ্ডস্ক্রিন, ওটাই ওদেরকে রক্ষা করছে লবণাক্ত পানির ঝাপটা থেকে। অ্যাণ্টার্কটিকার উত্তর থেকে ভেসে আসা শীতল বেঙ্গুয়েলা স্রোত দেখতে না দেখতে তাপমাত্রা নামিয়ে দিয়েছে ষাট ডিগ্রির নীচে।

উষ্ণতা পাওয়ার জন্য দুই হাতে কাপ ধরেছে কার্টা, ড্যাশবোর্ডের আবছা আলোয় মনোযোগ দিয়ে দেখছে রানার মুখ। মানুষটাকে অদ্ভুত আকর্ষণীয় লাগছে ওর। ঠোঁটের কোণে একইসঙ্গে খেলছে নিষ্ঠুরতা ও কোমলতা। দুটো একইসঙ্গে থাকে কী করে, ব্যাখ্যা করতে পারবে না কার্টা। মানুষটার আয়ত চোখের কুচকুচে কালো মণিদুটোর ভিতর সবসময় অথৈ সাগর খেলছে। সত্যিকারের নেতা, সহজেই সবার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেয়। মানুষটার অন্তর পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কার্টা নিজেকে সাবধান করল: এই পুরুষ চিরকালের একাকী, শীঘ্রিই হারিয়ে যাবে নিজ চলার পথে। কেউ ঠেকাতে পারবে না তাকে।

আরও মনোযোগী হলো কার্টা। মাসুদ রানা চট্ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, কখনও আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে না। কেন যেন

মনে হলো মানুষটার মিলিটারি ট্রেনিং আছে। তাই যদি হয়, তা হলে বোধহয় নেভিতে ছিল। অযোগ্য উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে বনেনি, ছেড়ে দিয়েছে চাকরি, বেরিয়ে পড়েছে সাগরে। নিজ দিগন্ত সে নিজেই স্থির করবে। আরও দুই শ' বছর আগেই তোমার আসা উচিত ছিল, মনে মনে বলল কার্টা। কল্পনায় দেখতে পেল, প্রশান্ত মহাসাগর চিরে চলেছে মাসুদ রানার বাণিজ্য তরী, ডেকের উপর স্তূপ করে রাখা মশলা ও সিল্ক।

'কী নিয়ে হাসছেন আপনি?' জানতে চাইল রানা।

'ভাবছিলাম ভুল সময়ে চলে এসেছেন।'

'তাই? কেন মনে হলো?'

'আপনি শুধু যে মেয়েদের উদ্ধার করেন তা-ই নয়, তাদের জন্য জীবনের ঝুঁকিও নেন।'

বড় দম নিয়ে কার্টুনের নায়কের মত করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল রানা। 'হ্যাঁ, সুন্দরী নারী, এবার সরে যাও, সাগরের ধাতুর সাপের সঙ্গে লড়ব আমি!'

হেসে ফেলল কার্টা। 'আপনাকে একটা প্রশ্ন করব?'

'বলুন।'

'আপনি যদি মার্ভেলের ক্যাপ্টেন না হতেন, কী হতে চাইতেন?'

প্রেমের জটিল স্রোতের দিকে মোড় নেবে না এই মেয়ে, বলল রানা, 'আমি নাবিক হতাম।'

'তাই? ক্যাপ্টেন হতে চাইতেন না?'

'না। ছোট একটা নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম দিগন্ত পাড়ি দিতে। দেখতে চাইতাম বহু দূরের ওপারে কী আছে।'

'নিজেকে সবসময় খুঁজতেন আপনি, চাইতেন কোনও মেয়ের গভীর ভালবাসা, কিন্তু বেশি দিন আপনাকে আটকে রাখতে পারত না তার মোহ।'

বিপজ্জনক মোড়ের দিকে চলেছে মেয়ে। চট্ করে জানতে চাইল রানা, 'আপনি কি হতেন?'

মিষ্টি হাসল কার্টা। 'কেন, আমি হতাম মার্ভেলের ক্যাপ্টেন!'

'সোহেল খুব খুশি হতো।'

'সোহেল? সে কে?'

'আমার বন্ধু, মার্ভেলের ফার্স্ট অফিসার।'

'খুব ঘনিষ্ঠ আপনারা?'

'ভাইয়ের মত। আপনাকে ফিশিং বোট হিল্ডার কাছে নিয়ে গিয়েছিল ও।'

'চিনেছি। খুব হাসিখুশি মানুষ।'

'ওর মত বিশ্বস্ত কাউকে দেখিনি। আর কেউ অমন বন্ধু হতে পারে কি না, আমার সন্দেহ আছে। আমি জানি, ওর মত করে পারিনি আমি।'

কফি শেষ করে রানার হাতে কাপ ধরিয়ে দিল কার্টা। প্যাঁচ মেরে থার্মোসের মুখ বন্ধ করল রানা। চট্ করে দেখে নিল কয়টা বাজে। প্রায় মাঝরাত।

'ভাবছি, আঁধারে সোয়াকোপমুণ্ডের ডকে না থেমে দক্ষিণে গিয়ে দেখা করি দাদু এবেলের সঙ্গে, তাতে কেউ সন্দেহ করবে না,' বলল রানা। 'ভোরে মাছ ধরতে বেরুনোর আগেই তার সঙ্গে কথা বলতে পারব। আপনার কি মনে হয়, আঁধারে তার ক্যাম্প খুঁজে পাবেন?'

'কোনও সমস্যা হবে না। সোয়াকোপমুণ্ড থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে স্যাণ্ডউইচ বে।'

জিপিএস চেক করে দেখল রানা। হিসাব কষে বের করল নতুন কোঅর্ডিনেটস কী হবে। কাজ শেষে সংখ্যাগুলো তুলে দিল অটোমেটিক ন্যাভিগেটরে। হুইলটাকে পোর্টে কয়েক ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিল সার্ভো।

চল্লিশ মিনিট পেরুনোর পর আঁধারে দেখা দিল আফ্রিকার উপকূল— চাঁদের উজ্জ্বল কিন্তু রহস্যময় আলোয় চকচক করছে বালির ঢিবি। কোথাও কোথাও ঝলমলে সাদা, ঢেউ গিয়ে আছড়ে পড়ছে সৈকতের উপর। স্যাণ্ডউইচ বে-কে আড়াল দিয়েছে যে পেনিনসুলা, সেটা সিকি মাইল দূরে, দক্ষিণে।

'ভাল ন্যাভিগেটিং,' মন্তব্য করল কার্টা।

জিপিএস রিসিভারের উপর টোকা দিল রানা। 'কৃতিত্ব এর। আমাদের মত ন্যাভিগেটরদের অলস করে দিয়েছে জিপিএস। এখন বোধহয় আর সেক্সট্যান্ট দিয়ে নিজের পজিশন কমপিউট করতে পারব না। পথ হারিয়ে মরেও যেতে পারি।'

'বিশ্বাস করলাম না।'

সামনে পড়বে ভঙ্গুর ইকো-সিস্টেম, থ্রটল নেড়ে গতি কমিয়ে আনছে রানা। বড় ঢেউ তৈরি করতে চাইছে না। প্রায় বিশ মিনিট পর ওরা পৌঁছে গেল বে-র দক্ষিণ প্রান্তে। ঘন নলখাগড়ার দেয়ালে আলো ফেলল কার্টা, খুঁজতে শুরু করল বিশেষ ঘাসের পর্দা। ওদিক দিয়েই দাদু এবেলের ছোট্ট লেগুনে ঢুকেছিল ওরা।

মিনিট পাঁচেক পর হঠাৎ বলে উঠল, 'ওই যে!'

শামুকের গতি তুলে সামনে বাড়ছে লাইফবোট, আস্তে করে ঢুকে পড়ল নলখাগড়ার প্রাচীরের ভিতর। ডেপথ গজের উপর চোখ রেখেছে রানা, বারবার দেখছে ভাসমান কোনও আর্বজনা যেন আটকে না দেয় প্রপেলার। নলখাগড়া থেকেই শুরু হয়েছে দীর্ঘ ঘাসের বন। উপরের অংশ বাতাসে শিসের মত আওয়াজ তুলছে। আদর করে বোটের দু' পাশের গা চুলকে দিচ্ছে ঘাস।

সত্তর গজ যাওয়ার পর হঠাৎ ধোঁয়ার গন্ধ পেল রানা। মুখ তুলে সামনে চাইল। কাঠ পুড়বার ঘ্রাণটা আর নেই। কয়েক সেকেণ্ড পর আগের চেয়ে অনেক জোরালো ভাবে এল। খপ্ করে মেয়েটার কবজি ধরল রানা, আড়াল করল ফ্ল্যাশলাইটের লেন্স।

সরাসরি সামনে উজ্জ্বল কমলা আগুন। কিন্তু ওটা কার্টা অস্টিনের বলে দেয়া কোনও গর্তের জিনিস নয়। দাউদাউ করে জ্বলছে লেলিহান শিখা।

একটানে থ্রটল খুলল রানা, সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল লাইফবোট। মনে মনে প্রার্থনা করছে রানা, যেন সামনে পানির গভীরতা থাকে। তাল হারিয়ে ওর বুকে এসে পড়েছে মেয়েটি। চট্ করে ওকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল রানা, ঘাসের বনের ভিতর দিয়ে দেখতে চাইছে।

দু'পাশের ঘাসের বন চিরে ছিটকে বেরুল বোট, সামনেই পড়ল দাদু এবেলের খুদে দ্বীপ। একবার ডেপথ গজ দেখে নিল রানা। কিলের নীচে মাত্র এক ফুট পানি! হ্যাঁচকা টান দিয়ে থ্রটল বন্ধ করল ও, পুরো রিভার্সে চলতে শুরু করেছে ইঞ্জিন। স্টার্নের নীচ থেকে বলকে উঠছে ফেনায়িত পানি। নোঙর নামিয়ে দিল রানা। গতি বেশি নয়, ঘ্যাঁচ করে তীরে আটকে যাওয়ার আগেই থেমে গেল বোট।

ইঞ্জিনদুটো নিউট্রাল করল রানা, মুখ তুলে চারপাশ দেখল। ছোট্ট দ্বীপের মাঝে জ্বলন্ত চিতা হয়ে উঠেছে কুঁড়েঘর। ওটার ছাত থেকে বিশ ফুট উপরে লাফ দিয়ে উঠছে কমলা শিখা ও তপ্ত ছাই। এক পাশে পড়ে আছে দাদু এবেলের জেলে-নৌকা, জ্বলছে। ভেজা জায়গাগুলো থেকে ঘন সাদা ধোঁয়া উঠছে।

জ্বলন্ত কুঁড়ের ভিতর থেকে এল করুণ আর্তচিৎকার। চমকে গেল রানা। আগুনে পুড়ে মরছে কেউ!

'হায় ঈশ্বর!' বিড়বিড় করল কার্টা।

দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখাল রানা, লাফ দিয়ে উঠে গেল বোটের ছাতে, দৌড়াতে শুরু করেছে। কেবিনের ছাত থেকে আরও পাঁচ ফুট দূরে বোটের বো, দৌড়ের বেগ বাড়ল রানার, পাখির মত উড়াল দিল— ওর ডান পা গিয়ে পড়ল অ্যালিউমিনিয়াম রেলিঙের

উপর, পরক্ষণে লম্বা ডাইভ দিল। ছুরির মত পানির ভিতর গেঁথে গেল, পাঁচ সেকেণ্ড পর ভেসে উঠল, তার আগেই সাঁতরাতে শুরু করেছে।

তীরে পা ঠেকে যেতেই দৌড়ে উঠে এল সৈকতে, তখনই প্রথম শুনল আওয়াজটা। বড় কোনও বোট। গম্ভীর আওয়াজ ছাড়ছে।

দ্বীপের আরেক দিকে দেখা দিল দীর্ঘ সাদা বো। খোলা ককপিটে দু'জন লোক, ডান দিকের জন অটোমেটিক অস্ত্র দিয়ে গুলি শুরু করেছে। রানার চারপাশে ছিটকে উঠছে বালি। অন্ধের মত ডাইভ দিল রানা, মাটি স্পর্শ করবার আগেই কোমরের কাছে চলে গেছে হাত। দু'বার গড়ান দিয়েই উঠে বসল, দুই হাতে ধরেছে গ্লক পিস্তল। কোমরে উইণ্ডব্রেকার বাঁধবার আগে ওটা ওখানেই রেখেছিল। ওর থেকে তিরিশ গজ দূরে সাদা বোট, আরও সরছে। রানাকে আঁধারে গুলি করতে হবে, কিন্তু ওর পিছনে লেলিহান আগুন। ওকে সহজেই ফুটো করবে লোকটা।

একটা গুলিও করেনি রানা, তার আগেই এক পশলা গুলি এসে লাগল সৈকতে। বাধ্য হয়ে গড়িয়ে লেগুনে নেমে গেল রানা। আগেই বড় করে দম নিয়েছে, ওর নাকের কাছে কাদায় বিঁধল বুলেট। চমকে গেছে, ভুল করে ছেড়ে দিল দম, শ্বাস নিতেই নাক-মুখে ঢুকল কিচকিচে বালি।

পানির নীচে ডুব দিল রানা, কাশতে শুরু করেছে বেদম। নিজেকে বলল, এখানে থাকলে মরবি, ভাগ! তারই ফাঁকে সরতে শুরু করেছে। তিরিশ ফুট সরে এল, খেয়াল রেখেছে তীরের মাটি যেন হাতের নীচেই থাকে, পিঠ ভাসলে চলবে না। পানির ভিতর কম্পন টের পেল, ঘুরে আসছে পাওয়ার বোট। মজা পেয়ে গেছে লোকটা, নিশ্চিন্তে শিকার করবার আনন্দই আলাদা! বোট কোথায় থাকতে পারে আঁচ করে নিয়েছে রানা, পানির নীচ দিয়ে হেঁটে

এগুতে শুরু করেছে। দমের অভাবে ফেটে যেতে চাইছে বুক। কয়েক সেকেণ্ড পর পা দুটো সোজা করল, আস্তে করে চোখ তুলল পানির উপর। আরও বিশ সেকেণ্ড শ্বাস না নিয়ে থাকতে পারবে।

সাদা বোট দশ গজ দূরে, লোকদুটো ভুল দিকে চেয়ে ওকে খুঁজছে। রানার কপাল বেয়ে দরদর করে ঝরছে পানি, ফেটে যেতে চাইছে ফুসফুস। নিঃশব্দে গ্লক তুলল ও, তাক ঠিক করেই টিপে দিল ট্রিগার। গুলি বেরুতেই নাক উঁচু করে শ্বাস নিল, নতুন করে ওকে পেয়ে বসল বিচ্ছিরি কাশি। ওর জানা নেই লোকটার গায়ে গুলি লেগেছে কি না, না লেগে থাকলেও খুব কাছ দিয়েই গেছে। কারণ দেখা গেল গর্জে উঠল ইঞ্জিন, খোলা বে-র দিকে রওনা হয়ে গেল বোট, পিছনে ছিটাচ্ছে মোরগের লেজের মত পানি।

কাশতে কাশতে উবু হয়ে গেল রানা, দুই হাঁটুর উপর রেখেছে দুই হাত। বিশ সেকেণ্ড পর সামলে নিয়ে চাইল লাইফবোটের দিকে। 'কার্টা,' ব্যাঙের ডাকের মত শোনাল ওর কণ্ঠ, 'তুমি ঠিক আছ তো?'

ককপিটের আড়াল থেকে বেরুল মেয়েটি। গভীর নীল চোখে পড়ছে আগুনের আভা, জ্বলজ্বল করছে মণি। কাঁচা সোনার মত লাগছে মুখের ত্বক। 'হ্যাঁ।' কয়েক সেকেণ্ড বিরতি নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক আছি। তুমি?'

'ঠিক আছি।' কুঁড়ের দিকে ঘুরে চাইল রানা। এখন আর আর্তনাদ করছে না দাদু এবেল। সৈকতে উঠে কুঁড়েঘরের সামনে চলে এল রানা। যে-কোনও সময়ে ধসে পড়বে ছাত। তাপ এত বেশি যে আর এগুনো কঠিন। ধোঁয়ার কারণে জ্বলতে শুরু করেছে চোখ। ওকে আবারও ধরল বেদম কাশি। মনে হলো ফুসফুসের ভিতর ধোঁয়ার সঙ্গে ঢুকেছে ভাঙা কাঁচ।

কুঁড়ের দরজা হিসাবে যে কাঁথা ঝুলছিল, সেটা একটা লগি

দিয়ে সরিয়ে দিল রানা। ঘন ধোঁয়ায় দেখা গেল না ভিতর দিক। ঘরে ঢুকবে ঠিক করেছে, কিন্তু তার আগেই ধড়াস্ করে নেমে এল ছাত। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল তপ্ত হাওয়া ও জ্বলন্ত কয়লা। তার আগে এক পলক করুণ একটা দৃশ্য দেখেছে রানা, কখনও ওটা ভুলবে না। ঝলসে কুঁকড়ে গেছে মানুষটার দেহ।

বিছানার সঙ্গে তখনও বাঁধা ছিল বুড়োর দুই হাত। ঘরে আগুন দেয়ার আগে তাকে অত্যাচার করা হয়েছে। শেষ আর্তি জানাতে হাঁ হয়ে ছিল ফোকলা মুখ। বিছানার উপর চিরচির করে পুড়ছিল লাল রক্ত। ঘুরে দাঁড়াল রানা, থমথম করছে ওর মুখ। বিড়বিড় করে বলল, 'তোমার হয়ে প্রতিশোধ নেব আমি, দাদু।'

দৌড়ে সৈকতে ফিরল রানা, ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে, দ্রুত চলেছে লাইফবোটের দিকে। অনেকটা উঁচু হয়ে ভাসছে নৌযান, কাজেই বো-র কাছে চলে গেল, নোঙরের শিকল ধরে উঠে পড়ল ডেকে। ওকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল কার্টা। রানাকে পিস্তলটা কোমরে গুঁজতে দেখেও কিছুই বলল না।

'চলো যাওয়া যাক,' মেয়েটির হাত ধরল রানা, দ্রুত রওনা হয়ে গেল স্টার্নের দিকে। ককপিটে উঠেই ড্যাশবোর্ডে একটা সুইচ টিপল রানা, সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল নোঙর। যন্ত্রের মত চলছে ওর হাত, থ্রটল ঠেলে দিয়েই বনবন করে ঘুরিয়ে নিল হুইল।

'কী করছ, রানা?' ইঞ্জিনের উপর দিয়ে জানতে চাইল কার্টা। 'ওটা স্কি বোট। আমাদের চেয়ে কমপক্ষে পাঁচ মিনিট এগিয়ে, গতিবেগ আমাদের দ্বিগুণ।'

'দেখি ওরা কী করে,' মেয়েটার দিকে চাইল না রানা। দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেছে চোয়াল। কোর্স ঠিক করে নিল, সরু খাল ধরে বিদ্যুদ্বেগে রওনা হয়ে গেল বোটের প্রাউ।

'আমরা ওদের ধরতে পারব না, রানা। তা ছাড়া, ওদের কাছে মেশিনগান আছে। তোমার কাছে মাত্র একটা পিস্তল।'

দু' পাশের নলখাগড়া চাবুকের মত এসে লাগছে বোটের দু'পাশে। রকেটের মত চলেছে লাইফবোট। ডেপথ গজের উপর একটা চোখ রেখেছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর ঘাসের বন থেকে ছিটকে বেরুল বোট।

এক পলক কার্টাকে দেখল রানা, তারপর ড্যাশবোর্ডের নীচে একটা সুইচ টিপে দিল। 'শক্ত করে কিছু ধরো!'

পানি থেকে উঠতে শুরু করেছে লাইফবোটের সামনের খোল। বোটের নীচে হাইড্রলিক্স অ্যাকটিভেট করেছে বেশ কয়েকটা ফিন ও উইংকে। দু' সেকেণ্ড দেরি করল কার্টা, ফলে টলে পড়ে গেল রানার বুকে। সোজা করে ওকে দাঁড় করিয়ে দিল রানা। হাইড্রোফয়েল থেকে দ্রুত সাড়া মিলছে। পানি থেকে উঠে এল খোল, এখন ডানার উপর ভর করে ছুটে চলেছে বোট। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে দ্বিগুণ হয়েছে গতি। চল্লিশ নট বেগ তুলে ছুটছে বোট।

অবাক চোখে রানার দিকে চাইল কার্টা। কী বলবে ভেবে পেল না। চোখের সামনে দেখেছে লাইফবোট হয়ে গেছে হাই পারফর্মিং হাইড্রোফয়েল। একটু সামলে নিয়ে বলল, 'তুমি আসলে কে, রানা?'

ওর দিকে চাইল রানা। সংক্ষেপে সবই বলত, যদি না দেখত বুড়ো মানুষটার করুণ পরিণতি। রাগে পুড়ছে ওর অন্তর। আগুন জ্বলছে ওর কুচকুচে কালো দুই মণিতে। 'আমি এমন একজন, যাকে এক কথায় উড়িয়ে দেয়া যায় না। ওরা ভেবেছে যা খুশি করবে।' সামনের পানির দিকে আঙুল তাক করল রানা। 'দেখছ একটু জ্বলজ্বল করছে সামনের সাগর?' মাথা দোলাল কার্টা। 'ওদের বোটের কারণে অমন হয়েছে। পানির বায়োলিউমিনেসেন্ট অর্গানিজম তৈরি করেছে ওই ফ্লুরেসেন্স। দিনের আলোয় দেখতাম না, কিন্তু এখন রাতের আঁধারে পরিষ্কার দেখব। তুমি হেলম

ধরতে পারবে? শুধু পিছু নেবে।'

'আগে কখনও এ ধরনের বোট চালাইনি।'

'অনেকেই চালায়নি। তোমার বাবার চার্টার বোটের মতই, তবে গতি বেশি। সোজা করে রাখবে হুইল, যদি বাঁক নিতে হয়, ধীরে ধীরে ঘুরবে। আমি এক মিনিট পরেই আসছি।'

কার্টা হুইল নেয়ার পর কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা, নিশ্চিত হলো বিপদে পড়বে না মেয়েটা। এবার কেবিনে ঢুকে পড়ল, মাঝের আইল ধরে চলেছে। সামনেই আছে ওর লেদার ডাফল ব্যাগ। কাপড়ের নীচ থেকে বের করে নিল মিনি উজি ও ম্যাগাযিনগুলো। রিলোড করে কোমরে রেখে দিল গ্লক পিস্তল। পিছন পকেটে চলে গেল বাড়তি ম্যাগাযিনগুলো। একটা বেঞ্চের নীচে রয়েছে বিশেষ সুইচ, ওটার কারণে চিত হয়ে যায় সিট। এসব সিটের নীচে থাকে খাবার ও অন্যান্য প্রভিশন। তবে এই সিট আলাদা। উপর থেকে টয়লেট পেপারের কয়েল সরাতে শুরু করল রানা, নীচে দেখল গোপন একটা লিভার। ফলস বটম সরে যেতেই ঢাকনি খুলল।

ভিতর অংশ থেকে এল ইঞ্জিনের গর্জন। বিলজ স্পেস এটা। হিসহিস আওয়াজ তুলে পানি কেটে ছুটে চলেছে ফয়েলগুলো। বিলজ থেকে ধাতব ক্লিপওয়ালা একটা টিউব তুলে নিল। জিনিসটা কঠিন প্লাস্টিকের, মুখে ওয়াটারপ্রুফ ক্যাপ। টিউব প্রায় চার ফুট দৈর্ঘ্যের। ব্যাস হবে দশ ইঞ্চির মত। এক মাথার ক্যাপ খুলে ফেলল রানা, ওটার ভিতর থেকে বের করে নিল এফএন-এফএএল অ্যাসল্ট রাইফেল, পাশের সিটের উপর রাখল। ভয়ঙ্কর নিখুঁত বেলজিয়ান অস্ত্রটার দাদা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালের, তবে এখনও এই জিনিস পৃথিবীর সেরা।

টিউবের ভিতর থেকে ৭.৬২ এমএম অ্যামিউনিশন বের করল রানা, গুলি ভরে নিল দুই ম্যাগাযিনে। একটা গুলি পাঠিয়ে দিল

চেম্বারে, আরেকবার দেখে নিল অস্ত্রটা নিরাপদ কি না। ওর বন্ধু গগল জানতে চেয়েছিল লাইফবোটে এ জিনিস রেখে কী হবে। জবাবে রানা বলেছে, 'কাউকে মাছ ধরতে শেখাও, সে নিজে খেয়ে বাঁচবে; কিন্তু তাকে দাও একটা অ্যাসল্ট রাইফেল, পানিতে হাঙর থাকলে ওগুলো মেরে নিজের ক্রুদের বাকি জীবন খাওয়াতে পারবে।'

রাইফেল হাতে পিছনের ডেকে ফিরে এল রানা। সামান্য জ্বলজ্বলে এলাকার ঠিক মাঝ দিয়ে বোট নিয়ে চলেছে কার্টা। স্কি বোট এখন অনেক কাছে চলে এসেছে, বুঝতে পারছে রানা। পানির সঙ্গে মিশে যাবার সময় কম পেয়েছে মাইক্রো-অর্গানিজমগুলো, তাই আগের চেয়ে বেশি জ্বলজ্বল করছে।

ড্যাশবোর্ডের উপর এফএন রাইফেল বসিয়ে নিল রানা, কেবিনের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দিল থার্মোস। তার জায়গা নিল মিনি উজি।

'তুমি কি সবসময় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য তৈরি থাকো?' ঠাট্টা করতে চাইল কার্টা।

লড়াইয়ে যাওয়ার সময় হাসি-ঠাট্টা মনকে হালকা করে, তাতে ভুল হওয়ার সম্ভবনাও কমে যায়। মৃদু হাসল রানা, হুইল থেকে কার্টা সরে যেতেই সেখানে এসে দাঁড়াল।

কয়েক সেকেণ্ড পর দূরে দেখা গেল স্পিডবোট, উপসাগর চিরে ছুটে চলেছে। রানা ও কার্টা যেমন দেখেছে, ঠিক তেমনি ওদেরকেও দেখতে পেয়েছে লোকদুটো। হঠাৎ বাঁক নিল স্পিডবোট, জলাভূমি পাশে রেখে ছুটছে।

দুই পাক হুইল ঘোরাল রানা, চলে যেতে চাইছে স্পিডবোটের ঠিক পিছনে। কাত হয়ে গেল হাইড্রোফয়েল বোট। দুই পায়ে ভারসাম্য বজায় রাখল রানা। তীরের মত বাঁক নিয়েছে বোট। মাত্র কয়েক মিনিট পর তিরিশ গজ দূরে থাকল স্পিডবোট। ওটার

ড্রাইভার সোজা পথে চলেছে। দ্বিতীয় লোকটা রিয়ার বেঞ্চের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে, রাইফেল রেস্টে রেখে গুলি শুরু করেছে।

'কার্টা, বসে পড়ো,' সতর্ক করল রানা।

বো-র রেলিঙে লেগে 'বিইইইং' শব্দে ছিটকে এল বুলেট, ককপিটের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। হাইড্রোফয়েল ডানা অনেক উঁচু করে দিয়েছে বোটকে, সরাসরি রানা বা কার্টার গায়ে লাগাতে পারবে না লোকটা। রাইফেল অন্য দিকে সরাল সে, তার লক্ষ্য এখন ফয়েলের সাপোর্টিং স্ট্রাট। পর পর কয়েকটা গুলি লাগল স্ট্রাটে। কিন্তু জিনিসটা হাই-টেনসিল স্টিল দিয়ে তৈরি। কোনও ক্ষতি না করেই নানা দিকে ছিটকে গেল বুলেট।

কাপ হোল্ডারে মিনি উজি বসিয়ে নিয়েছে রানা, সরাসরি পথ থেকে একটু সরিয়ে নিল হাইড্রোফয়েল, সরাসরি এবার স্পিডবোটের উপর গুলি চালাতে পারবে। আলতো করে ট্রিগার টিপল, ওর দুই হাতে লাফিয়ে উঠল ছোট্ট অস্ত্রটা। এক পাশে চকচকে বাঁকা স্রোত তৈরি হলো, হাইড্রোফয়েলের পিছনের পানিতে গিয়ে পড়ছে ব্রাসের খোসাগুলো। লোকদুটোকে মেরে ফেলতে চায় না রানা, স্কি বোটের এক পাশের খোল লক্ষ্য করে গুলি করল। স্পিডবোটের পোর্ট সাইডে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল পানি। প্রায় একই জায়গায় বিঁধল বিশটি বুলেট।

রানা ভেবেছিল হাল ছেড়ে দেবে লোকদুটো, পিছনের বোট তাদের চেয়ে অনেক বড় এবং দ্রুতগামী, তার উপর ওখান থেকে আসছে সাবমেশিনগানের গুলি— কিন্তু দেখা গেল পূর্ণ গতি তুলে ছুটছে স্কি বোট। বাঁক নিয়ে জলাভূমি ঘেঁষে চলেছে।

বাধ্য হয়ে পিছু নিল রানা।

দেয়ালের মত নলখাগড়া ও সরু গাছগুলোকে তীরের মত পাশ কাটাল স্পিডবোট। কয়েক মিনিট পর রানার মনে হলো,

সাগরে জন্মানো ঘাসের ভিতর খরগোশের মত ছুটছে ওরা। সামনে ছোট ছোট দ্বীপ। হাইড্রোফয়েলের চেয়ে অনেক কম গতি স্কি বোটের, কিন্তু এঁকেবেঁকে সুবিধা আদায় করছে। নানা বাধার কারণে কমে আসছে হাইড্রোফয়েলের গতি, কয়েক মিনিট পর আবারও বেড়ে গেল দুই বোটের মাঝের দূরত্ব। মাঝে থাকল পঞ্চাশ গজ সাগর।

রানা চাইলে আবারও খোলা সাগরে বেরুতে পারবে, সেক্ষেত্রে কমিয়ে আনা সম্ভব দূরত্ব, কিন্তু সাহস হলো না। একবার যদি স্পিডবোট চোখের আড়াল হয়, হারিয়ে যেতে পারে সাগরের দীর্ঘ ঘাসের বনে। অগভীর পানিতে পূর্ণ সুবিধা পাবে স্পিডবোট। নতুন করে খুঁজতে গেলে যে-কোনও সময়ে ওরা পড়বে অ্যাম্বুশে। এখন একমাত্র কাজ হওয়া উচিত পিছু লেগে থাকা।

নানা গাছের দঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে ওরা, ইঞ্জিনের আওয়াজে জেগে উঠছে অসংখ্য পাখি, ডানা ঝাপ্টে আকাশে উঠছে। জলাভূমির ভিতর জোর বাতাসে শ-শ আওয়াজ তুলে দুলে চলেছে ঘাসের ডগা। কান পাতলে মনে হয় গোটা উপসাগর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

পানির নীচে আকস্মিক বাধা থাকলে যে-কোনও সময়ে ভেঙে পড়বে ফয়েল। বাধ্য হয়ে মৃদু বাঁক নিল রানা। সাপের মত ছুটে চলেছে স্পিডবোট, ক্রমেই পিছনে ফেলছে হাইড্রোফয়েলকে। সামনে কী যেন দেখল রানা, পর সেকেণ্ডে বুঝল ওটা প্রায় নিমজ্জিত একটা গাছের গুঁড়ি। ওটার সঙ্গে ধাক্কা লাগলে বোট থেকে খসে পড়বে উইং। দ্রুত হাতে থ্রটল বন্ধ করল রানা, বনবন করে ঘোরাতে শুরু করেছে হুইল। খুব সাবধানে পাশ কাটাল গাছের গুঁড়ি, সামনে পাশাপাশি নিচু দুটো কাদা ভরা দ্বীপ। মাঝ দিয়ে এগুতে হবে।

ডেপথ গজ দেখল রানা, বোটের ডানার মাত্র ছয় ইঞ্চি নীচে জমাট মাটি। গতি কমাতে চাইল, মনে মনে বলে চলেছে, যদি মাত্র পাঁচ ইঞ্চি উপরে থাকত বোট! যে গতি তুলে চলেছে, তাতে হঠাৎ করে বোট থেমে গেলে ডেক থেকে ছিটকে গিয়ে পানিতে পড়বে ওরা। আছড়ে পড়বার সময় মনে হবে পাঁচ তলা থেকে সিমেন্টের চাতালের উপর পড়েছে। ফলাফল: নিশ্চিত মৃত্যু!

ক্রমেই ওদের দিকে ছুটে আসছে দুই দ্বীপের মাঝের সরু ফাঁক। একবার চট্ করে পিছন দিক দেখে নিল রানা। সাধারণত ফয়েল ও প্রপেলারের ঢেউ হয় সাদা রঙের, কিন্তু পিছনে শুধু গাঢ় বাদামী চকলেটের মত পানি। সামান্য দুলে উঠল বোট, মাটিতে ঘষা খেয়েছে একটা উইং। এখন আর থামতে পারবে না রানা, তা হলেই ধপ্ করে নেমে আসবে হাইড্রোফয়েল। সেক্ষেত্রে কাদার ভিতর নাক গুঁজবে বোট। তা ছাড়া, স্পিডোমিটারে দেখা গেল লাল দাগের চেয়ে অনেক উপরে কাঁটা।

কাছ থেকে দেখে মনে হলো দুই দ্বীপের মাঝের চ্যানেল আরও অনেক সরু।

'কিছু একটা শক্ত করে ধরো!' ইঞ্জিনের আওয়াজের উপর দিয়ে গলা চড়িয়ে বলল রানা। বুঝে ফেলেছে, ও জুয়া খেলেছে, এবং হেরেও গেছে!

চ্যানেলের সবচেয়ে সরু জায়গার ভিতর দিয়ে চলেছে লাইফবোট, সামান্যতম কমানো হয়নি গতি। ফরোয়ার্ড উইং স্পর্শ করল মাটি, পরক্ষণে চওড়া হলো চ্যানেল, আবারও গভীরতা বাড়তে লাগল।

সশব্দে দম টানল রানা।

'যা ভেবেছি ততই সরু ছিল?' জানতে চাইল কার্টা।

'তার চেয়েও বেশি।'

বাধ্য হয়ে এক ঝাড় ম্যানগ্রোভ এড়িয়ে গেছে স্পিডবোট, সে

কারণে সরাসরি দ্বীপ পেরিয়ে দূরত্ব কমিয়ে এনেছে হাইড্রোফয়েল। স্কি বোটের স্টার্নে সোজা হয়ে দাঁড়াল গানম্যান। গতি আরও বাড়াল রানা, জলাভূমির ভিতর দিয়ে সরাসরি স্পিডবোটের পিছনে চলে এল। হাইড্রোফয়েল আড়াল দিল রানা ও কার্টাকে। আর ঠিক তখন ক্ষিপ্র স্পিডবোট থেকে এল গুলি। সাগরে পড়ল বেশির ভাগ বুলেট। কিন্তু দুটো লাগল লাইফবোটের সেফটি গ্লাসে। ফাটল না কাঁচ, তবে চিড় ধরল।

সরাসরি সামনে জলাভূমির খোলা এক অংশ। সুযোগটা নিল রানা, বাড়িয়ে দিল ইঞ্জিনের গতি। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে স্কি বোটের ঘাড়ের কাছে গিয়ে হাজির হলো হাইড্রোফয়েল। সামনের ঢেউ ও স্রোত দোলাতে শুরু করেছে রানাদের বোটকে। ওয়াটার উইঙের নীচে ঢুকেছে বাতাস, ফলে লাফ দিয়ে দিয়ে উপর-নীচ করছে হাইড্রোফয়েল। এমনই হবে, আন্দাজ করেছে রানা। ওদের বো-র নীচ থেকে সরে যেতে চাইছে স্পিডবোটের স্টার্ন। আবারও বাঁক নিতে চাইল ড্রাইভার। তাকে অনুসরণ করছে রানা, ওর হাইড্রোফয়েলের বো চেপে বসতে চাইল স্পিডবোটের উপর। এতে ধাক্কা লাগল, কিন্তু তেমন কমল না সামনের বোটের গতি। একটু পিছিয়ে এল রানা, আবার উঁচু হয়ে উঠল হাইড্রোফয়েল।

চট্ করে আরপিএম দেখে নিল রানা, ঠিক তখনই চিৎকার করে উঠল কার্টা।

মুখ তুলল রানা। স্কি বোটের স্টার্নে হাইড্রোফয়েলের বো গুঁতো দেয়ার সময় সশস্ত্র লোকটা লাফ দিয়ে ধরেছে রেলিং, এক হাতে ধরেছে রেলিং, অন্য হাতে একে-৪৭। ওটার মাযল তাক করেছে ঠিক রানার দুই চোখের মাঝে।

রানার হাতে সময় নেই যে অস্ত্র বের করবে, কাজেই একমাত্র কাজটি করল।

ধপ্ করে থ্রটলে উপর নামল ওর হাত, একে-৪৭ গর্জে

উঠবার আগেই হোঁচট খেল হাইড্রোফয়েল। ড্যাশবোর্ডের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল কার্টা ও রানা। চল্লিশ নট গতি তুলে চলছিল ওরা, পরক্ষণে দেখা গেল প্রায় থেমে গেছে। এক পশলা গুলি গিয়ে লাগল কেবিনের উপর অংশে। থমকে গেছে হাইড্রোফয়েল, শক্ত করেই রেলিং ধরেছে লোকটা, কিন্তু তার বুক এসে আছড়ে পড়ল অ্যালিমিউনিয়াম স্ট্রাটের উপর। বিপুল পানি ছিটকে উঠল বো-র সামনে। স্টার্নে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল কার্টা ও রানা। হঠাৎ গতি থেমে যেতেই লোকটা চলে গেছে খোলের নীচে। প্রায় একই সময়ে থ্রটল খুলে দিল রানা, এক সেকেণ্ড পর দেখা গেল বোটের পিছনে লালচে ফেনা। ঘুরন্ত প্রপেলার পেঁয়াজকুচি করে দিয়েছে লোকটাকে।

'ঠিক আছ?' জানতে চাইল রানা।

ড্যাশবোর্ডের উপর পড়ে ব্যথা পেয়েছে কার্টা, এখন বুক ম্যাসেজ করছে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল, তারপর কপাল থেকে ভেজা চুল সরিয়ে বলল, 'মনে হয় ঠিকই আছি।' রানার বাহু দেখাল। 'তোমার হাত তো দেখছি কেটে গেছে।'

নতুন করে স্কি বোটের পিছু নিয়েছে রানা। সামনের দিক দেখে নিল, তারপর ক্ষতের দিকে চাইল। একটা বুলেট এসে ভেঙে দিয়েছে ফাইবার গ্লাস, এক টুকরো গেঁথে আছে বাহুর মাংসে।

আস্তে করে ফাইবার গ্লাসের টুকরো সরিয়ে নিল রানা। ভুরু কুঁচকে গেল ব্যথায়। ক্ষত গভীর নয়, কিন্তু দরদর করে পড়ছে রক্ত। ড্যাশবোর্ডের পাশের বিন থেকে মেডিক্যাল কিট বের করল রানা, ওটা বাড়িয়ে দিল মেয়েটির দিকে। বাক্স হাতড়ে এক রোল স্টেরাইল গজ পেল কার্টা। রানা হাত উঁচু করতেই ওর বাহু পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধল ব্যাণ্ডেজ। বলল, 'এবার আর রক্ত পড়বে না। শেষবার কবে টিটেনাস নিয়েছ?'

'ফেব্রুয়ারির তেরো তারিখে, দুই বছর আগে।'

'মনে রাখলে কী করে?'

'আমার পিঠে তেরো ইঞ্চি লম্বা একটা ক্ষত হয়েছিল। সারতে বেশ কয়েক দিন লাগে।'

পরবর্তী দুই মিনিটে স্কি বোটের অনেক কাছে চলে গেল ওরা। জলাভূমির ডান দিকে নলখাগড়া বা গাছ কমে গেছে, শুরু হয়েছে বোল্ডার ভরা সৈকত। ওদিকে কোথাও লুকাতে পারবে না স্পিডবোট। রানা টের পেল, এবার শেষ করতে হবে খেলা। 'আরেকবার হেলম ধরতে পারবে, কার্টা?'

'হ্যাঁ, পারব।'

'আমার ইঙ্গিতের জন্য অপেক্ষা করবে, তারপর গতি কমিয়ে আনবে। বাঁক নেয়ার জন্য তৈরি থেকো। আমি জানিয়ে দেব কোন্ দিকে যেতে হবে।'

কার্টা কীভাবে হেলম ধরছে দেখতে গেল না রানা, তুলে নিল এফএন অ্যাসল্ট রাইফেল ও স্পেয়ার ম্যাগাযিন। বো-র দিকে এগুতে শুরু করেছে।

হাইড্রোফয়েলের বো থেকে মাত্র পাঁচ গজ সামনে রয়েছে স্কি বোট। লাইফবোটের বো-র রেলিঙে এসে থামল রানা, কাঁধে তুলে নিল এফএন রাইফেল। তিন রাউণ্ডের এক পশলা গুলি ছুঁড়ল। প্রতিটি বুলেট বিঁধল ইঞ্জিন কাউলিঙে। বাক নিতে শুরু করেছে ড্রাইভার, সরে যেতে চাইছে অগভীর পানির দিকে। বামহাত তুলল রানা, ইশারা করে বুঝিয়ে দিল পোর্টে ঘুরতে হবে কার্টাকে। একটু বেশি দ্রুত হাইড্রোফয়েলকে বামে সরাল মেয়েটি, কিন্তু মনে হলো এই বোটের আচরণ বুঝতে শুরু করেছে।

আরেকবার সামনে দেখে নিল রানা, পরক্ষণে তিন রাউণ্ড গুলি ছুঁড়ল স্পিডবোটের ইঞ্জিনের উপর। খটর-মটর আওয়াজ তুলল ইঞ্জিন। বিরতি না দিয়েই আরও তিন রাউণ্ড বুলেট গেঁথে দিল

ওখানে। শত্রুকে পিছন থেকে সরাতে চাইছে ড্রাইভার, এঁকেবেঁকে ছুটতে চাইছে, কিন্তু পিছনের লোকটা কাঁঠালের আঠা।

রানার আধ ডজন গুলি সরাসরি লাগল বোটের স্টার্নে। হঠাৎ করে স্কি বোটের ইঞ্জিন কাউলিঙের ভিতর থেকে ভুস্ করে বেরুল সাদা বাষ্প। কয়েক সেকেণ্ড পর সাদা ধোঁয়ার বদলে শুরু হলো কালো মেঘ। যে-কোনও সময়ে সিয করবে ইঞ্জিন। কার্টাকে ইশারা দেয়ার জন্য তৈরি হলো রানা, এবার কমিয়ে আনতে হবে গতি, নইলে লাইফবোট চেপে বসবে স্পিডবোটের ঘাড়ে।

হাইড্রোফয়েলের বো লাইট ও স্কি বোটের ড্যাশ লাইটে লোকটাকে দেখতে পেল রানা। ঘুরে চেয়েছে সে। দু' সেকেণ্ডের জন্য দু'জনের চোখ আটকে গেল পরস্পরের চোখে। হিমশীতল ঘৃণা যেন দূর থেকে আঘাত হানল রানার উপর। লোকটার চোখে কোনও ভয় নেই, যেন বুঝে নিয়েছে, কখনও হারবে না সে।

ঘুরেই বন-বন করে হুইল ঘোরাল লোকটা। বাঁক নিল স্পিডবোট। চমকে গেছে রানা, থামতে ইশারা দিল কার্টাকে। সোজা পাথুরে সৈকত লক্ষ্য করে চলেছে লোকটা! প্রথম থেকেই রানা চেয়েছে বোটের যে-কোনও একজনকে বন্দি করবে, কিন্তু এখন টের পেল, ওই লোক জান থাকতে ধরা দেবে না। স্পিডবোটের স্টার্নে এক পশলা বুলেট ছুঁড়ল রানা, বুঝতে পারছে ধোঁয়ার ভিতর বোট লক্ষ্য করে গুলি করে কোনও লাভ হবে না। আর কিছুই করবার নেই, আত্মহত্যা করতে চলেছে লোকটা!

বাঁক নেয়ার সময় গতি কমেছে স্পিডবোটের, কিন্তু এত কমেনি যে হঠাৎ থামবে। তীর থেকে পনেরো ফুট দূরে থাকতেই ইঞ্জিনের ভিতর থেকে বেরুল বিশ্রী আওয়াজ, পারের মাটিতে আটকে গেল বোটের তলি। তখনও গতি রইল ত্রিশ নটের বেশি। পানি থেকে বর্শার মত ছিটকে উঠল বোট, আকাশে উঠে নামল গিয়ে দুটো বোল্ডারের উপর। বোমার মত আওয়াজ তুলে ফেটে

গেল ফাইবার গ্লাসের খোল। কয়েক শ' টুকরো হলো উপরের সব। একদিকে ছিটকে পড়ল ইঞ্জিন, সঙ্গে ফিউয়েল ট্যাঙ্ক। মাটিতে পড়েই আগুন ধরে গেল ইঞ্জিন ও ফিউয়েল ট্যাঙ্কে। গ্যাসোলিন হয়ে উঠল অ্যারোসলের মেঘরাশি। আর ঠিক বিশ ফুট দূরে গিয়ে পড়ল লোকটা। ফিউয়েল ও বাতাসের মিক্সচার তৈরি করল ব্যাঙের ছাতার মত বিশাল এক আগুনের কুণ্ডলী, মুহূর্তে গ্রাস করেছে স্কি বোটকে।

রানা ককপিটে ফিরবার আগেই হাইড্রোফয়েলের গতি কমিয়ে এনেছে কার্টা, এখন মন্থর ভাবে তীরের দিকে চলেছে। একবার এফএন-এফএএল রাইফেল দেখে নিল রানা, ওটার সেফটি ক্যাচ অন করে রাখল ড্যাশবোর্ডের পাশে। রিট্র্যাকটেবল ফয়েলগুলো তুলে নিল। বিধ্বস্ত বোট থেকে একটু দূরে থামল, গুঞ্জন করছে লাইফবোটের ইঞ্জিন। নোঙর ফেলে দিল রানা।

'লোকটা নিজেকে মেরে ফেলল, তা-ই না?'

জ্বলন্ত টুকরোগুলোর দিকে চেয়ে রইল রানা। 'হ্যাঁ, তা-ই।'

'এ থেকে কী বুঝব?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ রইল রানা, তারপর বলল, 'লোকটা জানত আমরা কর্তৃপক্ষ নই, কাজেই ভেবেছে বন্দি হওয়া বা ইন্টারোগেশনের চেয়ে মরে যাওয়াই তার জন্য ভাল। এক কথায় ফ্যানাটিকদের সঙ্গে টক্কর লেগেছে আমাদের।'

'কিন্তু এদেরকে মুসলিম বা খ্রিস্টান মৌলবাদী মনে হয়েছে তোমার?'

'না, তা মনে হয়নি।'

'তা হলে কারা এরা?'

জবাবটা জানা নেই, চুপ রইল রানা। সাঁতরানোর কারণে এখনও ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে ওর পোশাক, আস্তে করে আবার গলা পানিতে নেমে গেল। প্রায় পৌঁছে গেছে সৈকতে,

এমন সময় ঝপাস্ আওয়াজ শুনতে পেল, পিছু নিয়েছে কার্টা। ওর জন্য সৈকতে অপেক্ষা করল রানা, তারপর একসঙ্গে পা বাড়াল লোকটার দিকে। বোট পরীক্ষা করবার কোনও মানেই হয় না, ওখানে রয়েছে শুধু গলে যাওয়া ফাইবার গ্লাস ও পোড়া ধাতু।

পাথুরে জমিতে বারবার গড়িয়ে যাওয়ায় ভয়ঙ্কর চেহারা হয়েছে লাশের, মনে হলো ঘাড় মটকে দিয়েছে স্বয়ং শয়তান, মুচড়ে দিয়েছে হাত-পা। তা-ও কবজির শিরা ধরে দেখল রানা, কোনও পালস নেই। গ্লক পিস্তল কোমরে গুঁজে লাশের প্যান্টের পকেট হাতড়াল। কিছুই পাওয়া গেল না। চিত করল লাশ, ওটা যেন মরা সাপের মত হিলহিলে। দুই গাল খুবলে গেছে, বেরিয়ে এসেছে চোয়ালের রক্তমাখা হাড়।

এক হাতে মুখ চাপা দিল কার্টা।

'সরি,' বলল রানা। 'তোমার বোধহয় সরে যাওয়াই উচিত।'

'সেজন্য নয়, আমি চিনি একে। এ সেই দক্ষিণ আফ্রিকান কন্টার পাইলট। ওয়ারিলি আইবল। ছিহ্, কী বোকাই না ছিলাম! লোকটা জানত আমি দাদু এবেলের বলা সাপের এলাকায় যাব। আমি নিজেই বলেছিলাম। আমাদের পিছনে লাগিয়ে দিয়েছে ওই ইয়টের লোকগুলোকে। তারপর এখানে এসেছে বুড়ো মানুষটা যেন মুখ খুলতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে।'

মুষড়ে পড়েছে কার্টা, ভাবতে গিয়ে বুঝতে পারছে নামিবিয়ায় ওর উপস্থিতির কারণে মানুষ মরছে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'আমি যদি চ্যালেঞ্জার জাহাজটাকে খুঁজতে না আসতাম, এখনও বেঁচে থাকত দাদু এবেল।' কখন যেন ভিজে গেছে চোখদুটো, রানার দিকে চাইল। 'লাজরাস আমাদের গাইড ছিল, তাকেও বোধহয় মেরে ফেলা হয়েছে! ঈশ্বর জানেন, এখনও বেঁচে আছে কি না কুবলিকি।'

রানা জানে সাধারণ মেয়ে নয় কার্টা, বেশির ভাগ মেয়ের মত

করে চাইছে না ওকে সান্ত্বনা দেয়া হোক। আঁধারে দাঁড়িয়ে রইল ওরা দু'জন। একটু দূরে এখনও পুড়ছে স্কি বোটের টুকরোগুলো। কিছুক্ষণ পর ফুঁপিয়ে উঠল কার্টা, 'ওরা পুরোপুরি নিরপরাধ ছিল। মানুষগুলো মরল শুধু আমার ভুলে।'

রানা ভাবছে, এই একই অনুভূতি বারবার হয়েছে ওর। অন্যের ভুলে মরেছে বহু মানুষ। নীরবে নিজে ও দায় তুলে নিয়েছে কাঁধে। এই কষ্ট যেন অ্যাসিডের মত, পুড়িয়ে দিতে থাকে অন্তর।

পাশে দাঁড়িয়ে রইল রানা। পাঁচ মিনিট কাঁদল কার্টা, বা তারও বেশি সময় ধরে, তারপর সামলে নিল। বিড়বিড় করে বলল, 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, রানা।'

'কীসের জন্য?'

'তুমি সান্ত্বনা দাওনি বলে। বেশির ভাগ পুরুষ মেয়েদের কাঁদতে দেখলে বিব্রত হয়, কান্না থামাতে মিথ্যা বলতেও দ্বিধা করে না।'

'আমারও যে ভাল লাগে তা বলতে পারি না,' মৃদু হাসল রানা। 'তবে বুঝলাম, এখন যদি তুমি না কাঁদো, পরে অনেক বেশি কাঁদবে, সেটা তোমার জন্য অনেক বেশি কষ্টের হবে।'

'সেজন্যেই তো ধন্যবাদ দিলাম। তুমি মেয়েদের মন বুঝতে পারো।'

'নিজেও কখনও কখনও কষ্ট পেয়েছি। ...এবার শুরু থেকে সব খুলে বলবে?'

'না, বলার মত কিছুই তো নেই।'

'তুমি তো জানো তোমার কারণে মানুষগুলো মরেনি, ঠিক?'

'জানি। আমি যদি এ দেশে না আসতাম, মানুষগুলো বেঁচে থাকত, কিন্তু নিজে আমি তাদের খুন করিনি।'

'ওটাই ঠিক কথা। তুমি এই ঘটনার শেকলের মাত্র একটা

আঙটা, সেটার সঙ্গে সম্পর্ক আছে খুনের। বোধহয় ঠিকই বলেছ, গাইডকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু কুবলিকির জন্য ভাবতে হবে না। তীরের কেউ জানে না সাগরে গোলাগুলি হয়েছে। তাদের ধারণা: কুবলিকি বা তুমি মারা পড়েছ। কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার জন্য ওয়ালভিস বে-তে যাব আমরা। মনে করি না হিল্ডা এখনও বন্দরে পৌঁছতে পেরেছে। যদি চেষ্টা করি, এখনও কুবলিকি বা ক্যাপ্টেনকে সতর্ক করতে পারব।'

উইণ্ডব্রেকারের আস্তিন দিয়ে চোখ মুছল কার্টা। 'তাই কি পারব?'

'নিশ্চয়ই পারব। চলো, যাওয়া যাক।'

হাইড্রোফয়েলে উঠবার আধ মিনিটের মধ্যেই রকেটের গতি তুলে রওনা হয়ে গেল ওরা। কেবিনে ঢুকে ক্রাফটের স্টোর থেকে পোশাক নিয়ে পাল্টে নিল কার্টা, স্টার্নে চলে এল। ওর হাতে হুইল ধরিয়ে দিয়ে নিজে পোশাক পাল্টাল রানা। রেশন থেকে কিছু খাবারও নিয়ে এল।

'আমাদের কপালে শুধু জরুরি রেশন,' ওর দুই হাতে দুটো বাদামি ফয়েল প্যাকেট। 'হয় স্প্যাগাটি আর মিটবল নেবে, নইলে মুরগি ও বিস্কুট।'

'স্প্যাগাটি নেব, তোমার জন্য থাকল মিটবল। আমি প্রায় ভেজিটারিয়ান।'

'সত্যিই?'

'এত অবাক হচ্ছ কেন?'

'ঠিক জানি না। সবসময় আমার মনে হয়েছে ভেজিটারিয়ানরা বার্কেনস্টক পরে, থাকে অর্গানিক ফার্মে।'

'ওরা ভেগান, দুধও খায় না। ওদেরকে আমার এক্সট্রিমিস্ট মনে হয়।'

ওর কথাটা শুনবার পর ফ্যানাটিজম নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে

রানা। ওই ধরনের মানুষ ভয়ঙ্কর দানব হয়ে উঠতে পারে। প্রথমেই মনে পড়ল ধর্মের কথা, যারা ভাল তারা ভাল, কিন্তু এক দল পুরুষ ও নারী ধর্মের নামে শয়তানকেও হার মানিয়ে দিতে পারে। এদের পর রয়েছে এনভায়রনমেন্টাল ও এনিমেল রাইট মুভমেন্টের সঙ্গে জড়িত মানুষগুলো। এদের কেউ কেউ ল্যাবোরেটরি ভেঙে ফেলতে চায়, ছেড়ে দিতে চায় রিসার্চের জন্য রাখা জন্তু। বা পুড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে স্কি রিসোর্ট। এসবের মাধ্যমে বোঝাতে চায়, তারাই সঠিক পথে চলছে।

প্রয়োজনে মানুষ হত্যা করে নিজের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করবে ওরা। জীবের প্রতি এতই ভালবাসা— মানুষ মরুক ক্ষতি নেই।

হতেই পারে, মনে মনে বলল রানা। গত কয়েক বছরে বহু মানুষ চরমপন্থী হয়ে উঠেছে। এখন আর সমাজের তৈরি নিষেধাজ্ঞা মানতে চায় না অনেকে। অন্যের অধিকার কেড়ে নেয়া যেন খুব সোজা হয়ে গেছে। ইস্ট, ওয়েস্ট, মুসলিম, খ্রিস্টান, সোশালিস্ট, ক্যাপিটালিস্ট, ধনী বা দরিদ্র— এসবই হয়ে উঠেছে বড় ইস্যু, এগুলোর জন্য মানুষ একদিক থেকে আরেক দিকে ঝুঁকে পড়ছে, দরকারে অদরকারে মানুষ হত্যা করতেও তাদের হাত কাঁপছে না।

এ দুই নদীর মাঝ দিয়ে কঠিন এক পথে হেঁটে চলেছে রানা এবং ওর মত কিছু মানুষ। আবার আসিফ হায়দার চৌধুরির কথা মনে পড়ল ওর। ভদ্রলোকের জন্য কোনও মুক্তিপণ চাওয়া হয়নি।

কিন্তু কেন?

এই কিডন্যাপিং কি পলিটিকালি মোটিভেটেড?

শ্বেতাঙ্গ নয় বলেই সরিয়ে দেয়া হলো তাঁকে?

রাজনৈতিক চাল, না পরিবেশবাদীদের কোনও দল গুম করল?

কার্টা যে পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, সেসবের সঙ্গে

আসিফ হায়দার চৌধুরির কোনও যোগ থাকতে পারে?

না বোধহয়।

কিন্তু এই মেয়ের মতই ভদ্রলোক বোধহয় রয়েছেন নামিবিয়ার মাটিতেই। স্কেলিটন কোস্ট সভ্য দুনিয়া থেকে অনেক দূরের এলাকা। পরিবেশবাদীরা এখানে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেনি। ব্রাজিলের রেইন ফরেস্ট বা পলিউটেড ওয়াটারওয়ের কথা পৃথিবীর মানুষ জানে, কিন্তু একটা দরিদ্র দেশের এক ফালি মরুভূমি নিয়ে ভাবে না কেউ। বেশির ভাগ মানুষ মানচিত্রে খুঁজেই পাবে না ওই অঞ্চল।

অন্য একটা চিন্তা এল ওর মনে। নামিবিয়ায় হীরার খনি শিল্প দেশের সবচেয়ে বড় ইণ্ডাস্ট্রি। কার্টা যতই বলুক হীরার বাজার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, কিন্তু এমন হতেই পারে, ওরা জড়িয়ে গেছে বেআইনী মাইনিং অপারেশনের সঙ্গে। বেশির ভাগ মানুষ বিপুল সম্পদের জন্য জান বাজি ধরতে রাজি হয়ে যায়। তার চেয়ে অনেক কম লোভেই মানুষ একে অন্যকে খুন করে। পাইলট ওয়ারিলি আইবলের আত্মহত্যার কোনও যৌক্তিক কারণ খুঁজে পেল না রানা।

লোকটা হয়তো ভেবেছে, বন্দি হলে তার উপর যে ধরনের নির্যাতন চলবে, সে তুলনায় চট্ করে মারা যাওয়া অনেক সহজ।

'ওয়ারিলি আইবলের মত লোক বেআইনী ডায়মণ্ড মাইনিঙের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে এবং ধরা পড়লে কী হতে পারে?' মেয়েটির দিকে চাইল রানা।

'একেক দেশে একেক আইন। সিয়েরা লিয়োনে তাকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মেরে ফেলা হবে। নামিবিয়ায় ফাইন দিতে হবে বিশ হাজার ডলার, সঙ্গে পাঁচ বছরের জেল।' রানা চেয়ে আছে দেখে জোর দিয়ে বলল কার্টা, 'আমি জানি। আমি ওই কোম্পানির সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট। ডজন খানেক দেশের হীরক ব্যবসার

সব আইন আমাকে জানতে হয়েছে। ঠিক যেমন তুমি জানো বন্দরগুলোর কাস্টমস আইন।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা, তারপর বলল, 'পাঁচ বছর জেল খুব কঠিন শাস্তি নয়। এমন নয় যে কেউ আত্মহত্যা করবে।'

'তুমি আফ্রিকার জেলখানা সম্পর্কে কিছুই জানো না।'

'দুয়েকটা ঘুরে দেখেছি। ওগুলো মিশেলিন গাইডের স্টার রেটেড হোটেল নয়।'

'পরিস্থিতি ওখানে ভয়ঙ্কর। যক্ষ্মা ও এইচআইভি ইনফেকশন রেট দুনিয়ার আর সব জায়গা থেকে অনেক বেশি। বেশ কিছু হিউম্যান রাইট গ্রুপ বিশ্বাস করে আফ্রিকার জেলখানার ভিতর সময় কাটানো মানেই মৃত্যুদণ্ড লাভ করা। ...এসব জানতে চাইছ কেন, রানা?'

'বুঝতে চাইছি কেন বন্দি না হয়ে আত্মহত্যা করল ওয়ারিলি আইবল।'

'তুমি ভাবছ সে আসলে ফ্যানাটিক না-ও হতে পারে?'

'সে আসলে কে বা কী ছিল, এখনও জানি না,' বলল রানা। 'এদিকের সাগরে বা মাটিতে অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে, কী সেটা বুঝতে পারছি না। আপাতত কিছুই বলার নেই। একবার মনে হয়েছিল বিশেষ দুটো বিষয় একসঙ্গে জড়িয়ে পেঁচিয়ে রয়েছে। কিন্তু এখন নিশ্চিত নই দুটো ঘটনা একই পাযলের অংশ কি না। হতেই পারে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্রের অংশ। এটা ঠিক, দুটো কো-ইনসিডেন্স একই এলাকায় ঘটেছে...'

'এবং তুমি কখনও কো-ইনসিডেন্স বিশ্বাস করো না,' বলল কার্টা।

'ঠিক।'

'কী ঘটছে বললে আমি হয়তো সাহায্য করতে পারব।'

'সরি, তোমাকে বলা উচিত হবে না।'
সাগর চিরে এগিয়ে চলেছে ওদের নৌযান।

চোদ্দ

সরু, রুক্ষ রানওয়ের দিকে নেমে আসছে ডি হ্যাভিল্যাণ্ড টুইন অটার, দূর থেকে দেখলে মনে হবে মাটির একটু উপরে ভাসছে ওটা মৌমাছির মত। উড়োজাহাজটার ডিজাইন উনিশ শ' ষাট সালের, উঁচু ডানাগুলোর সঙ্গে মানানসই দুটো ইঞ্জিন, বেশিরভাগ বুশ পাইলটের কাছে আজও এর কদর মোটেও কমেনি। সামান্য সমতল জমি পেলেই নেমে পড়তে পারে, তাতে বড়জোর লাগে এক হাজার ফুট রানওয়ে। টেকঅফ করবার সময় আরও কম দৈর্ঘ্যের হলেও চলে।

রানওয়ের পাশে বিশাল গর্তের ভিতর বসে আছে ডেভিল্‌স্ ওয়েসিস, ওটাকে কমলা পতাকা দিয়ে চিনিয়ে দেয়া হয়েছে। জোরালো হাওয়ায় চারপাশে উড়ছে প্রচুর ধুলো, এরই মধ্যে নামছে অটার। এয়ারস্ট্রিপের ঠিক মাঝে নেমে এল পাইলট। গতি কমাতেই ধুলোর ঝড় তৈরি করল টার্বো-প্রপেলারগুলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য ধুলোবালির আড়ালে ঢাকা পড়ল বিমানটা। প্রপেলারগুলো বন্ধ হবার এক মিনিটের আগেই ঝাঁকি খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল অটার। দু' মিনিট পর ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে পিছন-দরজা খুলে গেল, কিন্তু ততক্ষণে এয়ারক্রাফটের পাশে এসে হাজির হয়েছে ছাতবিহীন এক জিপগাড়ি।

বিমানের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ডক্টর নিকোলাস ক্রিস্টোফার। খুবই আড়ষ্ট ভঙ্গি, ছ' ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা দেহটা আগাগোড়া টনটন করছে ব্যথায়। কট-কট করে ফুটছে মেরুদণ্ডের হাড়। সেই যিম্বাবুইয়ের রাজধানী হারেরো থেকে সাত শ' মাইল উড়ে এসেছে। তার আগে ইউনাইটেড স্টেট্স্ থেকে সোজা যিম্বাবুইয়ে-তে নেমেছে। ঠিক জায়গায় ঘুষ দেয়া হয়েছে, কাজেই কোনও রেকর্ডস নেই। কেউ জানবে না সে আফ্রিকায় পা রেখেছে, খোঁজ নিলে জানবে এখনও বিজ্ঞানী রয়েছে মেইনে, নিজ বাড়িতে।

জিপগাড়ির মহিলা ড্রাইভারের নাম ডুলি গ্রিন, ডক্টর ক্রিস্টোফার পরিবেশ নিয়ে কাজ শুরু করবার পর থেকেই সে এই সংঘের সঙ্গে জড়িত। প্রথম থেকেই উপযুক্তদের রিক্রুট করবার কাজ করছে। বলতে গেলে সে-ই খুঁজে বের করেছে দক্ষ এবং যোগ্য একদল মানুষকে। তাদের সবার ধারণা: প্রতিটি দেশকে ভাল ভাবে ঝাঁকিয়ে দিতে হবে, নইলে এসব দেশের সরকার বুঝবে না, জানবে না পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষা করবার এখনই শেষ সময়।

'যাক, তবু এলেন, এবার বুঝবেন আমরা কোন্ নরকে বাস করছি,' শুভেচ্ছা জানানোর বদলে ক্রিস্টোফারের দিকে চেয়ে হাসল ডুলি। ভক্তি ও ভালবাসা প্রকাশ পেল কালো চোখের দুই মণিতে। হল্যাণ্ডের মানুষ সে, ওই দেশের বেশিরভাগ মানুষের মতই প্রায় নিখুঁত ইংরেজি বলে।

'জানি, কিন্তু আগে আসার সময় হয়নি,' বলল ক্রিস্টোফার। 'আর তুমি তো জানো আমরা অশুভ জিনিয়াসরা সবসময় লুকিয়েই থাকি?'

'তাই বলে এমন জায়গা বাছতে হয়? এক শ' কিলোমিটারের ভিতর কোনও ফ্লাশ টয়লেট নেই, কামড়ে খেয়ে ফেলতে চাইছে

পোকাগুলো!'

'এখানে না এসেই বা উপায় কী? শুকিয়ে যাওয়া আগ্নেয়গিরির সব জ্বালামুখ দখল করে নিয়েছে আমার চেয়ে বড় বড় ভিলেনরা। বাধ্য হয়ে একটা ডামি কোম্পানির মাধ্যমে নামিবিয়ার সরকারের কাছ থেকে এই জেলখানা ভাড়া নিয়েছি। বলেছি আমরা একটা সিনেমার শুটিং করব।' পাশ ফিরল ক্রিস্টোফার, পাইলটের হাত থেকে বুঝে নিল ব্যাগ। লোকটাকে বলল, 'রিফিউয়েল করে নাও, কিছুক্ষণ পর আবারও উড়াল দেব।'

বিস্মিত চোখে ডক্টরকে দেখল ডুলি। 'তা হলে আপনি আমাদের সঙ্গে থাকছেন না?'

'সরি, উপায় নেই। ভেবেছিলাম থাকব, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে যেতে হবে ক্যাবিণ্ডা।'

'বড় কোনও সমস্যা?'

'একটু বড়ই, সঠিক সময়ে মার্সেনারিদের হাতে পৌঁছায়নি ইকুইপমেন্ট। তা ছাড়া, আগেই নিশ্চিত হতে চাই, অ্যাসল্টের জন্য যেসব বোট ব্যবহার করব, সেগুলো ঠিক আছে কি না। আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে প্রকৃতি মাতা। মাত্র গত ক'দিন আগে শেষ হলো একটা সাইক্লোন, এরই ভিতর তৈরি হচ্ছে আরেকটা। মনে হয় না এক সপ্তাহের বেশি অপেক্ষা করতে হবে।'

খুশি হয়ে উঠল মেয়েটি, উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ। 'এত তাড়াতাড়ি? এ তো বিশ্বাসই হচ্ছে না!' ডক্টর ক্রিস্টোফারের পাশে হেঁটে জিপগাড়িতে উঠল সে, দু'জন রওনা হয়ে গেল জেলখানার দিকে।

'দীর্ঘ আঠারো মাস ধরে কাজ করছি, এবার তার ফল দেখব,' বলল ক্রিস্টোফার। 'আমাদের কাজ যখন শেষ হবে, পৃথিবীর বুদ্ধিমান একটা লোকও বলবে না বৈশ্বিক উষ্ণতা ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর

নয়।'

দু' মিনিট পেরুনোর আগেই কারাগারে ঢুকে পড়ল জিপ। এই জেলখানা প্রকাণ্ড এক তিনতলা পাথরের বাড়িতে, দেখলে মনে হয় বিশাল কোনও ওয়্যারহাউস। ছাতে প্রহরীদের জন্য রয়েছে কয়েকটা পাথুরে মঞ্চ, ওখান থেকে নজর রাখা হতো মরুভূমিতে। চার দেয়ালে মাত্র একটি করে জানালা। সেকারণেই আরও ভয়ঙ্কর লাগে ভবনটা, প্রাচীন কোনও দুর্গ যেন, ওখানে আটকে রেখে নির্যাতন করা হতো মানুষকে। মাঝরাতে ওই ভবনের কালো ছায়া পড়ে সাদা মরুভূমির উপর, যে-কেউ ভাবতে পারে ওই বাড়িতে বাস করে স্বয়ং ইবলিস।

আকাশ-ছোঁয়া কাঠের দুটো কবাট জিপের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল। ওই দরজা দিয়ে একইসঙ্গে ঢুকতে পারে বড় দুটো ট্রাক। ভবনের মাঝে বড়সড় উঠান। ভবনের প্রথম তলা ব্যবহার করা হতো কারাগার কর্তৃপক্ষের অফিস ও প্রহরীদের ডরমেটরি হিসাবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় কুঠুরিগুলোর ভিতর রাখা হতো বন্দিদের।

এখন কড়া রোদে জ্বলছে এক্সারসাইয করবার উঠান। তাপে হালকা হয়ে গেছে বাতাস, তারপরও পরিবেশটা যেন ফুটন্ত সীসার মত গনগনে।

প্রধান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এরিয়ার সামনে জিপ থামতেই জানতে চাইল ক্রিস্টোফার, 'আমাদের অতিথিদের কী অবস্থা?'

'যিম্বাবুইয়ের লোকগুলো তাদের বন্দিকে নিয়ে গতকাল এসেছে,' ওর দেবতার দিকে ঘুরে চাইল ডুলি গ্রিন। 'বুঝতে পারছি না এরা এখানে কেন।'

'ওটা একটা ট্যাকটিকাল নেসেসিটি। আমাকে আফ্রিকায় ভিসা ছাড়াই ঢুকতে দেয়া এবং অন্য সব সুবিধা পাওয়ার বদলে কিছু দিনের জন্য তারা এই কারাগার ব্যবহার করবে। তাদের

বন্দি বিরোধী দলের প্রধান, তাকে দেশদ্রোহী হিসাবে বিচার করা হবে। যিম্বাবুইয়ের সরকার ভাবছে, লোকটার অনুসারীরা যে-কোনও সময়ে জেল ভেঙে তাকে বের করে নিয়ে লুকিয়ে ফেলবে দেশের অন্য কোথাও। সে কারণেই সরকার চাইছে আগে দেশের বাইরে কোথাও লুকিয়ে রাখবে লোকটাকে, তারপর প্রহসনের বিচার শেষ হলে হারেরোতে নিয়ে সবার সামনে ফাঁসি দেবে।'

'লোকটাকে যখন দেশে ফিরিয়ে নেবে, তার লোকরা জেল ভেঙে বের করবে না তাকে?'

'সময় পাবে না, যা করার করে ফেলবে এক ঘণ্টার ভিতর।'

'ব্যাপারটা আমার কাছে ভাল ঠেকছে না, ডক্টর। আফ্রিকার দুর্নীতি-পরায়ণ সরকারগুলোর ভিতর সবচাইতে খারাপ বর্তমান যিম্বাবুইয়ে সরকার। যারা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তারা বোধহয় সঠিক পথেই চলেছে।'

'আমিও তোমার সঙ্গে একমত, কিন্তু দরাদরি করার উপায় ছিল না আমার,' ক্রিস্টোফারের বলার ভঙ্গিতেই প্রকাশ পেল, আসলে বলছেঃ এর বেশি আর কিছু জানতে চেয়ো না। 'আমার প্রাক্তন বিজনেস পার্টনারের কী অবস্থা? কী করছে সে?'

নাক কুঁচকে ফেলল ডুলি। 'মাত্র বুঝতে শুরু করেছে অন্যায় ভাবে অন্যের সফলতা চুরি করার দায়ে তাকে দণ্ড দিতে হবে।'

'গুড। আমি ওই হারামজাদার চেহারায় ব্যর্থতা দেখতে চাই। ওর বুঝতে হবে, কত বড় অপরাধ করেছে।'

কারাগারের ভিতর ঢুকে পড়ল তারা। দলের প্রত্যেককে নাম ধরে ডাকল নিকোলাস ক্রিস্টোফার। তাতে মুগ্ধ হয়ে গেল সবাই। আসিফ হায়দার চৌধুরির মত করে মুহূর্তে মানুষকে আপন করে নিতে পারে না ক্রিস্টোফার, কিন্তু দেড় বছরের চেষ্টায় সে এই মানুষগুলোর অন্তরে ঢুকে গেছে, হয়ে উঠেছে সত্যিকারের হিরো। দলের এক মেয়ের হাতে তিনটে রেড ওয়াইন তুলে দিল সে।

পরের আধ ঘণ্টা আলাপের ফাঁকে সবাই মিলে মদ্যপান করল। এক মহিলার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দিল ক্রিস্টোফার, মেয়েটির সম্মানে টোস্ট করল, সবাই মিলে চিয়ার্স জানাল তাকে।

এরপর ওয়ার্ডেনের অফিসে ঢুকল ক্রিস্টোফার, তার নির্দেশে আসিফ হায়দার চৌধুরিকে নিয়ে আসতে গেল কয়েকজন প্রহরী। সেই ফাঁকে কয়েক মিনিট পোজ দিয়ে ক্রিস্টোফার ঠিক করে নিল আসিফ হায়দার চৌধুরি ঘরে ঢুকলে কীভাবে সে কোন্ ভঙ্গি নেবে। ডেস্কের পিছনে বসে দেখল, কিন্তু বসে থাকলে নিজেকে বিরাট কিছু মনে হয় না। শেষে দাঁড়াল গিয়ে অফিসের জানালায়, মাথা নিচু করে রাখল, ভাব দেখে মনে হলো একা ওর কাঁধের উপর চেপে বসেছে গোটা পৃথিবী।

এর এক মিনিট পর অফিসে এসে ঢুকল গার্ডরা। প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে আসিফ হায়দার চৌধুরিকে। হাত দুটো পিছনে হ্যাণ্ডকাফে আটকানো। ব্যবসা থেকে অবসর নেয়ার পর প্রাক্তন দুই বন্ধুর আর সামনা-সামনি দেখা হয়নি, কিন্তু বেশ কিছু টেলিভিশন ইন্টারভিউ দেখেছে ক্রিস্টোফার। সে-কারণেই আসিফকে দেখে হাসি পেল তার। গত কয়েক দিনের বন্দিত্ব এবং অনিয়মে ধসে গেছে লোকটা। উজ্জ্বল চোখ দুটোর চাহনি ভোঁতা হয়ে গেছে। গর্তের ভিতর ডেবে গেছে দুই চোখ, দেখে মনে হলো তাড়া খাওয়া কোনও বন্য জন্তু। কিন্তু অবাক ব্যাপার, এক সময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে দেখেই ঝিলিক দিয়ে উঠল ওর চোখদুটো। বিব্রত বোধ করল ক্রিস্টোফার। ওই তো সেই আসিফ হায়দার চৌধুরি, আগের মতই নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে পরিস্থিতি! ভাবল সে, যদি ওই হারামজাদার মত সবাইকে মুগ্ধ করতে পারতাম!

একবার তার মন চাইল, বসে পড়বে চেয়ারে।

'নিকোলাস,' শান্ত স্বরে বলতে শুরু করেছে আসিফ হায়দার

চৌধুরি, 'জানি না কেন আমার এমন ভয়ঙ্কর ক্ষতি করতে চাইছ, কিন্তু নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তুমিই জিতেছ। তুমি যা চাও, পরিষ্কার ভাবে বলো, আমি মেনে নেব। বদলে শুধু একটাই অনুরোধ, এসব বন্ধ করো। তুমি যদি কোম্পানিটা ফিরে পেতে চাও, আমি সই করে দেব, সরে যাব তোমার পথ থেকে। তুমি যদি আমার সব টাকা চাও, শুধু জানিয়ে দাও কোন্ অ্যাকাউন্টে ট্র্যান্সফার করতে হবে। তুমি কোনও ঘোষণা-পত্র লিখলে সেটা বিনা দ্বিধায় সই করে দেব, এবং পরেও সেটার জন্য দায়বদ্ধ থাকব। তোমার যদি মনে হয় এই শাস্তি আমার প্রাপ্য, তা-ও মাথা পেতে নেব।'

শুয়োরের বাচ্চা নাটকীয়তা ছাড়েনি, ভাবল নিকোলাস ক্রিস্টোফার। সন্দেহ কী হারামজাদার পিছনে ছুটবে সবাই! এক সেকেণ্ডের জন্য তার লোভ হলো, শয়তানটার প্রস্তাব মেনে নিলে কেমন হয়? তারপর নিজেকে সামলে নিল সে। কোনও ভাবেই সত্য-পথ থেকে সরবে না। দ্বিধা কাটিয়ে উঠল। 'এটা তোমার আলোচনার টেবিল কিংবা মিডিয়ার সাক্ষাৎকার নয়, চৌধুরি। আমার সঙ্গে গিয়ে সব দেখবে তুমি। এটা আমার জন্য একটা বোনাসের মত। প্রাক্তন বন্ধু, বর্তমানের শত্রু, এবার তুমি হবে শুধু সাইড শো, আসল অনুষ্ঠান চলবে আমার নির্দেশনায়।'

'এসবের কি কোনও প্রয়োজন আছে? আসলে কী চাও তুমি, বলো তো?'

'চোপ! একটা কথাও বলবে না!' গর্জে উঠল ক্রিস্টোফার। 'তোমার জানা নেই পৃথিবীর ক্ষমতাশালী মানুষগুলোকে কীভাবে শিক্ষা দিতে হবে?' বড় করে শ্বাস ফেলল সে, আগের চেয়ে অনেক শান্ত স্বরে বলল, 'আমি যেভাবে যা করব, প্রকৃতির তাণ্ডবকে নিতান্তই ছেলেখেলা মনে হবে। যেভাবে হোক পাল্টে দিতে হবে বর্তমানের পৃথিবীকে। উপকূল ভাসিয়ে এমন একটা

জলোচ্ছ্বাস তৈরি করতে যাচ্ছি, যাতে সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশের কয়েক লক্ষ লোক মারা পড়ে। বড় দেশগুলোর তাবৎ গর্দভ নেতারা আমার মত করে ভাবছে না। অবশ্য তুমি তো নিজেও সায়েন্টিস্ট, তুমি সবই বুঝবে। আগামী শতাব্দী আসার আগেই ধ্বংস হয়ে যাবে হাজার হাজার বছরের মানব সভ্যতা, সবই হারিয়ে যাবে কতিপয় নির্বোধ, স্বার্থান্ধ মানুষের জন্যে।

'মাত্র কয়েক ডিগ্রি তাপ বাড়লে গোটা পৃথিবীর পরিবেশের উপর ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়বে— এরই ভিতর পাল্টাতে শুরু করেছে পরিবেশ। এই গ্রহ এখনও অতটা উত্তপ্ত হয়নি যে গ্লেসিয়ারগুলো গলবে, কিন্তু এরই ভিতর গ্রিনল্যাণ্ডের বরফ গলতে শুরু করেছে। সব পানি এসে পড়ছে সাগরে। আগে কখনও এমন ঘটনা দেখা যায়নি। সাগরের পানি বাড়তে শুরু করেছে বলেই মাটির ভিতর নোনা পানি তেলের মত কাজ করছে। কোথাও কোথাও দ্বিগুণের বেশি গলছে বরফ। বহু দেশের বেশিরভাগ জমি সাগরের নীচে ডুবে যাবে। আমরা এখানে বসে আছি, কিন্তু আমাদের সন্তানরা কোথায় থাকবে?'

'আমি তোমার কথা উড়িয়ে দিচ্ছি না, কিন্তু বলতে চাই...'

'তোমার কিছুই বলতে হবে না, চাইলেই আমার কথা উড়িয়ে দিতে পারবে না,' ধমকে উঠল ক্রিস্টোফার। 'সচেতন কোনও মানুষ পারবে না, কিন্তু এ ব্যাপারে কেউ কিছু করছে না। কাজেই চাক্ষুষ দেখাতে হবে— মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে প্রকৃতি কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে। সবাই ভাবছে গ্রিনল্যাণ্ডে বরফ গললে তাদের কী, কিন্তু নিজের বাড়ি যখন থাকবে না, ভাল করেই বুঝবে সব। আমাকে এখন পৃথিবী রক্ষার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, নইলে একটা মানুষও বাঁচবে না।'

'এত মানুষ মেরে ফেলে, নিক...'

'এখনই সাবধান না হলে এর চেয়ে হাজার গুণ বেশি মানুষ

মরবে। এটা ভেবে দেখো, কয়েক বিলিয়ন মানুষের জন্য এক মিলিয়ন মানুষ মরলে তাতে পৃথিবীর কোনও ক্ষতি হবে না। এটা আত্মত্যাগও বলতে পারো। তোমার যদি একটা হাতে গ্যাংগ্রিন ধরে, বাঁচার জন্য বাধ্য হয়ে ওই হাত কেটে ফেলতে হবে—এটাই নিয়ম।'

'কিন্তু তুমি কথা বলছ নিরপরাধ কোটি কোটি মানুষের জীবন নিয়ে, গ্যাংগ্রিনের সঙ্গে এটাকে তুলনা করা যায় না।'

'বেশ, খুব ভাল তুলনা দিতে পারিনি, কিন্তু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যুক্তি ঠিক আছে? তা ছাড়া, তুমি যেমন করে ভাবছ কোটি কোটি মানুষ মরবে, আসলে তত মরবে না। আজকাল আবহাওয়ার রিপোর্ট দ্রুত পৌঁছে যায় মানুষের কানে। বহুবার সতর্ক করার সময় পাবে সরকার।'

'তাই ভাবছ?' থুতু ফেলল আসিফ হায়দার কামরার মেঝেতে। 'কখনও জানতে চেয়েছ এক-একটা সাইক্লোনে মারা যায় বাংলাদেশের কত লক্ষ মানুষ, কেমন অসহনীয় কষ্টের ভিতর পড়ে দরিদ্র শিশু-কিশোর-নারী-পুরুষ?'

'ক্ষতি তো কিছু হবেই। আর তোমার জন্য একটা চমকও রেখেছি। এবারের এই ঝড়টার পর বাংলাদেশের দিকে বিশেষ নজর দেব আমি। শুনেছি তোমার ওই দেশের সরকার দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণে পৃথিবীতে সেরা। ওদের দেখিয়ে দিতে চাই সত্যিকারের দুর্যোগ কাকে বলে। ...যাই হোক, আমি যা বলছিলাম, গত আড়াই দশক ধরে আমরা জানি পরিবেশ বিজ্ঞানীরা সবাইকে সতর্ক করছেন। আমরা কেউ তাতে কান দেইনি। কোনও ব্যবস্থাও নেইনি। এবার সময় হয়েছে কিছু করার। আমি নিজেই মানুষকে বোঝানোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছি। মানব জাতিকে রক্ষার জন্য এ কাজ আমাকে করতেই হবে।'

এক সময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দিকে অবিশ্বাস নিয়ে চেয়ে রইল

আসিফ হায়দার চৌধুরি। একটা কথাই এল তার মনে— বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে লোকটা! আগেও কেমন যেন ছিটেল মত ছিল, কিন্তু এমআইটিতে ওর মত ভাল ছাত্র খুব কম ছিল। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে পুরো পাগল হয়ে উঠেছে! পাগলামি নয়, ভয়ঙ্কর ম্যানিয়ায় ধরেছে তাকে! আসিফ বুঝতে পারছে, এখন আর কোনও যুক্তি দিয়ে কোনও লাভ হবে না, সম্পূর্ণ খারাপ হয়ে গেছে তার মাথাটা। দুনিয়ার সমস্ত যুক্তি দিয়েও ফ্যানাটিককে কখনও পথে আনা যায় না।

তারপরও শেষ চেষ্টা করল আসিফ। 'তুমি যদি মানব জাতির এতই মঙ্গল চাও, তো বেচারি ক্যারেন কুম্বসকে খুন করলে কেন?'

আসিফের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল ক্রিস্টোফার। 'যারা আমার সঙ্গে কাজ করছে, তারা যথেষ্ট দক্ষ নয়, সে কারণেই বাইরে থেকে সাহায্য নিতে হয়েছে।'

'মার্সেনারি?'

'হ্যাঁ। ওরা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। কিন্তু ক্যারেন কুম্বসকে খুন করা হয়নি। বলতে পারো গুরুতর ভাবে অসুস্থ।'

আসিফ হায়দার চৌধুরিকে দেখে মনেই হলো না কিছু করতে পারে, কিন্তু হাত ধরে রাখা পাশের লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল সে, তারপর তীরের মত সামনে বাড়ল। লাফ দিয়ে উঠে এল ডেস্কের উপর, ডান হাঁটু দিয়ে গায়ের জোরে গুঁতো দিল চেয়ারে বসা ক্রিস্টোফারের চোয়ালে। দুই সেকেণ্ড পর নড়ে উঠল দুই প্রহরী। তাদের একজন হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিল আসিফ হায়দার চৌধুরিকে। ডেস্ক থেকে ফ্লোরে পড়ল সে, দুই হাতে পিছমোড়া করে হাতকড়া পরানো; ঠেকাতে পারল না মুখের উপর পড়া লাথি ও ঘুষি। কিন্তু কোনও ব্যথা পেল না, মেঝেতে পড়তেই মাথা ঠুকে গেছে, জ্ঞান হারিয়েছে বিজ্ঞানী।

'সত্যিই দুঃখিত, ডক্টর ক্রিস্টোফার,' ডান দিকের প্রহরী

বলল। চলে গেছে সে ডেস্কের পিছনে, আস্তে করে টেনে তুলল ওকে।

ক্রিস্টোফার টের পেল, ঠোঁটের কষা ফেটে রক্ত পড়ছে। দুই আঙুলে রক্ত মুছল সে। ভঙ্গিটা এমন, ভাবতে পারছে না তার দেহ থেকে রক্ত বেরুতে পারে। বেসুরো কণ্ঠে বলল, 'ও বেঁচে আছে?'

আসিফ হায়দার চৌধুরির কবজি ও গলার শিরা পরখ করল এক প্রহরী। 'হৃৎপিণ্ড ঠিক ভাবেই চলছে। তবে জ্ঞান ফেরার পর কংকাশন হতে পারে, স্যর।'

'গুড,' অচেতন আসিফের পাশে দাঁড়াল ক্রিস্টোফার, আস্তে করে জুতোর ডগা দিয়ে থুতনিতে খোঁচা দিয়ে বলল, 'মেলোড্রামাটিক সিনেমার অভিনয় করলে, কিন্তু এরপর থেকে তোমার নিজের কোনও ক্ষমতা থাকবে না নড়বার। ...নিয়ে যাও ওকে, আটকে রাখো। জ্ঞান ফিরলে খবর দেবে, ওর সঙ্গে আরও কথা আছে আমার।'

এর দুই ঘণ্টা বিশ মিনিট পর আবারও আকাশে উঠল টুইন-ইঞ্জিন অটার, সোজা উত্তর দিকে অ্যাঙ্গোলার ক্যাবিণ্ডা প্রদেশ লক্ষ্য করে চলেছে।

পনেরো

এইমাত্র দড়ির মই বেয়ে নিজ টেণ্ডারে নেমেছে হার্বার পাইলট, আর দেরি না করে হুইল হাউসের গোপন এলিভেটরে করে অপারেশন্স সেন্টারে নেমে এসেছে সোহেল আহমেদ ও স্বর্ণা

সানজিদা। যেন অতি পুরনো ময়লা টয়লেট থেকে নাসার মিশন কন্ট্রোল রুমে ঢুকেছে ওরা। একটু আগে ক্যাপ্টেনের অভিনয় করেছে সোহেল, যদিও ওর ডিউটি অফ চলছে। ওর পাশে ছিল হঠাৎ বনে যাওয়া ফার্স্ট মেট স্বর্ণা সানজিদা।

'আপনি কি এখন কেবিনে ফিরবেন, সোহেল ভাই?' নিজের সিটে বসেই জানতে চাইল স্বর্ণা। কানে পরে নিয়েছে হেডসেট।

'না,' হতাশ স্বরে বলল সোহেল। 'ফারা বলছে আরও পাঁচ পাউণ্ড ওজন কমাতে হবে, নইলে ফিট থাকতে পারব না। কাজেই এখন যাব যিমে। আমাকে নাকি কী এক পাওয়ার-ইয়োগা শিখিয়ে দেবে।'

'ডিউটি না থাকলে শিখে নিতে পারতাম,' মুচকি হাসল স্বর্ণা। গত সপ্তাহে যিমনেশিয়াম এড়িয়ে গেছে সোহেল ভাই, আজ ঠিকই ধরা পড়েছে ডক্টর ফারার পরীক্ষায়। সুন্দরী ডাক্তারের ভয়ে ওরা কেউ যিমনেশিয়াম ফাঁকি দেয় না।

'আমাকে সাইকেলের চাকার মত গোল বানাতে চাইছে,' প্রায় নালিশ করল সোহেল। 'আমি একদিন পালিয়ে যাব।'

'সাগরে কোথায় পালাবেন, সোহেল ভাই?' জানতে চাইল রায়হান। 'হেথা নয়...'

'বন্দর দিয়ে ভাগতে না পারলে তোমাদের লাইফবোট নিয়ে ভাগব।' নিজ কেবিনের দিকে পা বাড়াল সোহেল।

নীরবে চারপাশে নজর রাখা হচ্ছে, শিপিং লেন এড়িয়ে এইমাত্র তুমুল গতি তুলতে শুরু করেছে মার্ভেল। জানা গেছে উত্তর দিকে তৈরি হচ্ছে বড় একটা ঝড়, কিন্তু ওটা সম্ভবত পশ্চিম দিকে সরবে, আগামীকাল বিকেলে কোয়াকোপমুণ্ডে পৌঁছুতে ওদের কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। অলস সময়ে জরুরি কাগজপত্র পড়তে শুরু করল স্বর্ণা। ওর প্রিয় সোহেল ভাই, রায়হান, ক্যাপ্টেন নবী, নিশাত আপা ও কমাণ্ডোরা অ্যাসল্ট

মিশনের জন্য কাগজ তৈরি করেছে। এখনও ঠিক হয়নি কারা যাবে ডেভিল্‌স্ ওয়েসিস মিশনে।

'স্বর্ণা,' কমিউনিকেশন্স স্টেশন থেকে বলল রায়হান। 'এইমাত্র ওয়ায়ার সার্ভিস থেকে তথ্য পেলাম। কথাটা আপনার বিশ্বাস হবে না— আপনার ডিসপ্লেতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

খবরটা চুপচাপ পড়ল স্বর্ণা, দেরি না করে শিপের চ্যানেলে যিমনেশিয়ামে সোহেলের সঙ্গে যোগাযোগ করল: 'সোহেল ভাই, দয়া করে এখনই অপারেশন্স সেন্টারে চলে আসুন।'

বিকট চেহারা করে প্রায় তিন কোনা হয়ে যিমনেশিয়ামে ফারার দেয়া শাস্তি ভোগ করছিল সোহেল, স্বর্ণার কণ্ঠ শুনে মনে মনে স্রষ্টার কাছে দোয়া করল: বাপু হে, স্বর্ণা মেয়েটা খুবই ভাল, ওর ভাল কোরো!' ফারার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এল ও।

'কী ব্যাপার, স্বর্ণা, হঠাৎ আমাকে কীসের দরকার?'

সোহেলের সুবিধার জন্য নিজের ফ্ল্যাট প্যানেল ডিসপ্লে ঘুরিয়ে দিল স্বর্ণা।

পড়তে শুরু করল সোহেল। ঘরের সবাই কান খাড়া করে ফেলেছে। প্রত্যেকে টের পেয়েছে, কোনও খারাপ সংবাদ আছে।

'সোহেল, কী ব্যাপার?' হেলমস থেকে জানতে চাইল গগল।

'স্যামুয়েল আবালা কু করতে যাচ্ছিল,' বলল স্বর্ণা। 'কয়েক ঘণ্টা আগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

'আবালা?' নিজেকেই যেন জিজ্ঞেস করল গগল। 'নামটা এত পরিচিত লাগছে কেন?'

জবাবে বলল সোহেল, 'কঙ্গোর ডেপুটি ডিফেন্স মিনিস্টার, অস্ত্র যোগানের ব্যাপারে আমাদের কন্ট্যাক্ট ছিল।'

'সর্বনাশ! তাই তো!' আরও গম্ভীর হয়ে গেল গগল।

'রায়হান, অস্ত্রের ব্যাপারে কোনও তথ্য পেলে?' জানতে

চাইল সোহেল। কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট বসের বন্ধুর ছেলে না হলে ওই দেশের স্থানীয় রাজনীতি নিয়ে মাথা-ব্যথা থাকত না ওর। বুঝতে পারছে, ওদের সাপ্লাই দেয়া অস্ত্রের দায়-দায়িত্ব ওরা এড়াতে পারবে না।

'সরি, সোহেল ভাই, এখনও চেক করিনি। মাত্র কয়েক মিনিট আগে এপি ওয়ায়ার সার্ভিস থেকে খবরটা পেলাম।'

'সোহেল ভাই, কী ভাবছেন?' জিজ্ঞেস করল স্বর্ণা।

'পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে,' বলল সোহেল। 'আবালা যদি বিদ্রোহীদের রেডিও ট্যাগের কথা বলে থাকে, ওগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তার মানে, আফ্রিকার সবচেয়ে বাজে একদল লোকের হাতে পাঁচ শ' অ্যাসল্ট রাইফেল এবং শ' খানেক গ্রেনেড লঞ্চার তুলে দিয়েছি।'

'অস্ত্র উদ্ধারের ব্যাপারে এখনও কোনও তথ্য দেয়া হয়নি,' ইন্টারনেট থেকে মুখ তুলল রায়হান। 'গুটি থেকে এইমাত্র খবর ছড়াতে শুরু করেছে। পরে সবই একে একে প্রকাশ হবে।'

'নাও হতে পারে,' সাধারণত অপারেশন্স সেন্টারে সিগারেট ধরায় না সোহেল, এখন ঠোঁটে ঝুলিয়ে ফেলেছে একটা সিগারেট। তবে না জ্বেলে চাপা স্বরে বলল, 'আবালা ওদের বলে দিয়েছে ধরে নিতে পারি।'

'রায়হান, আমরা এখন কোনও ভাবে রেডিও ট্যাগ থেকে সিগনাল পেতে পারি?' জানতে চাইল গগল।

ভুরু কুঁচকে ফেলল রায়হান রশিদ। 'বোধহয় না, মিস্টার গগল। ওগুলোর রেঞ্জ অনেক কম। কথা ছিল অস্ত্রের ভেতর বসানো ট্র্যান্সমিটারের সিগনাল পেয়ে কঙ্গোলিজ ফোর্স পৌঁছবে বিদ্রোহী বেসে। সেজন্য তাদের হাতে কয়েকটা ছোট ডিটেক্টর দেয়া হয়।'

'তার মানেই আমরা সব যোগাযোগ হারিয়েছি,' আনমনে

বলল গগল। 'ওগুলো যে-কোনও জায়গায় থাকতে পারে, খুঁজে বের করবে কে?'

'রানার উপস্থিত বুদ্ধির ওপর ভরসা রাখুন,' বলল সোহেল। 'অস্ত্র দেয়ার আগে কয়েকটা ট্যাগ পাল্টে দিয়ে আমাদের বিসিআই থেকে পাওয়া ট্যাগ বসিয়ে দেয়া হয়েছে। ওগুলোর রেঞ্জ প্রায় এক শ' মাইল।'

'কিন্তু সোহেল ভাই, রেঞ্জ বড় কথা নয়,' বলল রায়হান। 'আবালার জানা আছে অস্ত্রের কোথায় ট্যাগ আছে। নিশ্চয়ই বিদ্রোহীদের সেটা জানিয়েছে, এতক্ষণে সরিয়ে ফেলেছে সব। বিসিআইয়ের ডক্টর শমশের আলীর মালও।'

মাথা নাড়ল সোহেল। 'বিসিআই ট্যাগ আছে একে-৪৭-এর বাঁট ও গ্রেনেড লঞ্চারের গ্রিপের ভিতর।'

'অর্থাৎ, এই সম্ভাবনার কথাটা ছিল মাসুদ ভাইয়ের মাথায়!' প্রশংসার সুরে বলল স্বর্ণা। ওরা কেউ জানল না, অন্য কোথাও রাখার বুদ্ধিটা বেরিয়েছে সোহেলের মাথা থেকেই। 'আমাদের ট্যাগ সরিয়ে ফেলবে ওরা, কিন্তু ঠিকই থাকবে বিসিআইয়ের ট্যাগ।'

'আর অন্য ফ্রিকোয়েন্সিতে জানাবে: আমরা এখানে,' নিজ সিটে বসল সোহেল। প্যাকেটে রেখে দিয়েছে সিগারেট।

'আমরা জানলাম না কেন, সোহেল ভাই?' জানতে চাইল রায়হান।

'বলতে পারো রানা বা আমি একটু বেশি প্যারানইয়ার ভিতর ছিলাম,' বলল সোহেল। 'কাউকে আর বলা হয়ে ওঠেনি। আমরা ভাবিইনি ওসব ট্যাগ কাজে লাগবে।'

'সোহেল ভাই, কত যেন বললেন রেঞ্জ?' জানতে চাইল স্বর্ণা। 'কখন থেকে টের পাব আমরা?'

'এক শ' মাইল দূর থেকে।'

'তারপরও খড়ের গাদার ভিতর সুই খোঁজার মত কাজ,' বলল গগল। 'বিদ্রোহীরা কোথায় লুকাবে তা কে জানে!'

'সমস্যা অন্য জায়গায়,' বলল সোহেল। 'রেঞ্জ বাড়াতে গিয়ে ব্যাটারির ক্ষমতা আর বাড়ানো যায়নি। আটচল্লিশ ঘণ্টা থেকে শুরু করে বাহাত্তর ঘণ্টার ভিতর একটার পর একটা ট্যাগ বন্ধ হবে। তারপর কোনও ভাবেই আর খুঁজে পাব না। তার আগেই ট্র্যাক করতে হবে, কঙ্গোলিজ আর্মিকে জানিয়ে দিতে হবে ঠিক কোথায় আছে ওগুলো।'

'তার মানে সামনে থাকছে মাত্র দুটো অপশন,' বলল স্বর্ণা।

'এক মিনিট,' স্বর্ণাকে বলল সোহেল। 'রায়হান, রানার স্যাটালাইট ফোনে যোগাযোগ করা যায় কি না দেখো। ...হ্যাঁ, বলো স্বর্ণা, অপশন দুটো কী?'

'প্রথমত, আমরা ফিরতি পথ ধরতে পারি, কেপ টাউনে ফিরে একটা টিম পাঠাতে পারি কঙ্গোতে। তাদের কাছে দিতে পারি ডিটেকশন গিয়ার। ...সোহেল ভাই, জিনিসটা কি পোর্টেবল?'

'বুম বক্সের সমান হবে। কিন্তু আবারও কেপ টাউনে ফেরা মানেই কমপক্ষে পাঁচ ঘণ্টা খরচ করা। তা ছাড়া, থাকছে বন্দর কর্তৃপক্ষের ঝামেলা। আবারও এখানে ফিরতে পাঁচ ঘণ্টা।'

'সেক্ষেত্রে আমরা জাহাজ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি। আমাদের টিম নামতে পারে নামিবিয়ায়। সোয়াকোপমুণ্ড এয়ারপোর্টে তাঁর জাম্প প্লেন নিয়ে অপেক্ষা করছেন ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসান। ইচ্ছে করলে আমরা ওই এয়ারপোর্টে কন্টার দিয়ে আমাদের টিমকে পৌঁছে দিতে পারি। ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসান তাদের নিয়ে যেতে পারেন কঙ্গোতে, আবার রেইডের আগেই ফিরতে পারবেন। আরেকটা জেট বিমান ভাড়া করা হয়েছে, ওটাতে করে সরিয়ে নেয়া হবে বাঙালি বিজ্ঞানীকে।'

'স্যাটালাইট ফোনে মাসুদ ভাইকে পেলাম না,' জানিয়ে দিল

রায়হান।

'লাইফবোটের রেডিওতে যোগাযোগ করেছ?' জানতে চাইল সোহেল।

'কেউ সাড়া দিল না।'

'যাহ্!' বলল স্বর্ণা।

'ঠিক আছে, আমরা এখন কেপ টাউনে সার্চ পার্টি নামিয়ে এলে কত সময় বাঁচবে?' জানতে চাইল সোহেল।

'বারো ঘণ্টা,' এক কথায় জানিয়ে দিল গগল।

'আরও কম হবে,' কমপিউটার স্ক্রিন থেকে মুখ তুলল না রায়হান। 'আমি এখন কেপ টাউন ও সাইটেশনের ফ্লাইটগুলো চেক করছি। কোনও বিমান নেই বললেই চলে।'

'তা হলে কোনও বিমান চার্টার করতে হবে,' বলল স্বর্ণা।

'এখন ওটাই তো দেখছি আমরা,' বলল ক্যাপ্টেন খোরশেদ নবী। 'কেপ টাউনে মাত্র একটা কোম্পানির জেট এয়ারক্রাফট আছে। একমিনিট। না, ওয়েব সাইটে বলছে তাদের দুই লিয়ারজেট আপাতত নষ্ট।' একবার সবাইকে দেখে নিল সে। 'আমাদের সবার অসুবিধার জন্য তারা দুঃখ প্রকাশ করেছে।'

'তার মানে আমরা বড়জোর আট ঘণ্টা বাঁচাতে পারব,' বলল রায়হান।

'তার ফলে বারো ঘণ্টা পিছিয়ে পড়ব, আর বাঙালি বিজ্ঞানীকে উদ্ধার করার ব্যাপারে কমপক্ষে এক দিন,' বলল সোহেল। 'ঠিক আছে, আমার মত হচ্ছে: আমরা এগিয়ে যাব।' রায়হানের জন্য বলল, 'রানাকে ধরার জন্য পাঁচ মিনিট পর পর ফোন দিতে থাকো। যোগাযোগ হলেই আমাকে জানাবে।'

'ঠিক আছে, সোহেল ভাই।'

সোহেল ভাবতে শুরু করেছে: কোনও বিপদে পড়ল রানা? ঘনিয়ে আসছে ডেভিল্‌স্ ওয়েসিসে ওদের আক্রমণের সময়, কিন্তু

এখন বন্ধ রানার স্যাটালাইট ফোন! ওর এক শ' একটা কারণ থাকতে পারে ফোন অফ করে রাখবার, কিন্তু কেমন যেন দমে গেল সোহেল।

ষোলো

বহু দূরে চেয়ে রয়েছে মাসুদ রানা। পুবাকাশে ঘন কালো মেঘরাশি, সেদিকে খেয়ালই নেই। যখন কার্টাকে নিয়ে ওয়ালভিস থেকে বেরিয়ে এল, খুবই ভাল ছিল আবহাওয়া, কিন্তু এখন গুরুগম্ভীর হয়ে উঠেছে আকাশের মুখ। পৃথিবীর এদিকের প্রকৃতি এমনই, যে-কোনও সময়ে পাল্টে যায় মেজাজ-মর্জি। হয়তো চারপাশ ফকফকা পরিষ্কার, তার দু'মিনিট পর শুরু হবে ভয়ঙ্কর বালিঝড়, ঢেকে ফেলবে চারদিক। এখন তেমনই ঘটছে বলে মনে হচ্ছে।

একবার হাতঘড়ি দেখে নিল রানা। একঘণ্টা পর অস্তে যাবে সূর্য। চার মিনিট আগে ক্যাপ্টেন হাসানের বিমান নামিবিয়ার রাজধানী উইণ্ডহওক থেকে নাইরোবির দিকে চলে গেছে। ক্যাপ্টেনের পরের গন্তব্য: লণ্ডন।

গতকাল রাতে ওয়ালভিস বে বন্দরের এক মাইল আগে ফিশিং বোট হিল্ডাকে ধরেছে রানা। কুবলিকি ও ক্যাপ্টেনকে বলেছে কীভাবে মারা পড়েছে জেলে দাদু এবেল। ওর অনুরোধ শেষে আপত্তি তোলেননি বোটের ক্যাপ্টেন, ঠিক হয়েছে তিনি উত্তর দিকের আরেক শহরে চলে যাবেন, ওখানে এক বা দুই

সপ্তাহের জন্য মাছ ধরে সময় কাটাবেন। কুবলিকিকে লাইফবোটে তুলে নিয়েছে রানা।

কেন পছন্দনীয় পরিস্থিতি নেই তাই বাচ্চাদের মত জেদাজেদি শুরু করেছিল ব্রিটিশ এগযেকিউটিভ, তর্ক জুড়ল কার্টা অস্টিনের সঙ্গেঃ বেয়াড়া মাসুদ রানা লোকটা, ডিবিয়ার্স, নামিবিয়া এবং সবকিছুই তার মনে ভীষণ তিক্ত অনুভূতি এনে দিয়েছে। পুরো বিশ মিনিট তার কথা শুনেছে রানা, ভেবেছে মাথা ঠাণ্ডা হবে লোকটার, তারপর যখন বুঝতে পেরেছে কমপক্ষে আরও একঘণ্টা বকবক করবে, বাধ্য হয়ে তাকে একটা হুমকিই দিয়েছেঃ হয় চুপ করতে হবে, নইলে পিটিয়ে তাকে অজ্ঞান করবে ও।

'আপনার অত সাহস হবে না!' চিৎকার করে বলেছে কুবলিকি।

'মিস্টার কুবলিকি, আমি চব্বিশ ঘণ্টা হলো ঘুমাই না,' লোকটার নাকের এক ইঞ্চি সামনে নিজের নাক নিয়ে গেছে রানা। 'নিরীহ বুড়ো একজন মানুষের বিকৃত লাশ দেখেছি, তাকে অত্যাচার করে মেরে ফেলা হয়েছে, কাজেই যারা এ কাজ করেছে তাদের দিকে কমপক্ষে পঞ্চাশটা গুলি ছুঁড়েছি। তার চেয়ে বড় কথা, আমার ভীষণ মাথা-ব্যথা শুরু হয়েছে। কাজেই খুব ভাল হয় আপনি ডেকের নীচে চলে গেলে, বসুন গিয়ে বেঞ্চ সিটে, এবং মুখটা বন্ধ রাখুন।'

'আপনি জানেন, আমাকে অর্ডার দিতে পারেন না? আমি...'

একেবারে শেষ মুহূর্তে ঘুষির গতি কমিয়েছে রানা, চুরমার করে দেয়নি কুবলিকির খাড়া নাকের হাড়, কিন্তু সে আঘাতেও যথেষ্ট জোর ছিল, হোঁচট খেয়ে পিছিয়ে হ্যাচ পেরিয়ে লাইফবোটের প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্টের মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়েছে সে। 'আগেই সাবধান করেছি,' বলেই অন্য দিকে মনোযোগ দিয়েছে রানা। লাইফবোটের মুখ সোজা করে নিয়েছে

হাওয়ার দিকে।

তীর থেকে কয়েক মাইল দূরে থেমেছে ওরা। ভোরে সারাদিন মাছ ধরবার জন্য ওয়ালভিস থেকে বেরিয়ে এসেছে অজস্র ফিশিং বোট। এরপর স্যাটালাইট ফোনে একটা ট্যাক্সি ও কুবলিকির যাত্রার ব্যবস্থা করেছে রানা। তখনও ডেকের নীচে গ্যাঁট মেরে বসে ছিল লোকটা। ফোলা চোয়ালের ব্যথা তো আছেই, তার চেয়ে ঢের বেশি কষ্ট পেয়েছে মনে।

রানা বন্দরে ঢুকে বার্থে লাইফবোট রাখবার সময় বোটেই থাকতে বলেছে কার্টা ও কুবুলিকিকে, গ্লক পিস্তলটাও রেখে দিয়েছে বিলজের গোপন চেম্বারে। ওদের দুজনের পাসপোর্টে আগেই সিল দেয়া আছে, তবু তীরে নেমে তিনটেই দিল রানা কাস্টমস অফিসারকে। দুটো আগেই সিল দেওয়া দেখে দূর থেকে লাইফবোটের দিকে একবার তাকিয়েই সন্তুষ্ট হয়েছে লোকটা, সিল দিয়ে দিয়েছে রানার পাসপোর্টে।

বোট রি-ফিউয়েল করবার জন্য অ্যাটেণ্ড্যান্টকে মোটা টাকা বকশিশ দিয়েছে রানা, নিশ্চিত হয়েছে ঠিক ভাবেই তেল ভরা হচ্ছে।

পৌঁছে গেছে ট্যাক্সি, ওদের জন্য অপেক্ষা করছে তীরে। বোট ছেড়ে নামার আগে গ্লকটা আবার বের করে বেল্টের নীচে গুঁজে নিয়েছে রানা। গাড়ির পিছন সিটে বসেছে কার্টা ও কুবলিকি, রানা বসল প্যাসেঞ্জার সিটে। সোয়াকোপ নদী পেরিয়ে ঢুকে পড়েছে ওরা সোয়াকোপমুণ্ড শহরে, তারপর সোজা ধরল এয়ারপোর্টের রাস্তা।

গতরাতের লোক দু'জনের একজন ছিল কপ্টার পাইলট, কাজেই কুবলিকিকে দেশ থেকে বিদায় করতে কোনও প্রাইভেট এয়ারক্রাফট ভাড়া করবার ঝুঁকি নেয়নি রানা। সপ্তাহে চারবার উপকূলীয় শহর সোয়াকোপমুণ্ড থেকে রাজধানীতে যাওয়ার জন্য

এয়ার নামিবিয়ার বিমান সার্ভিস চালু আছে, আজ সেই চারদিনের একদিন। সঠিক সময় বুঝে হাজির হয়েছে রানা, যাতে মাত্র কয়েক মিনিট এয়ারপোর্টে থাকতে হয় কুবলিকিকে, কারও চোখে পড়ে যাবার আগেই উঠতে পারে বিমানে। রাজধানীতে নেমেই পাবে কেনিয়ার ফ্লাইট।

এয়ারপোর্টে রানা খেয়াল করল, একটা দুই ইঞ্জিনের বিমান টারমাকে অন্যগুলো থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর বুঝতে দেরি হলো না ওটাই ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসানের জাম্প প্লেন। ওটাতে করেই মিশনে যাবে ওরা। আগেই ভাড়া করা হয়েছে একটা গাল্‌ফস্ট্রিম ফোর। রানা একবার ভেবেছিল ওই বিমানে করেই নামিবিয়া থেকে কুবলিকিকে সরিয়ে নেবে, পরে ভেবেছে ওর হাতে অত সময় নেই, তার চেয়ে বড় কথা: ওই বস্তা পচা মালকে বেশিক্ষণ সহ্য করবে কে!

ওরা একইসঙ্গে ঢুকেছে ছোট্ট টার্মিনালে। চারপাশে নজর রেখেছে রানা, কিন্তু কোথাও অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েনি। শত্রুরা নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছে কার্টা ও কুবলিকি মারা পড়েছে।

কয়েক মিনিট পর ফ্লাইটের জন্য ইংরেজ এগযেকিউটিভকে ডেকে নিল কর্তৃপক্ষ। তার আগে লোকটাকে কথা দিয়েছে কার্টা, রানার সঙ্গে তদন্ত শেষে হোটেল থেকে কুবলিকির ব্যাগ-ব্যাগেজ সংগ্রহ করবে, সব পৌঁছে দেবে লণ্ডনে।

জবাবে অস্পষ্ট সুরে কী যেন বলেছে লোকটা।

যুক্তির বাইরে চলে গেছে সে, এবং সেজন্য তাকে পুরো দোষ দিতে পারছে না কার্টা। সিকিউরিটি এলাকার ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় একবারও পিছন ফিরে চাইল না কুবলিকি।

'খুবই হাসি-খুশি মানুষ,' কার্টাকে নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসার সময় বলল রানা। একটা ট্যাক্সি ডেকে রওনা হলো। আগেই ঠিক ছিল, একবার স্থানীয় গাইড ব্র্যাডলি এন

লাজরাসের এলাকা টুয়ামানাগুলাকাতে ঢুঁ দেবে ওরা।

টুয়ামানাগুলাকার বাড়িগুলো বেশির ভাগই দোতলা, শহরের জার্মান ঐতিহ্য ও সচ্ছলতার ছোঁয়া এদিকটায় মোটেই নেই। দরিদ্রদের এলাকা, প্রায় সাদা হয়ে যাওয়া পেভমেন্টে ছোট-বড় অসংখ্য খানা-খন্দ। বহু মানুষ কাজে যায়নি চাকরি নেই বলে, অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের সামনে বসে আছে বা হাঁটাহাঁটি করছে। চাঁদের মত ফরসা কার্টাকে দেখে সন্দেহ নিয়ে চাইল বাচ্চারা। বাতাসে ভাসছে প্রায় শুকিয়ে আসা মাছের আঁশটে ঘ্রাণ, চারপাশে নামিব মরুভূমি থেকে উড়ে আসা বালি-কণা।

'আমি ঠিক বলতে পারব না কোন্ বাড়িতে থাকত সে,' অপরাধীর মত করে বলল কার্টা। 'আমরা তাকে একটা বারের সামনে নামিয়ে দিতাম।'

'আপনারা কাকে চাইছেন?' জানতে চাইল ক্যাবের ড্রাইভার।

'নিজের নাম বলত ব্র্যাডলি এন লাজরাস। টুরিস্টদের গাইড ছিল।'

একটা কথাও বলল না ড্রাইভার, একটু পর থামল প্রাচীন এক বাড়ির সামনে। দেয়ালে বড় একটা গর্ত দেখা গেল, ওখান থেকে খদ্দেরদের খাবার সরবরাহ করা হয়। পাশে পুরনো পোশাকের ছোট একটা দোকান। দ্বিতীয়তলা ভাড়া দেয়া হয়েছে অ্যাপার্টমেন্ট হিসাবে। কিছুক্ষণ পর ঝড়ো দাঁড়-কাকের মত উস্কোখুস্কো এক লোক বেরিয়ে এল রেস্তোরাঁ থেকে। ক্যাবের ভিতর টুরিস্ট দেখে এগিয়ে এসে ড্রাইভারের জানালার পাশে থামল। দুই নামিবিয়ান সংক্ষেপে কথা বলল, লোকটা আঙুল তুলে সামনের রাস্তা দেখিয়ে দিল।

'এ বলছে দুই ব্লক গেলে পড়বে লাজরাসের অ্যাপার্টমেন্ট।'

এক মিনিট পর আরেক বাড়ির সামনে থামল ট্যাক্সি। এই বাড়ি অন্য সব বাড়ির চেয়ে অনেক প্রাচীন। দুই পাশে আটকানো

ক্ল্যাপবোর্ড, বয়সের ধাক্কায় সাদা। বাড়ির একমাত্র দরজার দুটো কবজা নেই, ঝুঁকে এসেছে কবাট। রোগা এক ঘেয়ো কুকুর বাড়ির কোনায় প্রস্রাব করছে, কাজ শেষে আকাশে উঠে গেল তার লেজ, প্রাণপণে ছুটল এক ইঁদুরের পিছনে। লাফ দিয়ে আবারও বাড়ির ফাটলে ঢুকে গেল ইঁদুর। বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে এল বাচ্চার জোরালো কান্না, হার মানবে পুলিশের সাইরেন।

ট্যাক্সির দরজা খুলে ফুটপাথে নামল রানা। উল্টো দিক দিয়ে বেরুল না কার্টা, পিছলে রানার দিক দিয়েই নেমে এল। পরিষ্কার বোঝা গেল কিছুতেই রানার কাছ থেকে সরবে না।

'তুমি এখানে অপেক্ষা করবে,' ক্যাবের ড্রাইভারকে বলল রানা। মানিব্যাগ থেকে বের করল এক শ' ডলারের নোট।

ওটা পকেটে রেখে চওড়া হাসল লোকটা। 'ঠিক আছে।'

'আমরা কী করে বুঝব ওর অ্যাপার্টমেন্ট কোনটা?' জানতে চাইল কার্টা।

'চিন্তা কোরো না, বড় কোনও ভুল না হলে আমরা বুঝব,' বলল গম্ভীর রানা।

ওর সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে ঢুকে পড়ল কার্টা। চারপাশে আবছা আলো, ভিতরে কোনও বাতি জ্বলছে না। গনগনে আগুনে যেন পুড়ছে গোটা বাড়ি। নানা ধরনের বাজে গন্ধে নাক কুঁচকে ফেলল কার্টা। দারিদ্র্যের নিজস্ব একটা গন্ধ আছে, সেটা পাওয়া যায় গরিবদের এসব বাড়িতে। দোতলায় চারটে ফ্ল্যাট, তার একটা থেকে বাজছে পুলিশের সেই সাইরেন। প্রতিটা দরজার সামনে থামল রানা, চট্ করে দেখে নিল সস্তা তালা। মন্তব্য করল না কোনও, সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় উঠতে শুরু করল।

ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছে যা-ভয় করেছিল তার আলামত দেখতে পেল। বোঁ-বোঁ করে উড়ছে অসংখ্য মাছির মত পোকা। বুল ফাইটারের কাপড়ের মত, উঠছে-নামছে, সরে যাচ্ছে একপাশে।

সেই সঙ্গে কানে আসছে ওদের সম্মিলিত গুঞ্জন। এক সেকেণ্ড পর নাকে এল চাপা একটা দুর্গন্ধ। ভয়ঙ্কর। সেটা এমনই, আগে কখনও না শুঁকলেও যে-কেউ বুঝবে কীসের গন্ধ।

রানার নাক ওকে নিয়ে গেল পিছনের একটা অ্যাপার্টমেন্টের দরজার সামনে। দরজা ঠিক ভাবেই বন্ধ, মনে হলো না তালার উপর জোরাজুরি করা হয়েছে। 'খুনিকে ঢুকতে দিয়েছে লাজরাস। তার মানে, তাকে চিনত সে।'

'কপ্টার পাইলট?'

'বোধহয়।'

দরজার উপর কষে লাথি দিল রানা। হ্যাণ্ডেলের চারপাশের কাঠ আগেই দুর্বল ছিল, ঝটাং করে খুলে গেল কবাট। রেগে গিয়ে ভন-ভন আওয়াজে উড়তে শুরু করেছে মাছিগুলো। ঘরের ভিতর এমনই ভয়াবহ দুর্গন্ধ, শ্বাস আটকে ফেলল রানা ও কার্টা।

রানা ভেবেছিল মেয়েটা ছিটকে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু তা করল না।

একমাত্র জানালার সামনে ঝুলছে ছেঁড়া একটা পর্দা, ওখান থেকে আবছা আলো এসে পড়েছে ঘরে। আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। একটা চেয়ার, টেবিল, সিঙ্গেল খাট, পাশেই বেডসাইড টেবিল হিসাবে একটা প্যাকিং ক্রেট। ওটার উপর অ্যাশট্রের বদলে একটা গাড়ির হাবক্যাপ, তাতে উঁচু হয়ে আছে পোড়া সিগারেটের শেষাংশ। কমপক্ষে ত্রিশ বছর আগে সাদা রং করা হয়েছিল দেয়ালে। পরবর্তী সময়ে সবই বাদামি হয়ে গেছে প্রচুর ধোঁয়ায়। এখানে ওখানে কালচে দাগ, নানা ধরনের পোকা চেপ্টে মারা হয়েছে দেয়ালে।

অগোছালো বিছানার উপর শুয়ে আছে ব্র্যাডলি এন লাজরাস, পরনে একটা পুরনো বক্সার হাফপ্যাণ্ট। পায়ে এখনও বুট। বুকের উপর থকথক করছে কালচে রক্ত।

মনোযোগ দিয়ে ক্ষতটা দেখল রানা। 'ছোট ক্যালিবারের বুলেট। টু-টু বা টু-ফাইভ, খুব কাছ থেকে গুলি করেছে। গান পাউডার পোড়ার দাগ দেখছি।' দরজা থেকে শুরু করে খাট পর্যন্ত দেখল রানা। রক্তের দাগ ফোঁটায় ফোঁটায় দরজা থেকে বিছানা পর্যন্ত এসেছে। 'খুনি টোকা দিয়েছে, লাজরাস দরজা খুলতেই গুলি করেছে। ধাক্কা দিয়ে পিছিয়ে গাইডকে ফেলেছে বিছানার উপর। ফলে আছড়ে পড়বার কোনও আওয়াজ হয়নি।'

'তোমার কি মনে হয়, আওয়াজ শুনলে এ বাড়ির কেউ দেখতে আসত?'

'বোধহয় আসত না। খুনি খুব সতর্ক ছিল। যদি গতকাল স্কি বোট খুঁজতাম, একটা সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তল পেতাম।'

ঘরে এমন কিছু থাকতে পারে যা থেকে বোঝা যাবে কে বা কারা খুন করেছে, কাজেই অ্যাপার্টমেন্টের প্রতিটি কোনা খুঁজে দেখল রানা। কিচেন-বেসিনের নীচে পেল কয়েক পুরিয়া গাঁজা, তোষকের নীচে দুটো পর্নো ম্যাগাযিন— আর কিছুই নেই। কয়েকটা খাবারের বাক্সের ভিতর অস্বাভাবিক কিছু মিলল না। অসংখ্য সিগারেটের টুকরো ও স্টাইরোফোম কফি কাপ ছাড়া ট্র্যাশক্যান খালি। খাটের পাশে মেঝেতে পড়ে আছে পোশাক, পকেট হাতড়ে দেখল রানা। পাওয়া গেল খালি একটা মানিব্যাগ, পকেটে কয়েকটা স্থানীয় কয়েন ও একটা পকেট নাইফ। এক দেয়ালের পেরেক থেকে ঝুলছে দুটো পোশাক, পকেটে কিছু নেই। রানা খুলতে চাইল জানালার কবাট, কিন্তু পুরু রঙে আটকা পড়েছে বলে ওটা উপরে তোলা গেল না।

'এটা বোঝা গেল লোকটা মারা গেছে,' দরজার দিকে রওনা হয়ে গম্ভীর স্বরে বলল রানা। কার্টা বেরিয়ে আসতেই দরজা পিছনে বন্ধ করে দিল। একবার সন্দেহ হওয়ায় কমোন টয়লেটে ঢুকে চারপাশটা দেখে নিল। ভিতরে কিছু নেই।

'এবার কী করতে চাও?' জানতে চাইল কার্টা।

'একবার কপ্টারের পাইলটের অফিসে ঢুঁ দিতে পারি,' নীরস স্বরে বলল রানা। ওর মন বলছে, ওখানে গিয়ে কোনও লাভ হবে না, কিছুই পাওয়া যাবে না।

'আমি চাই হোটেলে ফিরতে, জীবনের দীর্ঘতম শাওয়ার নেব, তারপর কমপক্ষে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ঘুমিয়ে পড়ব,' বলল কার্টা।

সিঁড়ির সবচেয়ে উপরের ধাপে থেমেছে রানা, তখনই দেখতে পেল সামনের দিকের নীচের দরজা থেকে আবছা আলো এল। এইমাত্র বাড়ির ভিতর ঢুকেছে কেউ। বামহাতে আস্তে করে কার্টাকে এক পা পিছিয়ে দিল রানা, কোমর থেকে বের করে ফেলল গ্লক পিস্তল।

এত গাধা হলাম কবে, ভাবছে। ওরা আগেই বুঝতে *পেরেছে ফিশিং বোটের উপর হামলা সফল হয়নি, ফেরেনি ইয়ট। তারপর দাদু এবেলকে খুন করতে গিয়েও ফিরল না স্কি বোট। যে তদন্ত করতে আসবে, সে অবশ্যই দেখতে আসবে ব্র্যাডলি এন লাজরাসের অ্যাপার্টমেন্ট। কাজেই নজর রেখেছে তারা।*

কয়েক সেকেণ্ড পর দু'জন লোককে দেখতে পেল রানা। তাদের হাতে ভয়ঙ্কর-দর্শন জার্মান মেশিন পিস্তল। তারপর দেখা গেল তৃতীয়জনকে, এর সঙ্গে চেকোস্লোভাকিয়ার স্করপিয়ন। প্রথম লোকটাকে ফেলে দিতে পারবে, বুঝতে পারছে রানা, কিন্তু অন্য দু'জন গুলি শুরু করলেই সিঁড়ি হয়ে উঠবে কসাইখানা।

নিঃশব্দে পিছিয়ে এল রানা, বামহাতে ধরেছে কার্টার হাত। মেয়েটা কী করে যেন বুঝে ফেলেছে মস্ত কোনও বিপদ সামনে। কোনও কথা বলছে না, রানার পাশে সাধ্যমত নিঃশব্দে পা ফেলছে।

এই বাড়ির হলওয়ে একটা বাক্সের মত জায়গা। আর পাঁচ সেকেণ্ড অপেক্ষা করলে ওদেরকে বদ্ধ জায়গায় বন্দি অবস্থায়

পেত লোকগুলো। ঘুরেই আবারও লাজরাসের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে পা বাড়াল রানা। এখন আর নিঃশব্দে চলবার মানেই হয় না, এক দৌড়ে দরজার সামনে পৌঁছে গেল, কবাট খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে। 'ভাবিনি এ পথে বেরোতে হবে,' বলল। 'আমার পিছু নাও।'

সোজা জানালার দিকে ছুটতে শুরু করেছে রানা। তিন সেকেণ্ড পর হাত দুটো সামনে রেখে সরাসরি ডাইভ দিল পুরু কাঁচের উপর। ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল জানালা, মনে হলো বিস্ফোরিত হয়েছে শক্তিশালী বোমা। ড্যাগারের মত তীক্ষ্ণ কাঁচগুলো ফালি করে দিল রানার পোশাক। লাজরাসের অ্যাপার্টমেন্টের বাইরেই করাগেটেড ধাতব ছাউনির ছাত, জানালা খুলবার চেষ্টা করবার সময় ভাল করেই দেখেছে রানা। ধাতুর ছাতের উপর ধুপ্ করে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও, সঙ্গে সঙ্গে ছড়ে গেল বাম হাতের তালু। আরেকটু হলে ডানহাত থেকে খসে যেত পিস্তলটা। লোহার ছাত আগুনের মত গরম, পুড়তে শুরু করেছে গা-হাত-পা। কয়েকবার গড়িয়ে থামল রানা, আরও দুই গড়ান দিয়ে নেমে যেতে চাইল কিনারা দিয়ে। পা দুটো তুলে ফেলেছে আকাশে, তারপর একটা বলের মত গোল হয়ে পিঠ দিয়ে পড়তে শুরু করল। ওর নেমে পড়া দেখে কেউ বলবে না ও অলিম্পিকের মেডেল পাবে, কিন্তু আছড়েও পড়ল না, নিজের পায়ের উপর ভর রেখেই দাঁড়িয়ে যেতে পারল। ছাত থেকে ঝরঝর করে নেমে এল অসংখ্য কাঁচের ছোরা।

ছাতের নীচে ছায়ায় আরাম করে বসে জাল মেরামত করছে এক বুড়ো জেলে, তার দিকে কোনও মনোযোগই দিল না রানা। এক সেকেণ্ড পর শুনতে পেল ধুপ আওয়াজ তুলে নামল কার্টা ছাউনির ছাতে। কিনারা থেকে গড়িয়ে নীচে পড়তে শুরু করেছে মেয়েটি। তৈরি ছিল রানা, ঠিক ভাবেই বুকের উপর নিতে পারল।

কিন্তু ওজনের কারণে দুই হাঁটু মুড়ে বসে পড়তে হলো ওকে।

একই সময়ে ধাতুর ছাতের উপর বেশ কয়েকটা ফুটো তৈরি হলো। মেশিন পিস্তলের গুলিতে খান-খান হলো চারপাশের নীরবতা। ছিটকে গেল লোকজন, যে যার জান নিয়ে পালাতে শুরু করেছে। এক ডজন গুলি ঢুকেছে বিশাল জালের ভিতর, ছিটকে উপরে উঠল জেলের গাঁজার প্যাকেট। ছাতের অনেক পিছনে রয়েছে জেলে, তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করল না রানা। খপ্ করে সঙ্গিনীর হাত ধরেই বাম দিকে ছুটতে শুরু করল। ওর ধারণা, ওদিকের সড়কে লোকজন বেশি।

ওদের চারপাশের মাটিতে বিঁধছে একের পর এক বুলেট। কাছাকাছি টার্গেটের জন্য তৈরি করা হয়েছে স্করপিয়ন, ওটার মালিক অতি উত্তেজনার বশে ভুলে গেছে খুঁতওয়ালা অস্ত্র দিয়ে কাউকে গাঁথতে পারবে না। এক ছুটে দশ চাকার একটা ট্রাকের আড়ালে চলে গেল রানা ও কার্টা।

'ঠিক আছ তো?' জানতে চাইল রানা।

'এখনও। এ দেশে আসার পর থেকে শুয়োরের মত খেয়েছি, এখন খারাপ লাগছে, ছুটতে গিয়ে হাঁপিয়ে যাচ্ছি।'

ম্যান ট্রাকের আড়াল থেকে চট্ করে উঁকি দিল রানা। ছাউনির ছাত থেকে নামতে চাইছে এক সশস্ত্র নামিবিয়ান। লাজরাসের জানালা থেকে তাকে কাভার দিচ্ছে পিছনের লোক দু'জন। রানাকে দেখে ফেলল তারা, এক পশলা গুলি এসে লাগল ট্রাকের পাশে। কার্টাকে নিয়ে এক দৌড়ে ক্যাবের পাশে চলে গেল রানা। পিছনের দীর্ঘ কার্গো বক্স আড়াল দিয়েছে ওদেরকে। সামনের চাকা থেকে শুরু হয়েছে লম্বা হুড, ওটার সাহায্য নিয়ে ক্যাবের ভিতর ঢুকে পড়ল রানা। পিস্তল হাতে কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে সাবধানে লক্ষ্য স্থির করল ছাউনির উপর দাঁড়ানো লোকটার দিকে। দুই পক্ষের মাঝে মাত্র পঁচিশ গজ দূরত্ব, তাই এলিভেশন

একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে হলো। সোজা গিয়ে গুলি বিঁধল লোকটার ডান বাহুতে, খাবলে তুলে নিল অনেকটা মাংস। হাত থেকে ছিটকে গেল স্করপিয়ন, বাম হাতে ক্ষতটা চেপে ধরল সে। চমকে যাওয়ায় সড়াৎ করে পিছলে গেল পা, কিনারা পেরিয়ে নীচে পড়বার আগে একহাতে করাগেটেড শিট ধরতে চাইল। ভারসাম্য রাখতে পারল না, ছেঁড়া পুতুলের মত এসে নামল মাটির উপর। দূর থেকেও শোনা গেল হাড় ভাঙবার মড়াৎ শব্দ।

তেতলার দুই গানম্যান বুঝবার আগেই জানালা থেকে সরে গেল রানা।

'এবার কী?' বিস্ফারিত চোখে রানার দিকে চাইল কার্টা।

'ওদের একজন জানালা থেকে নজর রাখবে, আমরা পালাতে চাইলেই গুলি করবে। অন্যজন নেমে আসবে সিঁড়ি বেয়ে।' ক্যাব থেকে নেমে চারপাশ দেখে নিল রানা।

শহরের এ অংশ মোটেই ব্যস্ত নয়, তার উপর এখন গোলাগুলি শুরু হওয়ায় একদম ফাঁকা হয়ে গেছে রাস্তা। মনে হলো এটা কোনও পরিত্যক্ত এলাকা। নর্দমা দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে আবর্জনা। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই।

ট্রাকের প্যাসেঞ্জার দরজা খুলে আবারও ক্যাবে উঠল রানা। না, ইগনিশনে চাবি নেই। কয়েক মিনিট ব্যয় করলে ইঞ্জিন চালু করতে পারবে, কিন্তু ওকে সে সময় দেয়া হবে এমন না-ও হতে পারে। আরেকবার অ্যাপার্টমেন্ট দেখে নিল রানা। জানালা থেকে সরে গেছে লোক দু'জন। মনে হয় পাল্টা গুলি আসতেই চমকে গেছে তারা।

চারদিকে চোখ বুলাল রানা।

পাশের দালান একসময় গ্রোসারি স্টোর ছিল, এখন জানালাগুলো আটকে দেয়া হয়েছে প্লাইউডের শিট দিয়ে। এক ব্লক দূরে একটা পার্ক। ওখানে ঘাস নেই, শুধু খড়খড়ে মাটি।

আরেক পাশে একের পর এক অ্যাপার্টমেণ্ট ভবন। মাঝে কখনও ছোট ছোট বাড়ি, দেখলে মনে হয় একটা আরেকটার উপর হেলে পড়ছে।

নেমে এসে ট্রাকের ফিউয়েল ট্যাঙ্কের উপর টোকা দিল রানা। ভিতর থেকে ফাঁপা আওয়াজ হলো। তবে বোঝা গেল, একেবারে খালি নয়। প্যাঁচ খুলে ফিলার ক্যাপ তুলে ফেলল রানা। প্রচণ্ড গরমের কারণে ট্যাঙ্কের ভিতর থেকে ধোঁয়ার মত উঠছে ডিজেলের বাষ্প।

টুকটাক কিছু জিনিস সবসময় সঙ্গে রাখে রানা, সেগুলোর ভিতর রয়েছে ছোট একটা কমপাস, পকেট নাইফ, যেনন বালবওয়ালা খুদে ফ্ল্যাশলাইট ও একটা লাইটার। ছুরিটা বের করল রানা, শার্টের নীচের দিক থেকে এক ফালি কাপড় কেটে নিল, ওটা সলতের মত পাকিয়ে নিয়ে লাইটার দিয়ে জ্বালল। কার্টাকে ট্রাকের সামনের দিকে যেতে ইশারা করল, তারপর জ্বলন্ত কাপড় ফেলে দিল ট্যাঙ্কের ভিতর।

এক দৌড়ে কার্টার পাশে চলে গেল রানা, দ্রুত বলল, 'বাম্পারের উপর ওঠো, সোজা হয়ে দাঁড়াতে যেয়ো না, মুখ খোলা রাখবে।' নিজেও উঠে পড়েছে বাম্পারের উপর। ইশারা করে জানিয়ে দিল দুই হাতে কান চেপে রাখতে হবে।

ট্যাঙ্ক যদি পুরো ভরা থাকত, প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চুরমার হয়ে যেত গোটা ট্রাক, খুঁজে পাওয়া যেত না রানা ও কার্টাকে। কিন্তু তলানিতে আছে ডিজেল, তার ভিতর কাপড়টা পড়তেই বিস্ফোরণ হলো। যা ভেবেছে তার চেয়ে অনেক বেশি ঝাঁকি খেল রানা। ওরা আছে ক্যাবের আড়ালে, সামনে গোটা ইঞ্জিন, তারপরও ওদের মনে হলো জ্বলে পুড়ে গেল দেহ। ভীষণ দুলে উঠল ট্রাক, যেন কামানের গোলা এসে লেগেছে। প্রচণ্ড আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল।

বাম্পার থেকে লাফ দিয়ে নামল রানা, চট্ করে একবার দেখে নিল পিছন দিক। যা আশা করেছে তাই দেখতে পেল। বিস্ফোরণের কারণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে গ্রোসারি স্টোরের প্লাইউড। বন্ধ সুপারমার্কেটের জানালাগুলো ঝনঝন করে ভেঙে পড়েছে। 'এসো!' তাড়া দিল রানা।

হাতে হাত রেখে ঝেড়ে দৌড় দিল ওরা, ঢুকে পড়ল প্রায় অন্ধকার গ্রোসারি স্টোরের ভিতর। একবার পিছনে চাইল রানা, পুড়তে শুরু করেছে ট্রাক। দোকানের পিছন-দেয়ালে একটা দরজা দেখে ওদিকে ছুটল ওরা। দরজা খুলতেই দেখা গেল স্টোরেজ এরিয়া ও লোডিং ডক। ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে বাইরের দরজা খুঁজে বের করল রানা। বুঝতে পারছে আততায়ীরা বুঝে নেবে ওরা এদিকে এসেছে। এখন লুকানোর সময় নেই, এক গুলিতে উড়িয়ে দিল দরজার শিকল। জিনিসটা কংক্রিট মেঝের উপর ঠনাৎ করে পড়ল। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল রানা।

গ্রোসারি স্টোর পেরুলে রাস্তা, ওপাশে চিকচিক করছে সুনীল সাগর। একটু দূরে ভাঙাচোরা ডক, সেখানে অনেকগুলো প্রাচীন চেহারার বোটের সঙ্গে বাঁধা আছে রানার লাইফবোট। এক দৌড়ে রাস্তা পেরুল রানা ও কার্টা, অসংখ্য জেটির ভিড়ে ঢুকে পড়ল, দৌড়াচ্ছে এঁকেবেঁকে। পিছনে গ্রোসারি দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে আততায়ীদের একজন, ওদের দেখতে পেয়েই তাড়া করে এল।

নৌকা মেরামত করছিল জেলেরা, তাদের ছেলেরা ডকের উপর বিছিয়ে দিচ্ছে জাল, কিন্তু বিস্ফোরণের আওয়াজে সবার চোখ চলে গেছে গ্রোসারি দোকানের দিকে। ওদিক থেকে ধোঁয়া উঠছে। এক ছুটে তাদের পাশ কাটাল রানা ও কার্টা। কাদা ও মাছের আঁশে পিচ্ছিল কাঠের ডকে ওদের দৌড়ের গতি কমল না।

করাতের তীক্ষ্ণ, কর্কশ আওয়াজ শুরু হলো, স্করপিয়নের

সমস্ত গুলি খরচ করছে আততায়ী। ডাইভ দিয়ে ডকের উপর পড়ল রানা ও কার্টা, কাঠের ডকে পড়ে পিছলে এগিয়ে গেল কয়েক ফুট। ডক থেকে খসে পড়ে গেল ছোট এক নৌকার ভিতর। ট্র্যানসমের পিছনে দেখা গেল আউটবোর্ড মোটর। এক সেকেণ্ড পর কুঁজো হয়ে দাঁড়াল রানা, কাছেই ডকের কাঠ ফাটতে শুরু করেছে।

'কার্টা, ইঞ্জিন চালু করো!'

জেটির আড়াল থেকে উঁকি দিল রানা। খুনি লোকটা আছে মাত্র পনেরো গজ দূরে, কিন্তু আউটবোর্ড ইঞ্জিনওয়ালা নৌকার কাছে আসতে হলে তাকে অনেকগুলো জেটি ডিঙিয়ে অন্তত পঞ্চাশ গজ পেরুতে হবে। পিয়ারগুলো অদ্ভুত ভাবে তৈরি করা হয়েছে। রানার মাথা দেখতে পেয়েই গুলি করতে চাইল লোকটা, কিন্তু খালি হয়ে গেছে মেশিন পিস্তলের ম্যাগাযিন।

গায়ের জোরে স্টার্টার কর্ড ধরে টান দিল কার্টা, মস্ত একটা শ্বাস ফেলল। প্রথমবারেই গর্জে উঠেছে ইঞ্জিন। ছুরির এক পোঁচে দড়িটা কেটে দিল রানা। সামনের দিকে থ্রটল ঠেলে দিল কার্টা। ডক থেকে বেরিয়ে লাইফবোটের দিকে ছুটতে শুরু করেছে নৌকা। আততায়ী বোধহয় বুঝতে পেরেছে হাতছাড়া হয়ে গেছে শিকার, সে নিজেও খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে, যে-কোনও সময়ে গুলি খেতে পারে। নামিবিয়ায় পুলিশ ফোর্স নেই এ কথা কেউ বলবে না, গত কয়েক মিনিটের গোলাগুলিতে ওয়ালভিস ও সোয়াকোপমুণ্ডের যেখানে যত পুলিশ আছে, সবাই ওই আওয়াজ পেয়েছে। আগামী কয়েক মিনিটের ভিতর বন্দরে এসে হাজির হবে তারা। আততায়ী কোনও প্রমাণ রাখতে চাইল না, অস্ত্রটা ছুঁড়ে ফেলে দিল পানিতে। ঘুরে দাঁড়িয়েই এক দৌড়ে গিয়ে ঢুকল গ্রোসারি স্টোরে।

কয়েক মুহূর্ত পর লাইফবোটের পেটে ভিড়ল ছোট্ট নৌকা। দু'

হাতে দুই জলযান ধরে রাখল রানা, সেই সুযোগে লাইফবোটে উঠে গেল কার্টা। ওর পর পর উঠে এল রানা, হাত বাড়িয়ে নৌকার থ্রটল খুলে দিল। লাইফবোটে হালকা একটা গুঁতো দিয়ে আরেক দিকে রওনা হলো ডিঙি।

দ্রুত হাতে লাইফবোটের দড়ি খুলল রানা, আগে কখনও এত তাড়াহুড়ো করে এই কাজ করতে হয়নি। তিন মিনিট পেরুনোর আগেই বন্দরের বাইরের দিকের বয়া পিছনে পড়ল, বেরিয়ে এল ওরা খোলা সাগরে। রানার একমাত্র চিন্তা এখন হার্বার প্যাট্রল আসবার আগেই আন্তর্জাতিক জলসীমায় পৌঁছানো। কর্তৃপক্ষ পিছু নিলেও যে খুব অসুবিধা হবে তা নয়, একবার হাইড্রোফয়েল চালু করলে পাখির মত ছুটতে শুরু করবে লাইফবোট।

'তোমার কী অবস্থা?' বোট সোজা করে নিয়ে জানতে চাইল রানা।

'কান ঝনঝন করছে,' বলল কার্টা। 'যা দেখালে... আগে কখনও এমন পাগলামি দেখিনি। একেবারে বদ্ধ পাগল!'

'সুন্দরী মেয়েদের সাহায্য করতে যাওয়াই তা হলে পাগলামি,' হাসল রানা। 'তাই তো বলতে চাও?'

হেসে ফেলল কার্টাও। 'এবার বলবে তুমি আসলে কে?'

'এসো একটা চুক্তি করি। দাদু এবেলের ওই এলাকা খুঁজে দেখব, বুঝব ওখানে কী ঘটছে, তারপর খুলে বলব আমার জীবনের বিস্তারিত কাহিনি— জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।'

'ঠাট্টা করছ?'

'উঁহুঁ। ভয় পেয়ো না। আগাগোড়া বলতে সময় এক মিনিটও লাগবে না।'

'তা হলে বলেই ফেলো না!'

'বেশ। আসলে আমি ফ্রেইটার মার্ভেলের ক্যাপ্টেন।'

'ব্যস? আর কোনও পরিচয় নেই?'

'আছে। আমার আসল পরিচয়: আমি একজন বাঙালী।'

রানার দিকে তিরিশ সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল কার্টা। কী বুঝল সে-ই জানে, তবে আর কোনও প্রশ্ন করল না।

বোটের জিপিএস অনুযায়ী বেশিক্ষণ লাগল না নামিবিয়ার বারো মাইল জলসীমা পেরুতে। ইঞ্জিনের গতি কমাল রানা, গুটিয়ে নিল হাইড্রোফয়েলের ডানা।

'এই ডানাওয়ালা বুড়ির উপর ভর করলে রাক্ষসীর মত তেল গেলে,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'গন্তব্যে পৌঁছে আবারও ফিরতে হলে পনেরো নট গতি তুলে যেতে হবে। পাহারা দেয়ার প্রথম পালা আমি নিলাম। শাওয়ার করার মত পানি দিতে পারব না, তবে চাইলে হাত-মুখ ধুতে পারো। নীচে গিয়ে কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো। ছয় ঘণ্টা পর তোমাকে তুলে দেব।'

ঠোঁট দিয়ে রানার গাল স্পর্শ করল কার্টা, নরম স্বরে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, রানা। সবকিছুর জন্য।'

বারো ঘণ্টা পর দাদু এবেলের সেই সাগরে চলে এল রানার লাইফবোট। এখানেই দেখা দিয়েছে ধাতব সাপ। ঝোড়ো বেগে বইছে হাওয়া, মরুভূমি থেকে এসে জলকণা শুষে শীতল হচ্ছে। সাগরে প্রচণ্ড ঝড় উঠতে পারে, কিন্তু এই লাইফবোট ডুববে না, জানে রানা। অন্য কারণে বিরক্ত হয়ে উঠছে। বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না। একটু পর ঘুটঘুটে আঁধার নামবে। শুধু তা-ই নয়, পরিবেশে খেলছে স্ট্যাটিক বিদ্যুৎ, একহাত নিচ্ছে লাইফবোটের ইলেকট্রনিক্সের উপর। স্যাটালাইট ফোনের টোন, বা রেডিওর কোনও ব্যাণ্ডে স্ট্যাটিক ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই। শেষবার যখন পরীক্ষা করেছে, জিপিএস থেকে যথেষ্ট সিগনাল আসেনি। নিশ্চিত হওয়া যায়নি অরবিটের স্যাটালাইটগুলো ঠিক তথ্য দিচ্ছে। ডেপ্‌থ্ মিটার দেখিয়েছে শূন্য ফুট। অথচ সাগরের উপর

দিয়ে ছুটে চলেছে বোট। খেপে উঠেছে কমপাস, পাগলের মত ঘুরছে কাঁটা, ওটার ভাব দেখে মনে হয়েছে ওদের চারপাশে ঘুরছে ম্যাগনেটিক নর্থ।

'তোমার কী মনে হয় পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে?' হাওয়ার শোঁ-শোঁ আওয়াজের উপর দিয়ে জানতে চাইল কার্টা। থুতনি তাক করেছে ঝড়ের দিকে।

'এখনও জানি না। মনে হয় না বৃষ্টি পড়ছে। অবশ্য হঠাৎ করে সব পাল্টে যেতে পারে।'

চোখে বিনকিউলার তুলল রানা, দূর-দিগন্তের দিকে চাইল। ওদিকে বড় ঢেউয়ের মত কী যেন। চারপাশের ঢেউগুলোও বিশাল হয়ে উঠছে। 'চারপাশে শুধু পানি ছাড়া কিছুই নেই,' কিছুক্ষণ পর বলল রানা। 'বলতে খারাপই লাগছে, কিন্তু জিপিএস ছাড়া ঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারব না।'

'এখন কী করতে চাও?'

'পুব থেকে আসছে হাওয়া, ওটার কারণে সোজা একটা পথে এগুতে পারব। আঁধার হওয়ার আগে খুঁজতে পারি। আশা করা যায় ভোরের আগেই ঝড় থামবে। ভোরে হয়তো জিপিএস-এর সাহায্য পাব।'

আন্দাজের উপর ভরসা করে দুই মাইলের লেন তৈরি করছে রানা। এগিয়ে চলেছে, তারপর যত দূর পশ্চিমে চোখ যায়, সে পর্যন্ত গিয়ে আবারও ডানে বাঁক নিয়ে ফিরছে। সাগরের বিশালতায় বড় ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে ওর নিজেকে। যেন মোয়িং মেশিন দিয়ে ঘাস কেটে চলেছে কোনও পিঁপড়ে। ধাতব সাপ খুঁজছে, কিন্তু চারপাশে খেপে উঠেছে সাগর। একেকটা ঢেউ কমপক্ষে সাত ফুটি। আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে হাওয়ার বেগ, সঙ্গে নিয়ে আসছে মরুভূমির বালির ঘ্রাণ।

একেকটা লেন শেষ করে পরেরটা ধরে আবারও ফিরছে ওরা,

দু'জন পুরোপুরি নিশ্চিতঃ বদ্ধ পাগলই ছিল বুড়ো দাদু এবেল।

কোথায় তার ধাতব সাপ? একটা ব্যাঙাচিরও তো দেখা নেই!

বহু দূরে যখন সাদা আলো দেখল রানা, ধরেই নিল ঢেউয়ের মাথায় ফেনা খেলছে। অবশ্য ওদিকে চেয়েই রইল। একের পর এক ঢেউয়ের উপর দিয়ে এল আলো, মিলিয়ে গেল না। হোল্ডার থেকে চট্ করে বিনকিউলার নিল রানা, ওর হঠাৎ নড়াচড়া খেয়াল করেছে কার্টা।

'কী হয়েছে, রানা?'

'ঠিক জানি না। হয়তো কিছুই নয়।'

ঢেউয়ের মাঝে আরেকটা খোঁড়ল হতে উঠে এল লাইফবোট। নতুন ঢেউয়ের উপর উঠতে আবারও ঝলমলে আলো দেখল রানা। ওদিকে ওটা কী বুঝতে পুরো এক সেকেণ্ড লাগল ওর, ভীষণ চমকে গেছে। বিড়বিড় করে বলল, 'ওটা ওখানে কেন?'

'কী?' ঝোড়ো বাতাসের উপর দিয়ে বলল কার্টা।

ওর হাতে বিনকিউলার ধরিয়ে দিল রানা। 'নিজের চোখেই দেখো।'

রানার চেয়ে ছোট ওর মুখ, কাজেই বিনকিউলার অ্যাডজাস্ট করে নিল কার্টা। জিনিসটার উপর নজর রেখেছে রানাও। জিনিসটা কত বড় নিশ্চিত নয়। এর সঙ্গে অন্য কিছু তুলনা করতে পারবে না। দৈর্ঘ্যে এক হাজার ফুট তো হবেই। রানা বুঝতে পারছে না এই জিনিস আলম সিরাজের চোখ এড়িয়ে গেল কীভাবে। এদিক দিয়েই কপ্টার চালিয়ে গেছেন ভদ্রলোক।

তারপর হঠাৎ জিনিসটার পাশ থেকে অতি উজ্জ্বল সাদা আলোর বিচ্ছুরণ হলো। মাথার উপরের মেঘে লেগে ফিরে এল ঝলমলে আলো। ওটা কমপক্ষে দুই মাইল দূরে, একটু বেশিও হতে পারে, কিন্তু হাজার মাইল গতি তুলে আসছে!

ইজরায়েলের তৈরি রাফায়েল স্পাইক-এমআর অ্যান্টি ট্যাঙ্ক

মিসাইল!

বড় দ্রুত আসছে!

মাত্র একবার মুখ খুলবার সময় পেল রানা, চেঁচিয়ে উঠল, 'কার্টা, পানিতে ঝাঁপ দাও!'

আগেই ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগের ভিতর রেখেছে স্যাটালাইট ফোন, পরের সেকেণ্ডে সঙ্গিনীর কোমর জড়িয়ে ধরে লাইফবোটের রেলিং টপকে ঝাঁপ দিল সাগরে। বোট থেকে পানিতে পড়েই পাগলের মত সাঁতরাতে শুরু করেছে দু'জন। অনেক দূরে সরতে হবে, নইলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হবে।

পিছনে জ্বলজ্বলে আগুন জ্বেলে আসছে ইজরায়েলি মিসাইল!

রকেটের ডুয়াল ইলেকট্রো-অপটিক এবং ইনফ্রারেড সিকার ঠিক ভাবেই নিশ্চিত হলো: সামনে টার্গেট। সাগরের উপর দিয়ে তীরের মত এল মিসাইল, তার জানা হয়ে গেছে লাইফবোট ইঞ্জিনের হিট সোর্স কোথায়। লঞ্চ হওয়ার কয়েক সেকেণ্ড পর বোটের খোল ভেদ করল ওটা। ছোট একটা গর্ত তৈরি করে ইঞ্জিনের খুব কাছে পৌঁছেই ডেটোনেট হয়েছে। লাইফবোট এমন ভাবে তৈরি, ওটার ইঞ্জিনের আগে রয়েছে একফুট আর্মার, কিন্তু পড়পড় করে ফেটে পড়ল বোটের গোটা তলি। এক লাফে তিরিশ ফুট উপরে উঠল লাইফবোট। ততক্ষণে ওটা পরিণত হয়েছে একটা জ্বলন্ত আবর্জনায়।

দু' টুকরো হয়েই পানিতে পড়ে ডুবে গেল বোট। ওখান থেকে ভুস-ভুস করে বেরুল তপ্ত ইঞ্জিনের সাদা বাষ্প।

ওয়ালভিস বে-তে যে ট্রাকের ট্যাঙ্ক ফাটিয়েছে রানা, তার চেয়ে ঢের বেশি ওভারপ্রেশার ওয়েভ চারপাশে ছড়িয়ে গেল। রানা বা কার্টা যদি বোটে থাকত, স্রেফ হালুয়া হতো। বিশাল সব ঢেউয়ের ভিতর ভেসে থাকতে চাইছে ওরা।

কয়েক ঢোক পানিও গিলে ফেলেছে কার্টা, বিস্ফোরণ এলাকা

থেকে সরে যেতে চাইছে।

মহা বিক্ষুব্ধ সাগরে একবার পুব দিকে চাইল রানা।

ওদিকে দেড় শ' মাইল দূরে উপকূল!

•

সতেরো

সুদূর মরুভূমি থেকে ধেয়ে আসছে তুমুল হাওয়া, দুলিয়ে চলেছে কালো অতলান্তিক মহাসাগরকে। পশ্চিমে চলেছে একমাথা উঁচু ঢেউয়ের সারি, তার ভিতর দিয়ে দেখা গেল অনেক দূরে জ্বলজ্বলে সাদা কী যেন। আকাশে ঘন কালো মেঘে ঝলসে উঠছে ভয়ঙ্কর বিজলি। হঠাৎ সাপের মত এঁকেবেঁকে সাগরে নেমে এল নীলচে বিদ্যুৎ, পরক্ষণে বিকট কড়-কড়াৎ আওয়াজে কাঁপিয়ে দিল চারপাশ। মাত্র এক শ' গজ দূরে বাজ পড়েছে। কানে তালা লেগে গেছে, শিরদাঁড়ার পাশে পিস্তল গুঁজে বামহাতে সঙ্গিনীর কোমর জড়িয়ে ধরল মাসুদ রানা, দুই পা চলছে সাইকেলের প্যাডেলের মত।

'জানতে চেয়ো না কেমন আছি,' কয়েক মুহূর্ত পর কাশতে কাশতে বলল কার্টা। 'গতকাল চারবার জানতে চেয়েছ। এখন তার চেয়ে অবস্থা ঢের খারাপ।'

'একবার নিরাপদ আশ্রয় পেলেই...' ডান পায়ের বুটের ডগা দিয়ে বাম বুট খুলতে শুরু করেছে রানা, 'তার আগে যতদূর পারা যায় সরতে হবে। জাহাজ থেকে কাউকে না কাউকে পাঠাবে।'

'ঠিক। ...কিন্তু কোথাও তো কোনও আশ্রয় নেই!'

'ঠিকই মিলবে। চিন্তা কোরো না।'

'আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ, যা সন্দেহ করছি সেদিকেই?'

'হ্যাঁ, দাদু এবেলের সাপের বাড়িতেই উঠব।'

সাগরে এক মাইল সাঁতার সুঠামদেহী দু'জনের জন্য খুব কঠিন নয়, কিন্তু ঝড়ের ভিতর চারপাশ থেকে ওদের উপর চড়াও হচ্ছে মস্ত সব ঢেউ। সামনে এগোনো প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। অন্য কারণে কার্টা ও রানার জন্য অনেক বেশি বিপজ্জনক সামনের সাগর। গতকাল ওদের উপর যে সাদা লাকযারি ইয়ট হামলা করেছে, ঠিক তেমনই আরেকটা দেখতে পাচ্ছে। একচোখো দানবের মত জ্বলজ্বলে সার্চলাইট ফেলেছে সাগরে। উন্মাতাল ঢেউয়ের ভিতর সম্ভবত রানাকে দেখে ফেলেছে ওই ইয়ট, ওটা বেঁধে রাখা হয়েছে একটা জেটিতে।

'একটা ইয়ট কিনুন তা হলে যমজটা ফাও দেব, এমন হতে পারে?' প্রশ্ন নয়, মন্তব্য করল রানা।

'সুপারমার্কেটে আলুর চিপস কিনলে আমি তো ফাও পাই না কিছুই,' নালিশের সুরে বলল কার্টা।

পনেরো মিনিট সাঁতার কেটে জোরালো সার্চলাইট এড়িয়ে এগোল ওরা। কিছুক্ষণ পর লাইফবোট সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে বুঝতে পেরে সার্চলাইট নিভিয়ে দিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল জেটিতে বাঁধা ইয়ট। শোঁ-শোঁ ঝোড়ো হাওয়ার উপর দিয়ে এবার শুনতে পেল শক্তিশালী জেনারেটারের গম্ভীর আওয়াজ। ওটার কারণেই রানা নিশ্চিত হলো কোন্ দিকে যেতে হবে।

বরফ-ঠাণ্ডা পানি যেন শুষে নিতে চাইছে ওদের সমস্ত শক্তি। সঙ্গিনীর হাতে গ্লক পিস্তল ও স্যাটালাইট ফোনের থলি ধরিয়ে দিল রানা। টেনে হেঁচড়ে খুলে ফেলল প্যান্ট, ওটার দুই গোড়ালিতে শক্ত গিঁঠ দিল, তারপর প্যান্টের কোমরের দিক উপরে তুলে বাতাস সহ ডুবিয়ে দিল সাগরে। প্যান্টের কোমরে শক্ত করে এঁটে

দিল বেল্ট। জিনিসটা ঝুলির মত দেখাল। এবার ওটার কারণে সহজে ভাসবে কার্টা। পিস্তল ও ফোনের থলি ফেরত নিল রানা, বদলে দিয়ে দিল ওর তৈরি লাইফ প্রিযার্ভার। বলল, 'পানির নীচে প্যান্টের কোমরে হাত রেখো, নইলে বেরিয়ে যাবে বাতাস।'

'শুনেছি এভাবে বেঁচেছে ডুবন্ত মানুষ, কিন্তু এই জিনিস আগে দেখিনি।'

কার্টা এখনও দাঁতে দাঁত ঠুকছে না, কিন্তু রানা টের পেল, ওর কণ্ঠে ক্লান্তির সুস্পষ্ট ছাপ। কথা চালিয়ে গেল রানা, 'খেপা সাগরের চেয়ে এটা দিয়ে সুইমিং পুলে প্র্যাকটিস ঢের সোজা।'

বাতাস ভরা প্যান্ট নিয়ে আগের চেয়ে সহজে ভাসছে কার্টা। গন্তব্যের কাছে চলে এসেছে ওরা। কাছ থেকে দাদু এবেলের ধাতুর সাপ বিশাল, ছোট করে দিয়েছে সব বড় ঢেউকে।

'তুমি টের পেয়েছ?' জানতে চাইল কার্টা।

'কী?'

'পানি। আগের চেয়ে গরম।'

রানা ধারণা করল: আর বেশিক্ষণ এই শীত সইতে পারবে না কার্টা। ঠাণ্ডার বোধ কমে গেছে, হাইপোথারমিয়ার কারণে একটু পর নিঃশব্দে তলিয়ে যাবে। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর চমকে গেল ও। সত্যিই পানি এখানে আগের চেয়ে কিছুটা গরম। অল্পক্ষণেই বেড়ে গেল আরও— কমপক্ষে দশ থেকে বারো ডিগ্রি বেশি। একবার ওর মনে হলো, এদিকের পানির তাপমাত্রা বাড়ছে কোনও সক্রিয় জিয়োথারমাল ভেন্টের কারণে। অথবা হতে পারে সাগরের উপর ভাসমান ওই বিশাল জিনিসগুলো তৈরি করছে উত্তাপ, কোনও ভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিপুল শক্তি।

দাদু এবেল যেগুলোকে বলেছে ধাতুর সাপ, সেগুলো আসলে ফ্যাকাসে সবুজ রঙের পাইপ। ডায়ামিটারে একেকটা ত্রিশ ফুট, মাত্র ছয় ফুট জেগে আছে পানির উপর। এসব পাইপ বোধহয়

ধাতুর তৈরি নয়, প্রতিটি ঢেউয়ের সঙ্গে গা মোচড়াচ্ছে, উঠছে-নামছে। রানার ধারণা সঠিক হলো, দৈর্ঘ্যে একেকটা এক হাজার ফুটেরও বেশি।

কাছে পৌঁছে রানা টের পেল, এদিকের পানির উষ্ণতা কমপক্ষে আশি ডিগ্রি। তারপর ওরা পৌঁছে গেল প্রথম পাইপের পাশে। জিনিসটার গায়ে হাত রাখল রানা। বেশ তাপ বেরুচ্ছে ওটার ভিতর থেকে। সেই সঙ্গে রয়েছে একটা কম্পন। পাইপের ভিতর কাজ করছে কোনও মেশিনারি। সাগরের দুলুনির সঙ্গে যেন সামনে-পিছনে সরছে বিশাল কোনও পিস্টন।

পাইপের দশ ফুট দূর দিয়ে এগুতে শুরু করল রানা ও কার্টা। এখন আর পাইপের উপর ওদেরকে আছড়ে ফেলবে না ঢেউ। এভাবে কয়েক শ' ফুট যাওয়ার পর পাওয়া গেল একটা হিঞ্জ পয়েন্ট। এদিকে এসে বহুগুণ বেড়েছে মেশিনারির আওয়াজ, সন্দেহ নেই ওই জিনিস ঢেউগুলোকে কোনও ধরনের শক্তিতে পরিণত করছে। উপরে উঠতে বা নামতে পাইপের পাশে লোহার ধাপ ঝালাই করে আটকানো আছে, উপরে রয়েছে বিশাল এক হিঞ্জ। আগে কার্টাকে পাইপের উপর উঠতে দিল রানা, তারপর উঠতে শুরু করল নিজেও। উপরে উঠে ওর প্যান্ট থেকে বাতাস ছেড়ে দিল কার্টা, গোড়ালির গিঁটদুটো খুলে সঙ্গীর দিকে প্যান্ট বাড়িয়ে দিল।

আবছা আলোয় রানার উরুর দিকে চাইল, নিচু স্বরে বলল, 'বেশ কয়েকবার উরুতে গুলি খেয়েছ।'

'কপাল মন্দ ছিল।'

'এক মিনিটের কাহিনি নয়, আমাকে জানতেই হবে তোমার গোটা জীবনের কাহিনি।'

'বিপদ থেকে বেঁচে নাও আগে।' রানা ভাবতে শুরু করেছে: কীভাবে এসব পাইপ এড়িয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ!

মার্ভেল থেকে কপ্টার নিয়ে এদিকে এসেছেন, ঘুরে গেছেন, কিন্তু কিছুই দেখেননি কেন? এবার অন্য দিকে মন দিল রানা, প্রথমেই চারপাশের পরিস্থিতি বুঝতে হবে। ওই যে দূরে পাইপের আরেক মাথায় জেটিতে এসে ভিড়েছে ইয়ট। ওখানে যেসব লোক থাকবে, তারা ওদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

প্যান্ট পরে পাইপের উপরের হ্যাচের কাছে চলে গেল রানা। দুই হাতে টান দিতেই খুলে গেল হ্যাচ, নীচে দেখা গেল আরেকটা হ্যাচ। ঠিক করল, পরে ওখানে নেমে ঘুরে দেখবে। আপাতত স্যাটালাইট ফোনের থলিটা রেখে দিল নীচের গরম হ্যাচের উপর। আবারও আটকে দিল বাইরের ঢাকনি।

কয়েক পা সরে কার্টার দুই হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিল, চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমি একটু ঘুরে ফিরে দেখতে চললাম। এখানে কতক্ষণ থাকতে হবে জানি না, কাজেই কোনও বাহাদুরি না দেখিয়ে চোরের মত গা ঢাকা দিয়ে থাকার চেষ্টা করব। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি চাই তুমি এখানে অপেক্ষা করো, কিন্তু কোনও জোর করব না।'

'আমি তোমার পাশে থাকতে চাই।'

'ঠিক আছে। তা হলে চলো।'

পরবর্তী পাঁচ শ' ফুট কুঁজো হয়ে দৌড়ে চলল ওরা, তারপর আরও সতর্ক হলো। এখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সামনে বাড়লে ইয়ট থেকে সহজেই ওদেরকে দেখা যাবে। রানার নির্দেশে শুয়ে পড়ল কার্টা, ওর পাশে ক্রল করে এগুতে শুরু করল রানা। একটু পিছিয়ে পড়ছে কার্টা। বড় ঢেউ এলে মসৃণ পাইপের উপর দু' হাত ছড়িয়ে ভারসাম্য রাখতে চেষ্টা করছে ওরা। কখনও কখনও চাবুকের মত ছিটকে উঠে ঝাঁকি দিচ্ছে পাইপ।

জীবনে কোনদিন সি-সিকনেস হয়নি রানার, কিন্তু পাইপের বিদ্‌ঘুটে দুলুনির কারণে এখন ওর মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। সঙ্গিনীর দিকে চাইল। সবজেটে হয়ে উঠেছে কার্টার মুখ।

ইয়ট থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে কার্টাকে নিয়ে থামল রানা, হাতের ইশারা করল। এখন থেকে পাইপের ঠিক উপর দিয়ে এগুতে হবে, তা হলে ইয়টের ডেক থেকে কেউ ওদেরকে দেখবে না। আবার এগুতে শুরু করল ওরা, কয়েক মিনিট পর পৌঁছে গেল ইয়টের বারো ফুট দূরে। উপর থেকে পরিষ্কার দেখা গেল পাইপের শেষমাথায় একটা জেটিতে বাঁধা রয়েছে ওটা। পাইপ ও জেটির মাঝে হেভি ডিউটি ফেণ্ডার, ঢেউয়ের দোলায় ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলছে। ইয়টের কেবিনের জানালা থেকে উজ্জ্বল আলো সাগরে পড়ছে। ব্রিজে সবুজ আবছা আলো, ওটা আসছে রেইডার মনিটর থেকে। সুদীর্ঘ ফোরডেকের মেঝেতে রাখা একটা ট্রাইপড, তার উপর রকেট লঞ্চার।

রানা নিজে এই অপারেশনের দায়িত্বে থাকলে অধীনস্থদের চাকরি থেকে কান ধরে বের করে দিত, কোথাও কোনও শৃঙ্খলা দেখল না ও। কমপক্ষে এক মাইল দূর থেকে চোখে পড়বে ইয়ট, এবং এই বিদ্যুৎ-ঝড়ের ভিতর ছোট কোনও নৌকা নিয়ে এলে সহজেই রেইডার ফাঁকি দিয়ে চলে আসবে সেটা ইয়টের পাশে।

মনে মনে স্বীকার করে নিল রানা, ওরা যখন এদিকে এল, লোকগুলো ভালভাবেই ওদেরকে ফাঁদে ফেলেছে।

পরবর্তী একঘণ্টা পাইপের উপর শুয়ে অপেক্ষা করল ওরা। ভেজা কাপড়ে দেহে কাঁপুনি শুরু হতো, হু-হু ঠাণ্ডা বাতাসও বইছে, কিন্তু পাইপ থেকে আসা তাপ সুস্থ রাখল ওদেরকে। রানা ধারণা করল, চারজন লোক আছে ইয়টে, পালা করে ব্রিজে রেইডারের ডিসপ্লের উপর নজর রাখছে। মার্ভেলের লাইফবোট উড়িয়ে দেয়ার পরেও প্রত্যেকের সঙ্গে অস্ত্র। কিন্তু দেড় ঘণ্টা

পেরুনোর পর পাহারায় ঢিল দিল তারা। রানা খেয়াল করল, এরা একে একে হাত ছাড়া করেছে মেশিন পিস্তল।

ইয়টে রয়েছে চারজন, তাদের বিরুদ্ধে একদম একা রানা। ও অন্তর দিয়ে বুঝল, এ অসম লড়াইয়ে বিজয়ী হতে হলে আচমকা হামলা করতে হবে, কোনও সুযোগ দেয়া চলবে না শত্রুকে।

'যা করার আমি একাই করব,' কার্টাকে বলল রানা, পাইপ থেকে পিছলে নামতে শুরু করেছে।

ওর কঠোর কণ্ঠস্বর শুনে একবার শিউরে উঠল কার্টা। ভাবছে, কোথায় হারিয়ে গেল চেনা মানুষটা! পাষাণের মত হয়ে উঠেছে তার মুখ!

কোনও আওয়াজ না করেই পাইপ থেকে ভাসমান জেটিতে নেমে এল রানা। একবারের জন্যও চোখ সরল না ইয়টের ব্রিজের উপর থেকে। এক লোক ব্রিজে নাইট ভিশন গগলসের ভিতর দিয়ে চেয়ে রয়েছে ঝড়ের দিকে। আলতো পায়ে জেটি পেরুল রানা, নিঃশব্দে গানওয়েল পেরিয়ে উঠে পড়ল ইয়টের পিছন ডেকে। একটু দূরে একটা কাঁচের স্লাইডিং ডোর, ওটা সরিয়ে দিলে যাওয়া যায় কেবিনে। আরেক দিকে মইয়ের কয়েকটি ধাপ, প্রতিটি গেঁথে দেয়া হয়েছে বোটের ফাইবারগ্লাস খোলের ভিতর। ধাপ ক'টা পেরুলেই উঁচু ব্রিজ।

জোরালো হাওয়া শক্ত ভাবে ঠেসে রেখেছে ব্রিজের দরজাকে।

সামান্য কুঁজো হয়ে সিঁড়ির ধাপ পেরুতে শুরু করল রানা, একপাশে ফিরিয়ে রেখেছে মুখ, কিন্তু চোখ দরজার উপর। তরতর করে সিঁড়ির সবচেয়ে উঁচু ধাপে উঠল, এখন মুখের একপাশ দেখা যাবে ব্রিজ থেকে। কিন্তু লোকটা দেখছে সামনের সাগর। নিঃশব্দে দরজা খুলে শামুকের গতিতে ব্রিজে ঢুকল রানা। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চলেছে। একপাশে ড্যাশবোর্ডের উপর পড়ে আছে মেশিন পিস্তল। লোকটা দৈর্ঘ্যে রানার চেয়ে কমপক্ষে তিন ইঞ্চি উঁচু,

ওজনও ওর চেয়ে তিরিশ পাউণ্ড বেশি। এই প্রকাণ্ড দানবকে দেখে একটু দমেই গেল রানা। এর শ্বাসনালী চেপে ধরে কীভাবে অজ্ঞান করবে? এ তো লড়বে মর্দা ষাঁড়ের মত!

নিঃশব্দে দশ ফুট গিয়ে শত্রুর পিছনে পৌঁছুল রানা। আর ঠিক তখনই দমকা হাওয়া দুলিয়ে দিল গোটা ইয়টকে। একই সময়ে চোখ থেকে গগলস খুলতে শুরু করেছে লোকটা। তার দুই হাতের ভাঁজে ডান হাত ভরে দিল রানা, খপ্ করে থুতনি চেপে ধরেই ডানদিকে প্রচণ্ড মোচড় দিল, একইসঙ্গে বাম কাঁধের সমস্ত জোর খরচ করল শত্রুর মাথার পিছনটা বাম দিকে ঘুরিয়ে দিতে। দ্বিমুখী টান খেয়ে মড়াৎ করে ভেঙে গেল দানবের ঘাড়ের হাড়। অতবড় লোকটা মুহূর্তে শিথিল হলো। দু' হাতে লাশটা ধরে ফেলল রানা, আস্তে করে শুইয়ে দিল ডেকের উপর।

'এখন তিনজনের বিরুদ্ধে একজন,' মনে মনে বলল রানা। খুন করে কোনও অনুশোচনা নেই ওর। মাত্র দু' ঘণ্টা আগে সতর্ক না করেই রকেট দিয়ে ওদের লাইফবোট উড়িয়ে দিয়েছে এই লোকগুলো— যেন যা-খুশি করার অধিকার দিয়েছে ঈশ্বর ওদের।

ব্রিজের আরেক পাশে সরে এল রানা, সামনে শুরু হয়েছে সরু ক্যাটওয়াক, ওটা চলে গেছে সামনের লম্বা ফরওয়ার্ড ডেকে। ওদিক আবার মিশে গেছে ইয়টের পিছনের ডেকে। ওখানে ডানে এবং বামে কয়েকটা জানালা। এখন সব জানালা আঁধার, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর একটা জানালা থেকে সামান্য আলোর আভাস এল। কেবিনের ভিতর চলছে টেলিভিশন। ওদিকে মনোযোগ দিল রানা, ব্রিজ থেকে নেমে পা টিপে টিপে চলে গেল ওই জানালার পাশে। উঁকি দিতেই দেখল গার্ডদের একজন বসে আছে চামড়ার সোফায়, ডিভিডিতে মনোযোগ দিয়ে দেখছে মার্শাল আর্টের সিনেমা। প্রায় অন্ধকার কিচেনেটের ভিতর আরেক গার্ড, গ্যাস বার্নারে ফোঁস-ফোঁস করছে চায়ের কেতলি। ওই লোকের কাঁধ

থেকে ঝুলছে পিস্তলের হোলস্টার। অন্য লোকটার সঙ্গে অস্ত্র আছে কি না নিশ্চিত হতে পারল না রানা।

এই দুই গার্ড ঘরের ভিতর যেদিকে রয়েছে, তাতে অ্যাফ্‌ট্ ডেক থেকে পুরো নিশ্চিত হয়ে গুলি চালাতে পারবে না রানা। আরেকটা বড় সমস্যা হতে পারে: ওর জানা নেই চতুর্থ লোকটা কোথায়। যদি ধরে নেয়া যায় সে ঘুমিয়ে আছে, গোলাগুলি শুরু হলেই অস্ত্র হাতে হাজির হবে। চোখ পাকিয়ে নিজেকে শাসন করল রানা। কোনও কিছুই আন্দাজে ধরে নেয়া ঠিক নয়। একটু ভুল হলেই মাশুল হিসাবে দিতে হবে বিসিআই চিফের কাছে বন্ধক দেয়া সাধের প্রাণটা।

চকচকে পালিশ দেয়া অ্যালিউমিনিয়ামের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রানা, ওয়াকওয়েতে বাড়তি একটু জায়গা বের করে নিয়েই গুলি শুরু করল। স্টোভের সামনের লোকটাকে লক্ষ্য করে দুটো গুলি গেল। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়েছে গার্ড, প্রবল একটা ঠেলা খেয়ে উঠে গেছে জ্বলন্ত চুলার উপর। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে গেছে শার্টে।

কিন্তু কাউচে বসে থাকা লোকটা যেন ক্ষিপ্র বিড়াল, তার চেয়েও বেশি কিছু, রানা মাযল ঘোরাবার আগেই বাঘের মত ঝাঁপ দিল সে। রানার দুটো গুলি ফাঁসিয়ে দিল কাউচের পেট, ছিটকে বেরুল একগাদা তুলা। ততক্ষণে দামি কার্পেটের উপর শরীর গড়িয়ে দিয়েছে লোকটা।

তৃতীয়বারের মত মাযল ঘোরাল রানা, কিন্তু লোকটা চলে গেছে ঘরের আরেক প্রান্তে বার কাউন্টারের পিছনে। একের পর এক গুলি করে লোকটাকে মোরব্বা করবার মত অ্যামিউনিশন রানার কাছে নেই। মনে মনে নিজেকে গালি দিল। খামোকা দুটো গুলি খরচ করেছে কাউচের উপর।

নিজেও আড়াল নিয়েছে ও, পাঁচ সেকেণ্ড পর জানালার কোণ

থেকে উঁকি দিয়ে দেখল কাউন্টারের পিছনে লোকটার হাতে মেশিন পিস্তল। সে-ও দেখতে পেয়েছে জানালার পাশে দাঁড়ানো শত্রুকে, দেরি না করে ট্রিগার টিপেছে। তার আগেই ঝুপ্ করে ডেকের উপর বসে পড়েছে রানা। এক পশলা গুলি ঝনঝন করে ভেঙে দিল জানালার কাঁচ। রানা আন্দাজ করল, অনিশ্চিত ভাবে গুলি করতে গিয়ে ম্যাগাযিনের অর্ধেক শেষ করে ফেলেছে লোকটা।

জানালা দিয়ে বেরুনো বুলেটগুলো রানার পিছনে বিশাল স্টিলের পাইপে গিয়ে লেগেছে, কারও ক্ষতি না করেই ছিটকে বেরিয়ে গেছে অন্ধকার আকাশে। রানার একবার মনে হলো লাফ দিয়ে সরে যায় পিছনের ডেকে, ওখান থেকে এক দৌড়ে নেমে পড়বে জেটিতে। কিন্তু তা না করে খপ্ করে ধরল রিট্র্যাকটেবল ছাউনির অ্যালিউমিনিয়ামের দণ্ড, দুই হাতের জোরে ঘুরিয়ে নিল দেহ, পরক্ষণে উঠে গেল সিঁড়ির ধাপের উপর। চিতার মত ছুটতে শুরু করেছে। কয়েক সেকেণ্ডে পৌঁছে গেল ভাঙা জানালার উপরের রেলিঙে।

জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল প্রহরীর নাক-বোঁচা মেশিন পিস্তল। শিকারকে বাগে পাওয়ার জন্য একবার পিস্তল উঁচু করছে, আবার নিচু করছে, এদিক থেকে ওদিকে সরিয়ে চলেছে মাযল। অত্যন্ত বিচলিত লোক। যখন দেখল ক্যাটওয়াকে পড়ে নেই রানার লাশ, জানালা দিয়ে মাথা ও দেহের উপরের অংশ বের করল। ইয়টের সামনে ও পিছনে দেখতে শুরু করেছে। তাতেও যখন দেখা গেল না লাশ, বাধ্য হয়ে জানালা দিয়ে অর্ধেক দেহ বের করে উঁকি দিল জেটির উপর।

'দোস্তো, তুমি কিন্তু ভুল দিকে খুঁজছ,' নিচু স্বরে বলল রানা।

চরকির মত কাঁধ ঘুরিয়ে আকাশের দিকে স্করপিয়ন তাক করতে চাইল সে। জবাবে তার কপালে লাল একটা ফুটো তৈরি

করল রানা। ইয়ট ও জেটির মাঝের ফাঁক দিয়ে পড়ে গেল মেশিন পিস্তল।

কিন্তু গ্লক পিস্তলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ চতুর্থ গার্ডকে জানিয়ে দিয়েছে কোথায় রয়েছে রানা। ব্রিজের মেঝে যেন বিস্ফোরিত হলো। নীচ থেকে কেবিনের ছাতে রুক্ষ সব গর্ত তৈরি করছে গার্ড। বুলেট রানার বাম পাশের মেঝে খুবলে দিল। একটা বুলেট শার্টের কনুই ছিঁড়ে নিতেই ঝেড়ে দৌড় দিল ও, এক লাফে গিয়ে উঠতে চাইল ব্রিজের ড্যাশবোর্ডের উপর। কিন্তু পিছলে গেল বাম পা, হুড়মুড় করে পড়ল ও নিচু উইণ্ডস্ক্রিনের উপর। ঢালু কাঁচটা ভেঙে সর-সর করে নেমে চলেছে। সামনেই নীচে আরেকটা কেবিনের দরজা।

ডেকের উপর পিঠ দিয়ে ধড়াস্ করে পড়ল রানা, ব্যথা পেয়ে ভুস্ করে বেরিয়ে গেল ফুসফুসের সমস্ত বাতাস। চোখে আঁধার দেখছে, তারই ফাঁকে এক গড়ান দিয়ে দুই হাঁটুর উপর ভর করে উঠে বসল। ঘুরেই দেখতে পেল চমৎকার ইয়টের পশ কেবিনের একটার ভিতর নড়ে উঠেছে চতুর্থ গানম্যান। পিছনের কেবিনে যে পাইপ গ্যাস দিত স্টোভকে, সেটা থেকে দাউ-দাউ আগুন ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। জ্বলছে মেইন সেলুন, ছাত চাটছে নীল আগুন। গলন্ত প্লাস্টিকের টুকরো পড়ছে কার্পেটের উপর, তৈরি হচ্ছে খুদে আগুন।

লেলিহান শিখার শোঁ-শোঁ আওয়াজের উপর দিয়ে রানার পতনের আওয়াজ শুনেছে চতুর্থ গার্ড। কেবিনের ছাতের দিক থেকে মেশিন পিস্তলের নল সরিয়ে নিল সে, এক দৌড়ে পৌঁছে গেল জানালার পাশে, জানালা না খুলেই কাঁচের ওপাশ থেকে গুলি শুরু করেছে। চওড়া প্যানের উপর তৈরি হচ্ছে মাকড়সার বহু জাল, ছিটকে রানার উপর ঝরঝর করে পড়ছে অজস্র হীরকখণ্ডের মত কাঁচের টুকরো।

দু' সেকেণ্ড অপেক্ষা করে উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে রানা, গার্ডের দিকে তাক করেছে পিস্তল। ওদিকে দুর্বল হয়ে যাওয়া সেফটি গ্লাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটা। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল পুরো কাঁচ, গার্ডের উড়ন্ত দেহ এসে ধাক্কা দিল রানার বুকে। ধড়াস্ করে আবারও পড়ে গেল রানা। পড়বার সময় এক হাতে লোকটার পা পেঁচিয়ে ধরেছে। প্রায় একইসঙ্গে ডেকের উপর পড়ল দু'জন। রানার উপর পড়েছে গার্ড, কিন্তু দু'জনের মাঝে আটকা পড়েছে মেশিন পিস্তল, ওটাকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল সে। রানার ডান কবজি ও পিস্তল বামহাতে গেঁথে রেখেছে মেঝের সঙ্গে। কপাল দিয়ে রানার নাক ভেঙে দিতে চাইল লোকটা। একই সময়ে থুতনি উপরে তুলল রানা, গার্ডের মাথার তালুতে ঠকাস্ করে নামল ওর থুতনির হাড়। ব্যথায় মুখ কুঁচকে ফেলল দু'জনই। চোখের সামনে দেখছে অসংখ্য লাল-নীল-হলুদ নক্ষত্র।

তিন সেকেণ্ড পর নড়ে উঠল গার্ড, ভুল করে ছেড়ে দিয়েছে শত্রুর ডানহাত। সুযোগ পেয়েই পিস্তলের নল তুলে লোকটার ডান কানের উপর তাক করে ফেলেছে রানা। পরক্ষণে ট্রিগার টিপে দিল। ওর বুকের উপর জোর কয়েকটা ঝাঁকি খেল লোকটা, তারপর শেষবার শরীর মুচড়ে হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। তার দুই কান থেকে কুলকুল করে নামছে উষ্ণ রক্ত, ভিজিয়ে দিচ্ছে রানার মুখ-গলা-বুক। পিস্তলটা ডেকের উপর রাখল রানা, দুই হাতে বুকের উপর থেকে সরিয়ে দিল লাশ।

পিস্তলটা আবারও তুলে নিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। খুব হতাশ হলো ইয়টের পিছন দিক দেখে। ভয়ঙ্কর আগুনে জ্বলছে সবই। জোরালো হাওয়ার কারণে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে অসংখ্য লাল-হলুদ-নীল শিখা। কোনও ভাবেই ইয়টকে রক্ষা করা যাবে না। রেলিঙের পাশে চলে গেল রানা, ওটা টপকে নেমে পড়ল জেটিতে। রক্ত ধুতে একবার সাগরে নেমে ডুব দিয়ে আবারও

জেটির উপর উঠল। ঝোড়ো হাওয়ার রাতে বিষণ্ন শোনাল ওর কণ্ঠ, 'কার্টা, তুমি এবার বেরিয়ে আসতে পারো।'

প্রকাণ্ড পাইপের শেষপ্রান্ত থেকে উঁকি দিল ভীত মেয়েটি। অন্ধকার রাতে মরাটে চাঁদের মত ফ্যাকাসে দেখাল ওর মুখ। আস্তে করে হাঁটু গেড়ে বসল ওখানেই। দ্রুত ওর পাশে চলে গেল রানা। হঠাৎ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে কার্টার চোখদুটো। মুখ খুলল কী যেন বলতে। তার আগেই রানা আন্দাজ করে নিয়েছে। চরকির মত ঘুরল ও, তার আগেই গ্লক তুলতে শুরু করেছে। ইয়টের পঞ্চম গার্ড বেরিয়ে এসেছে ডেকে, একহাতে পিস্তল, অন্য হাতে একটা ব্রিফকেস। রানার চেয়ে চালু হাত তার।

রানার পাঁজরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গার্ডের বুলেট। কিন্তু দ্বিতীয় কোনও সুযোগও পেল না সে। পর পর দুটো গুলি ছুঁড়ল রানা। লোকটার গলার পাশ দিয়ে গেল প্রথম গুলি। দ্বিতীয়টা লাগল ঠিক বাম বুকে, হৃৎপিণ্ডের উপর। হোঁচট খেয়ে পিছিয়ে গেল লোকটা, কাটা কলাগাছের মত আছড়ে পড়ল। আগেই ট্রিগার টিপে ধরেছে, দুই সেকেণ্ডে বেরিয়ে গেল ম্যাগাযিনের সমস্ত গুলি।

কার্টা ঠিক আছে কি না দেখতে চট্ করে ঘুরে চাইল রানা।

ওর পিছনে উঠে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি, এখন দুই হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে আবার। ডানহাতে চেপে ধরেছে বাম বাহুর ভিতর অংশ। কোনও শব্দ করছে না, কিন্তু কুঁচকে ফেলেছে মুখ।

এক দৌড়ে ওর পাশে পৌঁছল রানা। নরম স্বরে বলল, 'দেখি, দেখতে দাও আমাকে।'

খুব সাবধানে সঙ্গিনীর বাম বাহু উঁচু করে ধরল ও। দাঁতে দাঁত চেপে শ্বাস ছাড়ছে কার্টা। চোখ থেকে দরদর করে বেরোচ্ছে পানি। পাঁজর থেকে নামছে তপ্ত রক্ত। ক্ষতটা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল রানা। ছেঁড়া পেশির উপর আঙুল পড়তেই কাতরে উঠল

কার্টা।

'সরি।'

'আ...চ্ছা...'

কার্টার দেহ থেকে ব্লাউজ খুলতে শুরু করেছে রানা, তাতে সময় লাগছে দেখে ফড়াৎ করে ছিঁড়ে নিল কাপড়ের বড় এক অংশ। এবার ভাল ভাবেই দেখা গেল কোথায় লেগেছে বুলেট। কাপড়টা দিয়ে রক্ত মুছতে চাইল। জ্বলন্ত ইয়টের কম্পিত আলোয় আবছা ভাবে দেখা গেল সব। বাহুর ওদিকে কোমরের পাশে দুই ইঞ্চি দীর্ঘ একটা ক্ষত তৈরি করেছে বুলেট।

মেয়েটির চোখে চাইল রানা। 'কোনও ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। বুলেট ভিতরে ঢোকেনি, মাংস ফুঁড়ে চলে গেছে।'

'ব্যথা, খুব ব্যথা লাগছে,' ফুঁপিয়ে উঠল কার্টা, হেলান দিয়েছে রানার দেহে।

'জানি, ব্যথা লাগছে, একটু সহ্য করো।' এক হাতে কার্টাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে রানা।

'তুমি তো জানবেই,' যন্ত্রণায় শিউরে উঠল কার্টা। 'সামান্য ব্যথায় আমি বাচ্চাদের মত কাঁদছি, আর তুমি আগেও বহুবার গুলি খেয়েছ।'

'একটু বোসো, আমি এক্ষুণি আসছি।'

'আমি কিন্তু সাঁতরাতে পারব না, রানা। নোনা পানিতে নামলে...'

'নামতে হবে না। বোসো তো একটু।'

লম্বা পা ফেলে ইয়টে ফিরে গেল রানা। আগুন এত বেড়ে গেছে, এখন কেবিন থেকে কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব নয়। কিন্তু দ্রুত হাতে পঞ্চম গার্ডের কোট খুলে নিল রানা। ওটা হাজার ডলার দামি আরমানি ব্লেযার। ওটার মালিক সাধারণ গার্ড ছিল না, ছিল এদিকের অপারেশনের দায়িত্বে। রানার সন্দেহ মিথ্যা

নয়, ব্রিফকেস খুলতেই দেখা গেল ওটা একটা আধুনিক ল্যাপটপ কমপিউটার।

যদি এই জিনিস রক্ষা করা এতই জরুরি হয়, এটা ঠিকই ওর কাজে লাগবে, ভাবল রানা। থিঙ্কপ্যাড ও ব্লেযার নিয়ে আবারও কার্টার কাছে ফিরে এল ও, বলল, 'এটা পাওয়া দরকারী ছিল। এবার ইয়ট থেকে অনেক দূরে সরে যেতে হবে। ওটার যমজ বোন যখন মার্ভেলের পেটে গুঁতো দিল, আগুনের প্রকাণ্ড কুণ্ডুলি তৈরি করেছিল।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কার্টা। 'পানিতে পড়ে ভিজে বিড়াল হয়েছি, এখন আগুনে পুড়ে ভাজা চিংড়ি হতে চাই না।'

রানার সাহায্য নিয়ে আবারও পাইপের উপর উঠল ও। টলতে টলতে ফিরে চলল ওরা। পাঁচ মিনিট পর পৌঁছে গেল ফেলে আসা হ্যাচের পাশে। তপ্ত পাইপের উপর কার্টাকে শুইয়ে দিল রানা। ওর উরুর উপর মাথা রাখল কার্টা। আরমানি স্পোর্টস্ কোট দিয়ে ওকে ঢেকে দিল রানা, আলতো করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে চুলে। একটু পর ব্যথার বোধ হারাল কার্টা, নিশ্চিন্তে চেতনা হারিয়েছে।

এবার ল্যাপটপ খুলল রানা, একের পর এক ফাইল ঘাঁটতে লাগল। প্রায় একঘণ্টা পর বুঝল হাজার ফুট দীর্ঘ পাইপ আসলে এক ধরনের মেশিন। আরও জানা গেল, চারপাশে রয়েছে এই পাইপের মত আরও উনচল্লিশটা। কিন্তু বোঝা গেল না এগুলো কী কাজে ব্যবহার হচ্ছে। এক সময় ঘড়ি দেখল রানা। একঘণ্টা পর ভোর হবে। আরও পনেরো মিনিট কমপিউটার ঘেঁটে বুঝল, এই অ্যাক্সেস হ্যাচের ভিতর যেখানে স্যাটালাইট ফোন রেখেছে, সেখানে রয়েছে একটা সার্ভিস পোর্টাল, ওটার সঙ্গে এই ল্যাপটপ সংযুক্ত করলে থামিয়ে দিতে পারবে গোটা অপারেশন।

হ্যাচ খুলে ফেলল রানা, বের করে নিল স্যাটালাইট ফোনের থলি, ওটা কোমরে গুঁজে রাখল। এবার দ্বিতীয় হ্যাচ খুলতেই

পেয়ে গেল পাশেই প্লাগ। ওটার সঙ্গে ল্যাপটপের যোগাযোগ হতেই পাতলা মনিটরে ভেসে উঠল বেশ কিছু অপশন। রানার পাঁচ মিনিট লাগল সব অপশন পড়ে গোটা অপারেশন থামিয়ে দিতে। মনিটরে দেখা গেল, এখন ইলেকট্রিসিটি তৈরি করছে না প্রকাণ্ড মেশিনগুলো। কিন্তু ঢেউয়ের ভিতর দুলছে সব ক'টা পাইপ। এবার স্যাটালাইট ফোন বের করে চেক করল রানা। আবারও ফিরেছে সিগনাল।

ঢেউয়ের মাধ্যমে বিপুল ইলেকট্রিকাল ফিল্ড তৈরি করেছিল জেনারেটারগুলো, ফলে পাগল হয়ে ওঠে লাইফবোটের সমস্ত যন্ত্রপাতি। প্রথমেই বিকল হয় ফোন, পরে কমপাসের কাঁটা বনবন করে ঘুরছিল। এখন ল্যাপটপ দিয়ে জেনারেটারগুলোকে থামিয়ে দেয়ায় নষ্ট হয়ে গেছে বৈদ্যুতিক ফিল্ড। রানা ধারণা করল, জেনারেটারের শক্তিশালী ইএম পালসের কারণেই এত শক্তিশালী করতে হয়েছে এই ল্যাপটপকে।

স্যাটালাইট ফোনে ডায়াল করল রানা। চারবার বাজবার পর ওদিক থেকে কেউ কল রিসিভ করল।

'মিস্টার আহমেদ, আমি সামনের ডেস্ক থেকে যোগাযোগ করছি। আপনি কি সাড়ে চারটের সময় ঘুম থেকে উঠতে চান?'

'রানা? আরেহ্ শালা, তুই কই!'

'তোর বোনের পাশে শুয়ে আছি। আমি আবার কবে তোর শালা হলাম?'

'দোস্তো, তুই কই!' প্রাণের বন্ধুর সাড়া পেয়ে বকাবাজি ভুলে গেছে সোহেল। 'বারবার যোগাযোগ করছি লাইফবোটে, কিন্তু কোনও সাড়া নেই! ফোনও ধরলি না, এমন কী তোর ট্র্যান্সডার্মাল লোকেটার ব্রডকাস্ট বন্ধ হয়ে গেল!'

'তখন তুই ভাবলি তোর বোনটা বিধবা হয়েছে, তাই না? এবার শোন্, এই গহীন নিশীথে আমার পাশে ঘুমিয়ে... মানে

জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে এক অপূর্ব সুন্দরী সাগরকন্যা। কিন্তু দুঃখ, দারুণ কোনও দ্বীপের বালুকা বেলায় নেই আমরা; পড়ে আছি সাগরের মাঝখানে, দাদু এবেলের দানবীয় সেই সাপের গায়ে। ওরা মিসাইল মেরে উড়িয়ে দিয়েছে আমাদের বোট।'

'ঠিকই করেছে... অকর্মার ঢেঁকি!' জবাব দিল সোহেল। 'তোর জন্যে না, আমার বোনটার জন্যে দেখি কী ব্যবস্থা করা যায়। ততক্ষণ টিকে থাকার চেষ্টা কর্।'

'মার্ভেলের খবর কী?'

'অনেক কিছুই ঘটে গেছে এখানে। এসে শুনিস।'

লাইন কেটে দিল সোহেল আহমেদ।

(দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা

লাইমলাইট

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

ওই প্রবল ঝড় এসেছিল প্রায় সোয়া শ' বছর আগে। এখন কোথায় সেই জাহাজ, সে-ঝড়ে যেটা হারিয়ে যায়? আর কোটি কোটি ডলারের হীরা? ...আঁধার রাতে কঙ্গো নদীর এক পিয়ারে ভিড়ল পুরনো এক ধচাপচা জাহাজ। অস্ত্র পেয়ে খুশি হয়ে উঠল বিদ্রোহী-নেতা, ঠাণ্ডা মাথার জাত খুনি টমাস গাধাধারের দলের লোকগুলো। এখন হীরাগুলোও তাদের চাই। কিন্তু হাতে অস্ত্র পেলেই কি খুন করতে পারবে ওরা রানাকে?

একটা কাজ শেষ হতে না হতেই রানার কাঁধে চাপল আরেক দায়িত্ব। কোথায় গেলেন বিজ্ঞানী আসিফ হায়দার চৌধুরি? কারা কিডন্যাপ করল তাঁকে? ...ওই দ্রুতগামী ইয়টের ওরা কারা? খুন করতে চাইছে কাদেরকে? সাগরে দানবীয় সাপ খুঁজতে যাওয়ার আগেই একের পর এক বিপদ এসে জুটল। রানা পণ করল, এসব রহস্য ভেদ না করে ছাড়বে না।

কিন্তু উপকূল থেকে দেড় শ' মাইল দূর-সাগরে বিধ্বস্ত হলো লাইফবোট, হাড়ে হাড়ে টের পেল ও, এবার বাঁচার সম্ভাবনা নেই! অপরূপা কার্টা অস্টিনকে নিয়ে ডুবে মরতে হবে নির্ঘাত। এর পরেও কি রানার সঙ্গে যাওয়ার সাহস আছে, পাঠক?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০